অনুবাদকের উৎসর্গ

উমা ও পূর্ণেন্দু পত্রীকে
শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

# সূচিপত্র

ছোটো উপন্যাস



ছোটোগল্প

# নিবেদন

এমন নয় যে এই প্রথম বৈকম মুহম্মদ বশীরের রচনার কোনো বাংলা হ'লো। 'বাল্যকালসখী', 'পাতুম্মার ছাগল' বা 'আমার নানার এক হাতি ছিলো'—এই তিনটি ছোটো উপন্যাস এর আগেই বাংলা হ'য়ে গিয়েছে। আর তারা যে জনপ্রিয়ও হয়েছে, তা একাধিক সংস্করণের প্রচার থেকেই বোঝা যায়। তবে, বশীর বাংলায় অনুবাদ করবার প্রস্তাব, বা পরিকল্পনা, যতটা উৎসাহ জাগায়, বশীরের রচনাকৌশল যাবতীয় উৎসাহে ঠিক ততটাই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। এমনিতে পড়বার সময় মনেই হয় না যে তাঁর রচনার পিছনে কঠোর শ্রম ও অসীম সুমিতিবোধ র'য়ে গেছে—তার ওপর, তাঁর গল্পে এ-কথাও কখনও মনে হয় না যে দারুণ জমকালো সব ঘটনা ঘটছে, সব যেন ভারি সহজসরলভাবে রোজ কত-কী ঘটে, তাই ব'লে দিতে চাচ্ছে। তাঁর হালকা লঘু চলন, ভাষার মেদবিহীন নির্ভার প্রয়োগশিল্প, কিংবা রঙ্গকৌতুকে কিংবা রঙ্গতামাশায় তাঁর ফুসকায়িত স্ফুরিত ওষ্ঠাধর রচনাটি শেষ হ'য়ে যাবার পরও চেশায়ার বেড়ালের মতো যেন আলগোছে জেগেই থাকে। অথচ শ্লেষও কিন্তু কম নেই, আর সে-শ্লেষ থেকে নিজেকেও বাদ দেন না তিনি—আর আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় ঠিক তার উলটোটাই যেন তিনি ব'লে দেন তাঁর গল্পে। আর এই দো-ফেরতা শ্লেষের প্যাঁচ শুধু-যে একটা গল্পের মধ্যেই আরেকটা গল্প লুকিয়ে রেখে দেয় তা-ই নয়, নির্মিতির সহজ ভঙ্গিমা অনুবাদকের মাথার চুলগুলোকেও খুব-একটা নিরাপদ থাকতে দেয় না। কেননা তাঁর কৌতুক আড়ালে লুকিয়ে রাখে জগৎ, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে গভীর ও প্রখর সব অনুভূতি, আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বেদনার আর মমতার বোধ। কৌতুকের সঙ্গে মমতার এমন মাখামাখি, এমন চমকপ্রদ মিশেল, সচরাচর সাহিত্যে দেখা যায় না। 'কৌতুক আসলে জীবনেরই সুবাস' —তাঁর একটি গল্পের চরিত্র বলেছিলো। সমাজের বিস্তর ঠুনকো অথচ ভয়াবহ মূল্যবোধগুলিকে নিয়ে সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যে আর-কেউ এমনভাবে হাসাহাসি করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। একজন দার্শনিক একবার বলতে চেয়েছিলেন যে ভাঁড় কিন্তু আসলে ক্রুদ্ধ পুরোহিতই—সমাজকে বদলাবার জন্যেই সে বেছে নিয়েছে এমন-এক পদ্ধতি যাতে সে সমাজের সব বিষম গ্লানি ও অসংগতিকে হো-হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে।

আর যেন পাঠককে সামনে বসিয়েই কাহন ফাঁদছেন বশীর : কথ্য রীতিনীতির এমন সুষ্ঠু প্রয়োগও সাম্প্রতিক 'লিখিত' সাহিত্যে খুবই বিরল। কিন্তু কথ্য ভঙ্গিমা আছে ব'লেই তা হ'য়ে ওঠে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ ও অব্যবহিত—পাঠক / শ্রোতার সঙ্গে সরাসরি

একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হ'য়ে যায় তাঁর ফলে চোখ মটকে বা গালে জিভ ঠেকিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে অনেক কথাই ব'লে দিতে তাঁর বাধে না, যেটা অন্যভাবে বলতে গেলেই মনে হ'তো বড্ড বেশি ঝামেলা বা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।

ফলে অনুবাদক যতই না আকৃষ্ট হন বশীরে, ততই তাঁর অনুবাদও নিরলস ও নিরন্তর কাটাকুটি ও পরিশ্রমে ভ'রে ওঠে—মুশকিলগুলো শামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। কিন্তু বর্তমান অনুবাদকের সৌভাগ্য, ভৈকম মুহম্মদ বশীর-এর এই গল্প-সংকলনের জন্যে সবচেয়ে প্রথমে যদি কাউকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানাতে হয়, তা স্বয়ং বশীরকেই—এবং তা শুধু এই জন্যে নয় যে এই আশ্চর্য গল্পগুলি লিখে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন, তা এইজন্যেও যে এই সংকলনের অনুবাদ প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও সহায়তাও আমাদের একটি পরম সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা—অসুস্থ শরীরেও তিনি মুশকিল আসানের যে-ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা শুধু তাঁর সাম্প্রতিক আলোকচিত্র ও স্বাক্ষর পাঠিয়েই নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা, পরীক্ষায় বা টিউটোরিয়ালে এ-সব গল্পকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে জেনেও, বশীরের গল্প সম্বন্ধে তাদের আনন্দ ও অনুরক্তি প্রকাশ ক'রে অনুবাদের কাজ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। আরো যাঁরা নানা-ভাবে অনুবাদককে সাহায্য করেছেন তার মধ্যে আছেন চিত্রশিল্পী এ. রামচন্দ্রন, কবি ও অধ্যাপক আয়াপ্পা পানিক্কর, এবং 'মাতৃভূমি' ( মাৎরুভূমি ) প্রতিনিধি ও সাংবাদিক জে পি নারায়ণন। 'দেয়াল' গল্পটির অনুবাদ করেছিলাম শ্রী অরুন্ধতী ঘোষের সহায়তায়, তাতে তাঁর অবদান যতটা ছিলো তাতে বলতেই হয় সেটা ছিলো দুজন অনুবাদকের যুগলবন্দী, যদিও শেষ প্রামাণিক পাঠটির দায়দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তাবে।

অনুবাদগুলো বিভিন্ন সময়ে 'শারদীয় যুগান্তর', 'যুগান্তর সাপ্তাহিকী, 'আধুনিক ভারতীয় গল্প (১ ও ২)', 'নীলকমল লালকমল', 'প্রতিক্ষণ', রবিবারের 'আজকাল', 'কথাসাহিত্য' ইত্যাদি সংকলন বা সাময়িকপত্রে বেরিয়েছে। তখন থেকেই অনুবাদগুলো নিয়ে কোনো সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব কি না, সে নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন শ্রী জয়া মিত্র ও শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য। বইটি যে আজ বেরুলো সে তাঁদেরই কৃতিত্বে। যদি কোনো-ভাবে এই অনুবাদগুলি, আমার মতো, অন্য পাঠককেও বশীরের রচনার ভক্ত ক'রে তুলতে পারে, তবেই এত দিনকার এত পরিশ্রমের একটা অর্থ হয়।

কৌতুকের ছদ্মবেশে গম্ভীর 

এক এবং অদ্বিতীয়

এটা খুবই সুখের কথা যে, ভৈকম মুহম্মদ বশীরের মতো একজন অসামান্য কথা-সাহিত্যিক আজ শুধু কেরালায় বা মলয়ালম ভাষীদের মধ্যেই জনপ্রিয় নন, সর্বভারতীয় কথাসাহিত্যেও সুপরিচিত। তাঁর 'বাল্যকালসখী', 'পাতুম্মার ছাগল' অথবা 'আমার নানার এক হাতি ছিলো'— এই উপন্যাসগুলো এর আগেই বাংলায় বেরিয়ে গেছে (সত্যি বলতে প্রথমোক্ত দুটি উপন্যাসের বাংলা তর্জমা অনুবাদের জন্যে ১৯৮১ সালে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে সমাদৃত হয়েছে), কোনো-কোনো ছোটোগল্পও।

বশীরের রচনার সঙ্গে যাঁদেরই সামান্য পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন তিনি কী রকম অসাধারণ লেখক। আমাদের মনে হয় না সর্বভারতীয় সাহিত্য থেকে অন্য কোনো লেখকের নাম তুলে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে। বশীর এক এবং অদ্বিতীয়। হালকা, নির্ভার নেহাৎই শাদামাটা তাঁর লেখা—এ-রকম মনে-হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'আপাতদৃষ্টিতে' কথাটা খুবই ভেবে-চিন্তে বসানো, কেননা একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যাবে এই নিচু গলার লঘু কথাবার্তার আড়ালে কত গভীর-গম্ভীর বিষয় লুকিয়ে আছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মোটেই একবার প'ড়ে ভুলে-যাবার মতো ঘটনা নয় – বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়বার মতো; আর প্রতিবার নতুন ক'রে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে আসে নতুন নতুন অর্থ, তাৎপর্য; আমাদের 'অগোচরেই' প্রতিটি চেনা, খুঁটিনাটিও কেমন ক'রে যে বহুস্তর ও ঐশ্বর্যময় হ'য়ে ওঠে, সেটাই আশ্চর্য।

হ্যাঁ, আশ্চর্যই।

অথচ মুহম্মদ বশীর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর কথা ও কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেন নিজের জীবন থেকেই ( এবং এটা তো ঠিক প্রায় সব লেখকই তা-ই ক'রে থাকেন, যাঁদের রচনায় আমরা আবিষ্কার করি কোনো সত্য বা খাঁটি অনুভূতি )। সাধারণত যে-সব লেখক নিজের জীবনকেই রচনার উপজীব্য ক'রে তোলেন, আমরা মনে ক'রে বসি যে সে-সব লেখা বুঝি তীব্রভাবে ব্যক্তিগত ও সংগোপন হ'য়ে উঠবে, হ'য়ে উঠবে আত্মকেন্দ্রিক বা অহংসর্বস্ব অথচ বশীরের লেখা কিন্তু মোটেই তা নয়। আপনি তাঁর গল্পগুলো প'ড়েই জানতে পারবেন তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৯১০ সালে, সরকারিভাবে তেমন লেখাপড়া করেননি ( অর্থাৎ তাঁর কোনো প্রতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই ), কৈশোরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে ( ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে সেটা ছিলো দু-ফেরতা স্বাধীনতা আন্দোলন, কারণ তখন কেরলভূমি ব'লেই কোনোকিছুর রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিলো না ), তখন তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিলো, পরে জাহাজে খালাশির কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, প্রথম যখন লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর কাছে এমনকী সাময়িকপত্রে লেখা পাঠাবার মতো ডাকখরচও থাকতো না—ইত্যাদি-ইত্যাদি অজস্র তথ্য আপনার মোটেই অজানা থাকবে না; অগোচর থাকবে না তাঁর বিয়ের কথা, প্রথম মেয়ে হবার কাহিনী, তাঁর গ্রামের বাড়ির মুরগি, বেড়াল, গোরুদের কথা, প্রতিবেশী বা প্রতিবেশিনী কারা এমনকী একবার যখন কেরালার সাহিত্য অকাদেমি আলোচনা করছিলো তাঁকে কীভাবে সম্মান জানানো যায়, তিনি কোনো ছুঁতোয় 'একটু আসছি' ব'লে নতুন-কেনা আনকোরা ছাতাটা ফেলে রেখেই যে সে-সভা থেকে চম্পট দেন, তা-ও জানতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। নিজের এক কাহনই সাতগুণ ক'রে ফেনানো, আত্মকথারই উগ্র কোনো রকমফের—এ-রকম কেউ, অসতর্ক মুহূর্তে, ভেবে বসতে পারেন। অথচ, আশ্চর্য, বশীর কেমন ক'রে যেন তাঁর নিজের জীবনের এই একান্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তাকেও রঙ্গ কৌতুক ও স্নিগ্ধতায় জারিয়ে নিয়ে জীবন সম্পর্কেই তাঁর গভীর ধারণাগুলোর প্রতিচ্ছবি ক'রে তোলেন, আর এই সাধারণ জীবনই হ'য়ে ওঠে কেমন মহার্ঘ, মূর্ছনাময় ও মমতামণ্ডিত। ধরা যাক "প্রেমলেখনম্" বা "প্রেমপত্র" গল্পটি: এই গল্পটিতে অবশ্য অত-কিছু আত্মকথা নেই। কেশবন নায়ারকে পাশের ঘরের তরুণী সারাম্মা বলেছিলো একটা চাকরি খুঁজে দিতে, আর

কেশবন তাকে অমনি তার হৃদয়ের মধ্যে যে-কর্মখালি ছিলো সেখানেই পাকা চাকরি দিয়ে দেয় – নিয়মিত বেতন. এবং মাঝে-মাঝে বোনাস, সমেত। মনে হ'তে পারে ইয়ার্কি. বড্ড হাল্কা রসিকতা – কিন্তু এরই মধ্যে জড়ানো আছে অনেক জলজ্যান্ত সমস্যা—পণপ্রথা, ধর্মভেদ, বর্ণবিরোধ. স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, ও আরো নানারকম শোভিনিস্‌ম। স্নিগ্ধ কৌতুক আর হালকা চাল টেরই পেতে দেবে না যে এইসব ভারি-ভারি বিষয় এর উপজীব্য—কিন্তু ফিরে পড়ার পর সব উনকথন বা আণ্ডারস্টেটমেন্টের আড়াল থেকে এ-বিষয়-গুলোর সঙ্গে আপনার মুখোমুখি না-হ'য়ে কোনো উপায় নেই। এও আপনি ভেবে দেখলে অনুভব করবেন যে এই প্রসঙ্গগুলো একান্তভাবেই ভারতীয়, অন্য-কোনো দেশের কোনো লেখকই এ রকম কোনো গল্প ফাঁদতে পারতেন না। আর, এরই মধ্যে. এও নিশ্চয়ই আপনি আবিষ্কার ক'রে বসবেন যে কত কম কথা ব'লেই – কিংবা আপাত অপ্রাসঙ্গিক অসংলগ্ন কথা ব'লেই – বশীর কতকিছু, কত বেশি-কিছু, ব'লে দিতে পারেন। এবং কত সহজে। এবং সাবলীলভাবে। আর এটাই বশীরেরর রচনার ধরন. প্রায় প্রথম থেকেই। এমনকী 'বাল্যকাল-সখী'র আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, গাম্ভীর্যের আড়ালেও মাঝে মাঝেই উঁকি মারে হালকা হাসির মুহূর্ত : ভাবাবেগে আতুর হ'য়ে-ওঠার মুহূর্তে হঠাৎ এমন-কোনো খুঁটিনাটি-কথা কিংবা ঘটনার ছল—রচনাটিকে নিছক সেন্টিমেন্টালিটির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়। তখনই বোঝা গিয়েছিলো যে এইখানে আমরা এক নতুন প্রতিভার অভ্যুদয় দেখছি – ভাষা, গল্প বলার কৌশল, ঘটনা সাজাবার পদ্ধতি একেবারেই ঘরোয়া. চেনা খুঁটিনাটি হঠাৎ যেন নতুন রূপ ধ'রে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে. অচেনা জিনিশ যদি কিছু থাকে তবে সে এমনভাবে গল্পে এসেছে যেন কতকালের চেনা – আর বশীর যেন নতুন চোখ আর কান উপহার দিচ্ছেন, আমাদের – এমনটাই কারু মনে হ'লে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। অভিনবত্ব অনেক সময়েই ঘটনা ও পরিবেশের অপরিচয়ের ওপর নির্ভর করে না – অভিনবত্ব, অন্তত বশীরের বেলায়, এইখানেই লুকিয়ে থাকে যাকে আমরা বলি দেখা। বশীর চেনা জিনিশকেও অন্য চোখে ছাখেন, গম্ভীর জিনিশের মধ্যেও দেখতে পান কৌতুকের উদ্ভাস।

গল্পগুলোকে এতকাল ভাগ করা হ'তো এইসব ধরনে—প্রেমের গল্প, ভূতের গল্প, পিছুটান ও রোমন্থনের গল্প, মরমিয়া সন্ধানের গল্প, প্রতিবাদ বা অঙ্গীকারের গল্প, সমাজের বিবাদ-বিসংগতি খুলে দেখাবার গল্প, সমাজ বদল করার গল্প ( যাকে কেউ কেউ সমাজ-অনুভবের সচেতন গল্প ব'লেও আখ্যাত করেছেন ) ইত্যাদি। কোনো গল্প দাঁড়িয়ে থাকে একটা অনুভবের ওপর, কোথাও থাকে আকস্মিক চমক, কোথাও বা অনুভূতির সূক্ষ্ম সংবেদনশীল প্রকাশের ওপর, কোথাও কোনো ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করানোতেই গল্পের অভিপ্রায় সার্থক হয়। কিন্তু এ রকমভাবে কি বশীরের গল্পগুলোর ওপর কোনোরকম তকমা এঁটে দিতে পারি আমরা? কীভাবে আমরা বোঝাতে পারি—ধরা যাক—"নীল আলো" বা "জন্মদিন" গল্পকে? কোনো-একটা তকমা এঁটে দিতে গিয়েই "নীল আলো" গল্পের চিত্রপরিচালক মস্ত ভুল ক'রে বসেছিলেন, তিনি এটাকে ভূতের গল্প হিশেবে পড়েছিলেন, একটি মেয়ে প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে আত্মহত্যা করেছিলো—তারপর যে-বাড়িতে সে আত্মহত্যা করেছিলো সেখানে সে ভয়াবহভাবে হানা দিতে থাকে। গল্পের বিভিন্ন লোকজন এই হানাবাড়ি সম্বন্ধে যা ভেবেছিলো, চিত্রপরিচালকও মোটামুটি তাই ভেবেছিলেন। অথচ গল্পটা যখন আমরা একটু খুঁটিয়ে, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি, তখনই খেয়াল হয় এ-গল্পকে প্রচলিত অর্থে ভূতের গল্প বলা সত্যি মারাত্মক ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, গল্পে আমরা ভার্গবী কুট্টিকে দেখতেই পাই না কখনও, শুনতেও পাই না—আমাদের ইন্দ্রিয়-গম্য জগতে ভার্গবী কুট্টি নেই। আসলে এটা ভার্গবী কুট্টির গল্পই নয় এক অর্থে। সত্যি যে এই পুরুষশাসিত পিতৃতান্ত্রিক জগতে মেয়েদের নানাভাবে নিপীড়ন করার আশ্চর্য সব উপায় উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছে পুরুষেরা। সত্যি-যে গুজব যে রকম সে-রকম ভাবেই ভার্গবী কুট্টিকে কেউ হয়তো প্রতারিত ক'রে থাকতেও পারে—"হাতফেরতা" গল্পে আমরা তো সত্যি-সত্যি দেখছি কোনো মেয়েকে পুরুষরা কী রকম পণ্যের মতো ব্যবহার করে, "হাতফেরতা" নামটাই তো তার প্রমাণ। এখানে জনান্তিকে বলা ভালো বশীর একই গল্প দু-বার দু-রকম বেশ পরিয়ে লেখেন না। "নীল আলো" গল্পে বরং অনুপস্থিত ভার্গবী কুট্টির হানার বদলে আমাদের গল্পে সারাক্ষণ উপস্থিত 'গল্পের আমি'

অর্থাৎ উত্তম পুরুষকেই লক্ষ ক'রে দেখা উচিত। গল্পে, সত্যি-বলতে, যা আছে সে হ'লো উত্তম পুরুষের জবানি—তার ভাবনা, তার কথা, গয়হাজির ভার্গবীর সঙ্গে তার অনর্গল কথা, আর ছমছমে পরিবেশ কেটে গিয়ে বরং আস্তে আস্তে তৈরি হ'য়ে যায় মানসিক পরিমণ্ডল। ভূত আছে কি নেই, ভার্গবী কুট্টি প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে আত্মহত্যা করেছিলো কিনা সত্যি-সত্যি—এ-সব প্রশ্ন ক্রমেই কেমন অবান্তর হ'য়ে ওঠে, বরং আমাদের সমস্ত মনোযোগ টেনে নেয় উত্তম পুরুষ—সে কী ভাবছে, সে কী বলছে, সে কী করছে—সমাজের কোনো গোলমেলে জায়গার উল্লেখ (যেমন, পুরুষ নারীকে পণ্যের মতো ব্যবহার ক'রে পরে বাতিল জিনিশের মতো ফেলে গেছে—আর বস্তুতে রূপান্তরিত নারীর বস্তু না-হবার প্রচণ্ড জেদের সুকঠোর প্রমাণ হিসেবে এসেছে তার আত্মহত্যা—যেটা তার সচেতন কাজ) করা সত্ত্বেও—সেই পরিসর থেকে পালিয়ে না-গিয়েও —গল্পটি অন্য একটি পরিসর তৈরি করে—যেখানে আমরা উত্তম পুরুষকেই বিচরণ করতে দেখি—অর্থাৎ সে-ই হ'য়ে ওঠে গল্পের বিষয় ও বিষয়ী, যুগপৎ। ব্যর্থ প্রেমের গল্প, ভূতের গল্প, বুদ্ধিতে-যার-ব্যাখ্যা চলে না এমন অগম্য রহস্যের বদলে হয়তো আমাদের অন্য-একটা নাম ভাবতে হবে এই গল্পের জন্যে। সবকিছুকেই খুব সরল ক'রে দেয় তকমা—বশীর তকমার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে শুধু-যে অনিশ্চয়তার অন্বেষণে বেরোন তা নয়, আমাদের তকমার বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আসতে হাতছানি দিয়ে ডাকেন। বশীর যদি তাঁর দস্তানা আমাদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন, তবে তার পেছনে অভিপ্রায় থাকে একটাই—তিনি চান যে আমরা যেন আমাদের গল্প পড়ার শাবেকি অভ্যাস ত্যাগ করি. না-হ'লে তিনি পর-পর এমন-সব গল্প লিখে আমাদের ধাঁধায় ফেলে দেবেন। এই অর্থে ধাঁধা, যে গল্পগুলো প'ড়ে আমরা কিছুতেই মনস্থির ক'রে উঠতে পারি না এ-সব গল্পের কী নাম দেবো। নাম দিতে পারলেই আমাদের নাম হয় আমরা সবকিছু বুঝে ফেলেছি, নামটাই বোধিনীর কাজ করে—বুঝতে না-পারলেই আমাদের অস্বস্তি ও শান্তিভঙ্গ। বশীরের একটা কৃতিত্ব এটাই যে তিনি মনোরমভাবে, আমাদের মনোরঞ্জন করতে-করতেই. প্রায় লোভ দেখিয়েই টেনে আনেন তাঁর অস্বস্তির জগতে—যেখানে অনিশ্চয়ের মধ্যে সবকিছু অবিশ্রাম আন্দোলিত হচ্ছে।

কিংবা ধরা যাক পুবন কলার গল্পটিই। এটা কি বিয়ের রাত্তিরেই বেড়াল জবাই করার গল্প? নারী বা পুরুষ—কে কার ওপর প্রথম থেকে প্রাধান্য বিস্তার করবে, সেই দ্বন্দ্বের গল্প? আপাতদৃষ্টিতে সে-রকমই ঠেকবে গোড়ায়। কিন্তু

বশীর—এতক্ষণে আমরা জেনেছি হয়তো—যে প্রতারক—বড্ড বেশি মনোহর প্রতারক। খুবই সহজ, জলের মতো তরল মনে হয় সবকিছু। কিন্তু চোরা-টান, আবর্ত, পায়ের তলা থেকে হ্যাঁচকা টানে নির্ভর সরিয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ক'রে দেবার তোড়—সব এই জলের মধ্যে আছে। বশীর চান যে পাঠক ভাবুক—কোনোকিছুই খুব সহজ নয়—সহজও তার আড়ালে অনেক রকম জট পাকিয়ে রেখেছে—পাঠকই ভেদ করুক সেই জট—তাঁকে চামচে দিয়ে খাইয়ে দিতে হবে কেন বাচ্চাদের মতো—পাঠকই নিজে চোখে দেখুক জগৎ, জীবন—এবং সম্প্রসারিত অর্থে, তাঁর রচনার মধ্যে জীবন যেভাবে প্রতিফলিত। এ তো রচনাই—এমন রচনা, যার আখ্যায়িকার আড়ালে লুকিয়ে আছে সন্দর্ভ--ন্যারেটিভ আর ডিসকোর্স পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছে ; কে জেতে. কে হারে—সেটাই বড়ো কথা নয়—কেননা কোনো হারজিতই শেষ কথা নয়—আমাদের শুধু লক্ষ ক রে দেখা উচিত আখ্যায়িকা ও সন্দর্ভের এই দ্বৈরথ সমর। গল্পের আসল জোর যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই দ্বৈরথ সমরেই। কেননা তার ফলেই কথক আর লেখকের দূরত্বটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর এই দূরত্বের ফলেই বোঝা যায় গল্পের লেখক, শেষ অব্দি, কথক যা-ই বলুক না কেন, কথকের সব কথার ওপর শ্লেষ-পরিহাসের একটি আবরণ পরিয়ে দেয়। এটা হয়তো আমরা ভালো ক'রে বুঝতে পারবো যদি আমরা উত্তম পুরুষে লেখা তাঁর গল্পগুলোকে দেখি। সাধারণত উত্তমপুরুষে লেখা গল্প—অর্থাৎ যেখানে 'আমি' একটি চরিত্রই শুধু নয়, কথকও—অনেক সাধারণ পাঠককে উশকে দেয় যে গল্পের আমিই বুঝি লেখক স্বয়ং—তারা এটা ভাবে না যে গল্পের আমি আসলে লেখকের তৈরি একটি চরিত্র মাত্র, তাকে শুধু একটা বাড়তি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পাঠককে গল্পটা ব'লে দেবার। গ্র্যাহাম গ্রীনকে একবার একটি উপন্যাসের গোড়ায় ব'লে দিতে হয়েছিলো যে তাঁর উপন্যাসের কথক ব্রাউন ( তিনি গ্রীন ), এবং এই ব্রাউন তাঁরই মতো রোমান ক্যাথলিক, সেও তাঁরই মতো হেইতি বা সান্তো দোমিঙ্গো গেছে—কিন্তু, ব্যাস, ঐ পর্যন্তই সেই মিল—গল্পের ব্রাউন মোটেই গ্র্যাহাম গ্রীন নয়—যেমন অন্য উপন্যাসের উত্তম পুরুষরাও গ্র্যাহাম গ্রীন নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র। তার মানে অবশ্য এই নয় যে লেখক তাঁর নিজের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় ব্যবহার করবেন না : যা-কিছু লেখক দেখেছেন শুনেছেন, যা-কিছু ঘটনার আবর্তে তাঁকে পাক খেতে হয়েছিলো, তার অনেককিছুই তিনি ব্যবহার করতে পারেন —অভিজ্ঞতার টুকরোগুলি ছাড়া সত্যি বলতে তাঁর নিজস্ব উপাদান আর

কীইবা আছে ? এমনকী কথক উত্তম পুরুষের নাম যদি স্বয়ং বশীরও হয়, তবু তিনি লেখক বশীর নন—কেননা তিনি এই বশীরের ওপর নানা রকম চালাক আস্তর চাপিয়ে দিয়েছেন. একটু হয়তো পাঠকদের সঙ্গে খেলা করবার জন্যেই সত্যি আর মিথ্যে. বাস্তব আর কল্পনা এমন ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে শেষ অব্দি কী কী সত্যি ঘটেছে. কী-কী সম্পূর্ণ বানানো. কোন-কোন ভাবনা মনগড়া—এইসব প্রশ্ন ধাঁধার মতো গল্পের কাঠামোকে আঁকড়ে থাকে এই হেঁয়ালি ভেদ করা খুব-একটা সহজ কাজ নয়—যেমন "আশ্চর্য বেড়াল" ছোটো উপন্যাসটি প'ড়ে বশীর সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমরা জানতে পারি, যেমন পারি "সোনার আংটি" বা "জন্মদিন" প'ড়েও। কিন্তু অনেক তথ্য আর সব তথ্য মোটেই এক কথা নয়। কৌতুক. শ্লেষ, পরিহাস. বা নিছক আমোদ দূরত্বই শুধু সৃষ্টি করে না, আমাদের এও বলে যে সবকিছুকেই সত্য ব'লে মেনে নিলে আমরা ঠ'কে যাবো—লেখক যে বেড়ালের সামনে রোদ্দুরের মধ্যে কতগুলো উলের গোলা খেলার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন, পাঠক এ-সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না-থাকলে বেশ মুশকিলেই প'ড়ে যাবে। খেলার ব্যাপারটাও আছে এ-সব গল্পে, যেমন ছিলো 'পাতুম্মার ছাগল' উপন্যাসেও। একটু অন্যভাবে ব্যাপারটার প্রস্তাবনা করা যাক এবার, একটু লক্ষ করা যাক "দেয়াল" গল্পটিকে। সম্প্রতি আদুর গোপালকৃষ্ণনের সংবেদনশীল চলচ্চিত্রায়ন গল্পটি সম্বন্ধে নানা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—এবং কেউ-কেউ 'আবিষ্কার' ক'রে ফেলেছেন এই গল্পে নাকি আর্থার কোয়েসলারের 'মধ্যাহ্নে আঁধার' উপন্যাসের 'অভিঘাত' পড়েছে—এবং এই আবিষ্কারকেরা 'অভিঘাত' কথাটিকে খুব-একটা নিষ্কলুষ ভাবেননি। আর এখানেই আমরা হয়তো বুদ্ধিমানদের হুঁশিয়ারি না-মেনে একটু বেকুবের মতো ছুটে যাবো—বুদ্ধিমানদের পদে-পদে ভয় থাকে, যদি তাঁদের বুদ্ধির প্রমাণ তারা সারাক্ষণ না-দিতে পারেন। আমরা যেমন এতদিন জানতাম এ-গল্পেও বশীর নিজের জীবনের নানা তথ্য ব্যবহার করেছেন ; আঘাতের চাঁদমারি হিশেবে প্রায়ই তিনি নিজেকেই যে বেছে নিয়ে থাকেন, তা আমরা "আশ্চর্য বেড়াল" বা "সোনার আংটি" বা "জন্মদিন", এমনকী "নীল আলোতেও" একটু-আধটু আবিষ্কার করেছি, "একটি ক্ষুদ্র পুরাতন প্রণয়-কথা"কে যদি এই হিশেবে আমরা নাও ধরি। বশীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছেন ; হেন কাজ নেই যা তিনি করেননি—জাহাজের খালাশি, হোটেলের রাঁধুনি. পীর ফকির তীর্থযাত্রী, সার্কাসের বাজিকর ইত্যাদি জীবিকায় নানা সময়ে তিনি সুনামও অর্জন করেছিলেন, ঠিক সাধারণ মধ্যবিত্ত

গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকেননি—দেশের বাইরে যে জাহাজে-জাহাজে ভ্রমণ করেছেন. তা-ই নয়, ভারতবর্ষেও কখনও পায়ে হেঁটে কখনও অন্য যানবাহনে ভ্রমণ করেছেন—এমনকী তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বাল্যকালসখী'র প্রথম খশড়া কোনো অদ্ভুত কারণে তিনি প্রথমে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, কলকাতার চিৎপুরের কাছে কোনো-এক হোটেলে ব'সে ( সেই ইংরেজি খশড়া অবশ্য তিনি কখনও ছাপেননি—বরং তা থেকেই তৈরি হয়েছিলো বাল্যকালসখী'র বর্তমান রূপ )। রাজনৈতিক কারণে তিনি যে তখন শুধু একাই জেলে গিয়েছিলেন তা নয়, আরো অনেক বিভিন্ন 'ঘাগু' রাজনৈতিক নেতাও তখন জেলকে তাঁদের বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছিলেন। জেলখানার যে-বিবরণ এ-গল্পে, এই "দেয়াল" গল্পে. আছে তার অনেকটাই সত্যি আর অনেকটা সত্যি ব'লেই আগে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো সবটাই সত্যি। কৌতুক আর খেলার জের এটা—অনেক সময়েই ঠিক বুঝতে দেয় না কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে—এই দুয়ের অনুপাতটা কী।

নিজের চারপাশে কত রকমের দেয়াল তুলি আমরা ? কত দিকে ? ভৈকম মুহম্মদ বশীর একটা জেলখানার বিবরণ দেন আমাদের, গল্পের উত্তম পুরুষ যেখানে কিছুদিন কাটিয়েছিলো। গল্পের শেষে চার দেয়ালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সে রাস্তায় চুপচাপ. হতভম্বও বুঝি খানিকটা, দাঁড়িয়ে থাকে হাতে এক গোলাপ নিয়ে। কিন্তু দেয়ালগুলো—এখন যখন সে চার দেয়ালের বাইরে—তারা কি তবে আর রইলো না ?

বশীরের গল্প বলার ভঙ্গিটা চাপা, অন্তরঙ্গ, ঊনকথনের যেমন চমৎকার দৃষ্টান্ত তেমনি তাতে সময়-সময় থাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার একটা মেজাজ। উদ্দেশ্য. আগেই যেমন বলেছি. চেনা বিষয়কে অচেনা ক'রে দেখানো. অচেনা বিষয়কে চেনা ( হয়তো এই জন্যেই মুশকিলটা বাধে—আমরা গল্প কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তা নিয়ে খামকাই মাথা ঘামাতে থাকি )। আর সেইজন্যে খুব সহজেই তিনি গল্প থামিয়ে দিয়ে একট বাক্যেই ব'লে দিতে পারেন তারপরে কী হ'লো - খবরকাগজে যেমন থাকে-শিরোনামেই পুরো প্রসঙ্গের ইঙ্গিত হদিশ। তারপর বিভিন্ন বাক্যে বা অনুচ্ছেদে যাকে বিশদ করা হবে—তারপর সেটা বিস্তারিত করতে পারেন চাক্ষুষ-সব খুঁটিনাটি সমেত ; কিংবা গল্প থামিয়ে দিয়ে পাড়তে পারেন 'আপাত অসংলগ্ন' অন্য প্রসঙ্গ—আপাতদৃষ্টিতে মূল কাহিনীর সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই ব'লে ভ্রমক্রমে কখনও-বা মনে হ'তেও পারে। কিন্তু তাতে গল্পের স্বরে যেটা প্রধান হ'য়ে ওঠে সেটা ঘটনার ঘনঘটা বা রুদ্ধশ্বাস

কৌতূহল নয়—কাহিনীর বিভিন্ন মোচড় ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে সাসপেন্স সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সেটা সবচেয়ে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে 'পাতুম্মার ছাগল,' "আশ্চর্য বেড়াল" অথবা 'আমার নানার এক হাতি ছিলো'—এইসব উপন্যাসে। আমরা আগেই বলেছি বশীর তাঁর গল্পে চোখের পাতা না-ফেলেই অতি সহজে, লোককে ধাঁধায় ফেলবার জন্যে, ঢুকিয়ে দিতে পারেন নিজের জীবনের কথা—অথচ তাই ব'লে তা আত্মজৈবনিক নয় মোটেই, কিন্তু সেই-জন্যে তা আবার আর্থার কোয়েসলার থেকেও প'ড়ে-পাওয়া নয়। জেলখানায় সবকিছুই পাওয়া যায়: কেমন ক'রে বা কী কৌশলে পাওয়া যায়, তা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করেন বশীর: আর এই জেলখানা ঠিক আরব্য উপন্যাসের জাদুগালচেয় চাপিয়ে অন্য কোনোদেশ থেকে রাতারাতি নিয়ে এসে এ-দেশে বসিয়ে দেয়াও নয়—কতগুলো খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেয় যে এ-সব এখানকারই ব্যাপার। "দেয়াল" যদি মূলত দুই কয়েদীর প্রেমের গল্প হয়—বিলিতি গল্প প'ড়ে-প'ড়ে আঁটোসাঁটো ওয়ানট্র্যাক যে-ধরনটা দেখতে আমরা অভ্যস্ত—তাতে এত বিশদ ক'রে এ সব বিষয় না-বললেও চলতো। এ যদি হিন্দু-মুসলমান পাত্র-পাত্রীর ব্যাপার হয়, তাহ'লে সেটা আরো ব্যাখ্যা করা যেতো। "প্রেমপত্র" গল্পে তো নায়ার আর খ্রীষ্টানের প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা বেশ সচেতনভাবেই ধরিয়ে দেয়া হয়েছিলো আমাদের। এ যদি রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যকার কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ হ'য়ে থাকে, তবে আরো মোক্ষমভাবে তৈরি ক'রে দেয়া যেতো আঘাত—একেবারেই ঘায়েল ক'রে দেয়া যেতো তাঁদের। এ যদি হয় জীবনমৃত্যু ও চিরন্তন নিয়ে ভাবনাচিন্তা, তবে জেলখানার নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে এই দার্শনিকতাকে প্রায় আবেশে পরিণত ক'রে নিয়ে তা নিশ্চয়ই আরো বেশিক্ষণ ধ'রে বলা যেতো—জেলখানায় আর যা-ই হোক, সারাক্ষণই তো মনে হয় সময় যেন কাটে না। এই সমস্তকিছুই, অথচ গল্পে আছে, কিন্তু আবার এ-সবই শুধু নেই। ভারতীয় ধ্রুপদী গানে যেমন সবগুলো স্বরই আলাপে জমিয়ে তোলা হয়, ধীরে বা দ্রুত, তারপর সেইসব স্বরেরই নানা বিন্যাস ও মোচড়ে প্রতিবারেই নতুন একটা স্বরের জগৎ গ'ড়ে তোলা হয়, বশীরের গল্পের ধরন যেন অনেকটা সেইরকম। তার ফলেই গল্পের মধ্যে অন্য-একটা মাত্রা, অন্য-একটা আয়তন, অন্য-একটা তাৎপর্য জুড়ে দিতে পারেন বশীর। তাঁর প্রায় সব সেরা গল্পেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। জেলখানায় নিস্তরঙ্গ ঘটনাবিহীন নিগড় নিগৃহীত জীবনে আত্মমগ্ন ভাবুক এই রাজনৈতিক বন্দীটির জীবনযাপন অন্য-সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির পর আরো নিস্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে

—ফুলের বাগান ছাড়া তার আর এখন কিছুই করার নেই। কিন্তু প্রথম থেকেই হাওয়া ঝিম ধ'রে থাকে ফুলের নয়, অন্য-কোনো নারীশরীরের সুবাসে। অদেখা নারায়ণীর গলার স্বর আরো ঝিম ধরিয়ে দেয় হাওয়ায়, গ'ড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে মান-অভিমান হাসি-কান্না স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার করুণরঙিন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ও তাদের বাহার। কিন্তু দেয়াল—সে সে তো শুধু এই জেলখানাতেই নেই ; দেয়াল—সে তো আছে সবখানে। বশীরের সরলতা আর কৌতুক আসলে একটা ছদ্মবেশ, যেমন আমরা লক্ষ করতে পারবো অন্য-আরো গল্পে। কিন্তু রাজনীতিই থাকুক, জেলখানাই থাকুক, অনেকগুলো দুপুরও থাকুক—এটা কোনো স্বৈরতন্ত্রের প্যারাবল নয়—এখানে কৌতুকের আড়ালে গম্ভীর আঁধার যা আছে তা কোনো টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি নয়। বরং যদি বশীরের অন্য কোনো-কোনো গল্প আমাদের চেনা থাকে, তাহ'লে বোঝা যাবে সে-সব গল্প যদি তাঁর রচনার সাধারণ কোনো চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য তৈরি ক'রে দিয়ে থাকে, তাহ'লে এ-গল্পেও সেই চারিত্র বা বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়বে—একেবারে অন্যরকম স্বতন্ত্র কিছু নয় এটা। বশীর যদি অভিনব হ'য়ে থাকেন, তবে তাঁর সব রচনা মিলিয়েই তিনি অভিনব।
কেননা কোনো-কোনো গল্প তিনি এমনভাবেও ভাবেন, যা নিয়ে কোনো গল্প লেখা যেতে পারে ব'লেই তাঁর আগে কেউ ভাবেনি।

### সবকিছুতেই খেলনা হয়

সবকিছুতেই গল্প হয়, তা যতই হোক না কেন চেনা-জানা তুচ্ছ বিষয়, টুকরো কথাবার্তা, কিংবা এমনকী গ্রামের জীবনের রোজকার কাজের ছন্দও—চাষবাস, মুরগিপালন, গোরুর দুধ দোয়ানো, বাখারির বেড়া দিয়ে লাউগাছকে আটচালার ছাদে তুলে দেয়া, এমনকী গল্পগুজব আড্ডা, পাড়াবেড়ানো, পরনিন্দা পরচর্চা, হঠাৎ একটা বেড়াল কেউ উপহার দিলো, একদিন যাওয়া হ'লো পাশেই কোনো গাঁয়ে বিয়েবাড়িতে বাসে চেপে, কিংবা একমাত্র মেয়ের বায়না তার খেলার সাথী চাই, কখনও এক সন্ন্যাসী আসেন—চা খেতে-খেতে বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে তাঁর সঙ্গে আড্ডা—জগৎ, জীবন, ধর্মসম্প্রদায়, ঈশ্বর, গোঁফদাড়িচুল, কে কী খায়, পারমাণবিক যুদ্ধের কালো ছায়া, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে হানাহানি, কেমন ক'রে কেউ সাধু হয়, অলৌকিক ও বুজরুকি—সে-আড্ডার আলোচনায়

বিষয় হ'য়ে ওঠে-ইতিহাস-পুরান, দেশ-মহাদেশ, কাল-মহাকাল থেকে কী নয়—এমনকী সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কও। কোনো গল্পই নেই—এমনও মনে হ'তে পারে। মুসলমান বাড়ির বেড়াল ব'লে বেড়ালের নামও মুসলমানি হ'তে হবে, সতেরোজন বিবিকে সামলায় একটি ঝুঁটিফোলানো 'মাচো' কুঁকড়ো, কোত্থেকে একদিন এক বিষধর সাপ আসে, একসময় সমুদ্র গর্জাতে থাকে, খেয়ে নিতে চায় পাড়ের নতুন মাটি; যা আমরা চোখে দেখি সত্যি ব'লে ভেবে নিই তাকেই, তাই কী ঠিক, না কি আমাদের দেখারও বাইরে আছে আরো-কোনো সত্য—এমনতর প্রশ্ন ঠিক ওঠে না বটে সবসময় কিন্তু তারাও আছে প্রসঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে—আর তার পরেই আমরা অবাক হ'য়ে দেখি 'আশ্চর্য বেড়াল' কী-রকম সজীবভাবে আমাদের অভিনব কোনো কাহিনীহীন কাহিনী শুনিয়ে বসেছে।
বশীরের ধরনটা ম্যাজিসিয়ানের মতো। এমন জাদুগর বুজরুগ যে কিনা তিন-চারটে না-বল না-ঘটনা নিয়ে লোফালুফি খেলছে। কিন্তু এগুলো তো বাইরের ব্যাপার। গল্পের জমির ওপর বোনা, বাইরে থেকে যে-কেউ প্রথম নজরেই এসব দেখে নিতে পারবেন। বশীরের আসল কৃতিত্ব লুকিয়ে থাকে সেখানেই যেখানে তিনি এইসব আপাততুচ্ছ বর্ণনা বিবরণ ঘটনার আড়ালে তাঁর মূল চিন্তাভাবনাকে লুকিয়ে রাখেন আশ্চর্য বেড়াল একদিন দুম ক'রে অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে হুলো বেড়াল হ'য়ে গেলো কিনা—এই প্রশ্নটাই অবান্তর। কেননা অলৌকিক নিয়ে যতই কাহিনীর মধ্যে আলোচনা হোক না কেন, বশীরের আসল লক্ষ্য এই লৌকিক জাগতিক জীবনই। সেখানে কোনো অসাধারণ মানুষ নেই, অতিনাটকের ধুমধাড়াক্কা নেই, বিচিত্রবীর্য অদ্ভুতকর্মা বীরপুরুষ বা হাতসাফাইয়ের জোরে ভেলকি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়া কোনো সাধুবাবা বা ফকির দরবেশ নেই—সন্ন্যাসী যদি থাকেনও কোনো গৃহস্থের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে তার আটকায় না, গৃহী একজন আছেন—তিনি নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা ক'রে বলেন নিশ্চিন্তে ব'সে ধ্রুপদী কেতাব লিখতে তিনি ব্যস্ত—কিন্তু মন দিয়ে কাজ করার জো নেই, তিনি বরং সংসারের মধ্যেই অর্ধেক একজন সন্ন্যাসী। আসলে যেটা খেয়াল ক'রে দেখতে হবে, সাধারণত আমরা যে-ধরনের গল্প পড়তে অভ্যস্ত তার চাইতে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবেই বশীর কেমনভাবে শুধু রচনানৈপুণ্যে বিন্যাসের কৌশলে তাঁর গল্পগুলো তৈরি ক'রে ফ্যালেন।
ছোটোগল্পের আলোচনায় পণ্ডিতেরা জপিয়েছেন তাকে একই সঙ্গে ছোটো এবং গল্প হ'তে হবে। আরো ভজিয়েছেন, একটাই আঁটোসাঁটো প্রসঙ্গ থাকবে, পাত্র-

পাত্রীর সংখ্যা ও সমস্যা বেশি হবে না. কোথাও গল্পের পেছনে থাকবে পরিবেশের প্রভাব, কোথাও-বা কোনো-এক মনোভাব, মেজাজ, অর্থাৎ কোনো মানসজগৎ, ছোটো-ছোটো সুখ দুঃখ ব্যর্থতা, থাকবে সাধারণ মানুষজন ও তাদের সমস্যা,··· ইত্যাদি। পার্থিব-অপার্থিব যাবতীয় বিষয়ই ছোটোগল্পের প্রসঙ্গ হ'তে পারে, কিন্তু অ'াটো বুনুনির মধ্যে আপাত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। এ-ধরনের ফরমান নিয়ে মজা করতে বশীরের ভালোই লাগে। সুযোগ পেলেই তিনি আপাত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ক'রে বসেন। যেমন, ধরুন, কারু কোনো ছেলে বা মেয়ে হ'লো, বাবা-মা খুব খুশি তাদের প্রথম সন্তানের জন্মে, বন্ধুবান্ধবকে ডেকে তাঁরা ছোটোখাটো উৎসবও করতে চান—সাধারণভাবে স্নেহ বাৎসল্য বন্ধুপ্রীতি, এটাই হবে বিষয়-বস্তু। এ নিয়ে 'কুমারসম্ভব' ও লেখা যায়—লেখা হয়েছে। কোনো দম্পতির প্রথম সন্তানের জন্ম হয়তো দম্পতির কাছে খুবই আশ্চর্য ঘটনা ব'লে মনে হয়, হয়তো তা তাঁরা স্মরণীয় ক'রে রাখতেও চান। এমন আশায় তাঁরা করেন না যে তাঁদের সন্তানের জন্মের জন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উন্মুখ হ'য়ে আছে, কেননা নির্বন্ধ এটাই যে এই সন্তানই জগৎ ও জীবনকে বিপন্ন দশা থেকে বাঁচাবে। বশীর এ-রকম কোনো বিরাট ব্যাপার ফাঁদেননি, কিন্তু তবু এই-যে শিশুর জন্ম হবে, ছেলে বা মেয়ে, তার সঙ্গে কোথাও হয়তো বিশ্বের নাড়ির যোগই আছে। "সোনার আংটি" গল্প হয়তো তা-ই বলতে চাচ্ছে। কিন্তু বশীর কীভাবে গল্প সাজিয়েছেন? কীভাবে কৌতুকের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন গল্পের ভেতর-কার গল্প? কত আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন? অথচ নানারকম মোচড় বা মোড়ঘোরা সত্ত্বেও, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হাজার তর্ক সত্ত্বেও, ছেলে হবে না মেয়ে হবে নিয়ে একাধিক বাজি ধরা সত্ত্বেও, শিশুর জন্মের পর (ছেলে না মেয়ে কে – তাতে কিছুই এসে-যায় না) এক অদ্ভুত স্নেহে-বাৎসল্যে কৌতুকে-খুশিতে সারা গল্প ভ'রে যায়। যে-হালকা চালে গল্প শুরু হয়েছিলো, সেই হালকা চাল লঘু সুর কখনও কিন্তু হারিয়ে যায়নি—যতই কেননা অন্য প্রসঙ্গের আমদানি হোক। "সোনার আংটি" গোড়ায় আমাদের বুঝতেই দেয়নি গল্প কীভাবে এগুবে কী হবে তার বক্তব্য, কতটা হাসিখুশি ছড়িয়ে পড়বে বাবা-মা থেকে তাঁদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়ার পর আমরা টের পেয়ে যাই গল্প কিন্তু কখনো তার মূল প্রসঙ্গ থেকে স'রে আসেনি। যা-কিছু মনে হয়েছিলো 'এ গল্পে আবার ও-সব কেন,' সে সবও কেমন বেমালুম জুড়ে গিয়েছে বুনুনির সঙ্গে। দম্পতির ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে কেমনভাবে সে শোষণ ক'রে

নিয়েছে সমাজ-সংসার—কেননা যে-শিশু জন্মাবে সে তো সামাজিক জীবও, নয় কি? সারা সমাজসংসারেরই তাতে খুশি হওয়া উচিত না কি?

বশীরের গল্পের সামাজিক স্তরে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই নিম্ন মধ্যবিত্তদের আনাগোনা। খুব-একটা শহুরে হালফ্যাশান নেই—না পোশাক আশাক খাওয়াদাওয়া জীবন-যাপনের ভঙ্গিতে—না বা অস্তিবাদী উদ্ধারহীন হতাশায় ও শঙ্কার অবতারণায়। সবই খুবই চেনা, জানা, সাধারণ। এই 'সাধারণ' কথাটাই যে আমাদের কত অচেনা বশীর সেটাই বোঝান। নইলে পাতুম্মার ছাগল, তার দুধ, লেখকের বই থেকে উপার্জিত টাকা কে পাবে, সংসারে কার সঙ্গে কার আড়ি, কার ভাব, কার হিংসে,কার খুশি—এই নিয়ে আস্ত একটা উপন্যাস লিখতে পারতেন কি তিনি? দেখাতে পারতেন কি এই চেনাজানা প্রসঙ্গগুলোই কত অজানা আমাদের? যাকে সাধারণ ব'লে ভাবি, তা ই কত অসাধারণ?

বশীরের সব কৌতুকের আড়ালে গাম্ভীর্য আছে—এমন প্রসঙ্গ আছে যা খুব মুখ-রোচক নয়। ধর্ম, সম্প্রদায়ে হানাহানি রাজনৈতিক দলাদলি, ইতিহাসের ভয়াল যুগ, দেশবিদেশের মানুষজনের সমস্যার বৈচিত্র্য, প্রেমে ব্যর্থ হ'লে কেউ আত্ম হত্যা করে দারিদ্র্যের জালায় কেউ চুরি ক'রে খেয়ে আসে অন্যের খাবার, আছে বেকার সমস্যা, লোক শুধু জাতপাত বা শ্রেণীর স্বার্থের জোরেই অন্যকে দাবড়ানি দিয়ে রাস্তায় জিনিশ হাতিয়ে নেয়, আছে পণপ্রথার বলি, জেল খানার কুকুর ও ভয়ংকর প্রহরী। কিন্তু সেই সঙ্গে এই লোকেরা পঙ্কজ মল্লিক বা কুন্দনলাল সায়গলের গান শোনে,শস্তা বিলিতি ছবি দেখতে যায়, তাসের আড্ডা বসায়, ব্যাঙ্কের ছোটো কেরানি প্রেমে প'ড়ে যায়। দরিদ্র একজন লেখকের প্রথম সন্তান জন্মাবে, আছে গ্রাম শহর, আছে এ কথাও সংস্কার হিশেবে কতকিছু যে ঢুকিয়ে নিয়েছে সমাজ লোকের মধ্যে। আর বশীর তাদের ভালোবাসেন। তাঁর মানবিকতাই তাদের কাউকে—কোনো-কিছুকে—ফ্যালনা ব'লে মনে করে না, অবহেলা বা তাচ্ছিল্যের যোগ্য বলেও মনে করে না। তেল ফুরিয়ে গেছে, আলো নেই, চারপাশে চোর ডাকাত—কিন্তু তেল জোগাড় ক'রে অনেকক্ষণ পর কেউ বাড়ি ফিরে দ্যাখে নাল আলো জ্ব'লে আছে, আভাময়, স্নেহপ্রদীপ্ত—অনুপস্থিতির সময়েও কেউ-একজন সজাগ লক্ষ রেখেছে, পাহারা দিয়েছে, কিছু অঘটন যেন না-ঘটে। সে কি ভূত? মরণের পরে হঠাৎ এসেছে? কেননা কেউই তুচ্ছ নয়, সবকিছুই মহার্ঘ, সবকিছুই আমাদের স্নেহমমতা দাবি করে। বশীরের বেশির ভাগ গল্পেই এই স্নেহ-মায়া-মমতাই সারাক্ষণ এক আশ্চর্য ও অপরূপ নীল আলো হ'য়ে জ্ব'লে থাকে।

# ভৈকম মুহম্মদ বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প

# প্রেমপত্র

প্রিয়তমা স্যারাম্মা :

কেমন ক'রে আমার প্রিয় কমরেড কাটাচ্ছে তার এই এত ছোট্ট পরমায়ু যখন জীবন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে?

আমার কথা যদি ধরো—আমার জীবন কাটে পলে-পলে স্যারাম্মারই প্রেমে। আর তোমার, স্যারাম্মা?

খুব ভালো ক'রে এটা ভেবে দেখবার জন্য মিনতি করছি তোমায়; আমাকে একটা মধুর, সদয় জবাব দিয়ে কৃতার্থ কোরো।

স্যারাম্মারই একান্ত
কেশবন নায়ার

এই কথাই লিখলো কেশবন নায়ার। আর চোখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো একবার। তার কেমন একটা মধুর অনুভূতি হচ্ছিলো, যেন স্যারাম্মা তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে, মুখে সুমধুর হাসি। শুধু একটা অনুভূতি। চিঠিটা সে পড়লো, আগাগোড়া। কবিতা আছে এই লেখায়। আছে দর্শন আর অতীন্দ্রিয়তাও। বাঃ রে—এর মধ্যে বুঝি কেশবন নায়ারের হৃদয়ের সম্পূর্ণ রহস্যটা ধরা নেই? সে যা লিখবে ব'লে ভেবেছিলো, তার চেয়েও ভালো হয়েছে চিঠিটা। চিঠিটা সে ভাঁজ করলে, পকেটে ঢোকালে, তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগলো। অমনি মাথায় একটা ভাবনা ঢুকলো: স্যারাম্মাকে চিঠিটা দিলে সে তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না তো? না কি সে উত্তর দেবে? কেমন হ'তে পারে তার উত্তরটা? স্যারাম্মার কৌতুকবোধটা টনটনে, লোককে খ্যাপাতে বা ঠাট্টা করতে তার ভারি ভালো লাগে। একটা ঘটনা তার মনে প'ড়ে গেলো। তার সঙ্গে সে গভীর একটা আলোচনা করছিলো একদিন। মেয়েদের নিয়ে রসিকতা করছিলো তারা। স্যারাম্মা বলেছিলো কোন-এক মস্ত কবি নাকি নারীকে ভগবানের মহান সৃষ্টি হিশেবে বন্দনা করেছেন। কেশবন নায়ার হাসি চাপতে পারেনি, বলেছিলো, 'মেয়েদের মাথা কেবল চাঁদের আলো-টালোয় ভর্তি।' এক নামজাদা লোকের কথা পেড়েছিলো সে, তিনি সাত-সাতবার বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রলোকের সপ্তম জীবনসঙ্গিনী সিঁড়ির গ্র্যানাইট পাথরে একবার ঘাড়মুখ গুঁজড়ে চিৎপটাং প'ড়ে গিয়েছিলো। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তাঁর এক অবিবাহিত বন্ধুর কাছে, তাকে খবরটা জানাতে।

'অ্যাকসিডেন্টটা অত সিরিয়াস নয় অবশ্য।'

'মাথা ফেটে যায়নি তো?'

'সে তো গেছেই।'

'মগজ বেরিয়ে গেছে?'

'ওঃ, সে কিছু না—' বলেছিলেন সেই নামজাদা ভদ্রলোক, যিনি সাত-সাতজন মেয়েকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। 'মাথার খুলি যদি ফেটে চৌচিরও হ'য়ে যেতো, কেমন ক'রে মগজ দেখা যেতো, বলো—মেয়েদের?'

'তা থেকে আমি যা অনুমান করেছি,' কেশবন নায়ার তার দৃষ্টান্ত প্রদান শেষ করেছিলো, 'তা এই: মেয়েদের মাথার মধ্যে শুধু চাঁদের আলোই পোরা থাকে।'

স্যারাম্মা এ-কথা শুনে শুধু মুখ টিপে হেসেছিলো। পরে সে এ-সম্বন্ধে কোনো টু শব্দও করেনি। কিন্তু তাহ'লেও, তারও মাথার মধ্যে যে নেহাৎই চন্দ্রালোক পোরা আছে, এই ইঙ্গিতটায় সে চ'টে যায়নি কি? যখন সে প্রেমপত্রটা পাবে, তখন কি সে ঐ চাঁদের আলো-টালোর কথা তুলে তাকে বিদ্রূপ করবে না? অবশ্য সে ভুলেও যেতে পারে ঘটনাটা—আর যাই হোক, সে তো মেয়েই, শেষ অব্দি।

এ সব সাত-পাঁচ মাথায় নিয়ে কেশবন নায়ার রেস্তোর'াটায় ঢুকলো। কফি খাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিলো না তার। তবু সে এক পেয়ালা কফি খেলো, তারপর মৌজ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলে, ভাবনায়। প্রেমপত্রটা দিলে স্যারাম্মা তাকে নিয়ে রসিকতা করবে না তো? স্যারাম্মা এখনও প্রেমের স্পর্শ পায়নি। কেশবন নায়ার কত হাজার বারই না চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখনই সে প্রেমের আতরদানের ছিপি খোলার চেষ্টা করে, স্যারাম্মা কেবল নাক শিঁটকোয়! এই দুর্গন্ধটা কীসের? তুমি ইদানীং স্নান-টান করো না নাকি? এ-সব অস্ফুট জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে তার দৃষ্টিতে। কেমন ক'রে তাকে সে তার প্রেমে পড়াবে?

প্রেমে হাবুডুবু খেতে-খেতে সে বাড়ি ফিরলো। দোতলায় যে-ঘরটায় সে থাকে নিচে থেকে তার দিকে তাকিয়েই কেশবন নায়ার আঁৎকে উঠলো—স্যারাম্মা! সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা লম্বা লাঠি জানলা দিয়ে গলিয়ে তার ঘর থেকে কী যেন বার ক'রে নেবার চেষ্টা করছে!

কেশবন নায়ার একতলাতেই অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, ওপরে আর উঠলো না। স্যারাম্মা তার ঘর থেকে কী চুরি করতে চাচ্ছে? যদি তার মানিব্যাগ হয়, সেটা তো তার পকেটেই আছে। তবে কি তার কোনো জামা কিংবা ধুতি? না কি কোনো বই? কিন্তু তার ঘরে এমন-কোন বই আছে যেটা সে পড়েনি? ঐ আঁকশি গলিয়ে অমন ধস্তাধস্তি করার কোনোই দরকার ছিলো না, স্যারাম্মা! তোমাকে কি আমি আমার

নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি না? যদি তুমি মুখ ফুটে একবার আমায় বলতে—তোমাকে কি আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতুম না, সর্বস্ব, যা তুমি চাইতে, তাই? আসুক মেয়ে তার লুঠ নিয়ে নেমে। তাকে নামতে দেখে সে করুণ গলায় তাকে এই কথাই বলবে. ব'লে চিঠিটা বাড়িয়ে দেবে তার দিকে, বলবে, 'এটা ছাখো, এটা হচ্ছে তোমাকে যে-প্রেমপত্রটা লিখেছি, স্যারাম্মা, সেই প্রেমপত্র।' ব'লে তাকে সে চিঠিটা দেবে তারপর। সে তখন চিঠিটা পড়বে, প'ড়ে এমন-একটা প্রেমকে হত্যা করেছে ভেবে আকুল হ য়ে কাঁদবে। তখন কেশবন নায়ার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবে: 'ওঃ, তাতে কিছু হয়নি। আমি সব ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।'

আর এইভাবে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলে-মিশে এক হ'য়ে যাবে। সে যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এ-সব কথা ভাবছে, হঠাৎ শুনতে পেলে স্যারাম্মা বলছে: 'তোমাকে চুপি-চুপি বাড়ি ঢুকে সেই থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ব্যাঙ্কের বাবুরা আজ নিশ্চয়ই সন্ধে অব্দি কাজ করেছে।'

'ওঃ!' কেশবন নায়ারের আত্মাটাই চমকে উঠলো। সে ওপরে উঠে এলো।

স্যারাম্মা ঘামছিলো। হেসে বললে: 'এই নিষ্ফলা কাজটায় বোধহয় আধঘণ্টা ধ'রে খেটে যাচ্ছি! যাই করি না কেন, আঁকশির ডগায় কিছুতেই আর আটকায় না! যাকগে, ঠিক করেছি কালই একটা আলাদা চাবি বানিয়ে নেবো!'

'সে কি আমার অনুপস্থিতিতে ঘর খোলবার জন্যে?'

স্যারাম্মা রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকালে এবার, মুচকি হাসলো।

কেশবন নায়ার জিগেশ করলে: 'কী সেই জিনিশ, আঁকশির ডগায় যেটা আটকাবে না?'

'তোমাকে সে কথা বলিনি বুঝি?' স্যারাম্মা ফিরে জিগেশ করলে, 'নিচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অতক্ষণ ধ'রে তুমি কী ভাবছিলে বলো তো?

'আমি ভাবছিলুম,' কেশবন নায়ার থেমে গেলো। কী বলবে সে? 'আমি ভাবছিলুম স্যারাম্মা ঘর থেকে কিছু-একটা নিতে চাচ্ছে। তা, কী খুঁজছিলে তুমি?'

'শ্রীযুক্ত কেশবন নায়ারের নামে আজ যে-পত্রিকাটা এসেছে। পিওনকে দেখলুম জানলা দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলতে। ভারি একঘেয়ে লাগছিলো—কোনো কাজ নেই—'

'কাজ নেই? তো আমাকে ভালোবাসতে পারো না?' এই ভেবে সে তার কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার ক'রে আনলে, আর প্রেমপত্রটা, সেটা সে স্যারাম্মার হাতে তুলে দিলে।

স্যারাম্মা সেটা পড়লো, তারপর দলামোচা ক'রে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বললে: 'তারপর? খবর কী, বলো।'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। সে ঘরের দরজা খুললো, ঝুঁকে মেঝে থেকে পত্রিকাটা তুললো, তারপর স্থারাম্মার হাতে সেটা তুলে দিলো। তারপর সে গা থেকে কুর্তাটা খুলে ঝুলিয়ে রাখলো। স্থারাম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন মিষ্টি ও গরম কিছু খেয়ে ফেলেছে: সে পত্রিকার মোড়কটা খুলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাতা ওলটাতে লাগলো।

মুখের বিবর্ণ ভাবটা লুকিয়ে কেশবন নায়ার প্রেমপত্রের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করলে, বললে: 'তা, তোমার কী খবর, স্থারাম্মা? আজ তুমি সৎমায়ের সঙ্গে ঝগড়া করোনি?'

স্থারাম্মা বললে: 'বোধহয় বাবা আর সৎমা এবার থেকে আমার কাছে ঘরভাড়া চাইবে।'

'জল অ্যাদ্দুর গড়িয়েছে?'

'কেন গড়াবে না? আমি একটা আস্ত ঘর দখল ক'রে ব'সে আছি, সেটা অনায়াসেই ভাড়া দেয়া যেতো, আর—'

'আর, স্থারাম্মা?'

'আর স্থারাম্মাকে রান্নাঘরের এক কোণায় প'ড়ে থাকতে দেয়া যেতো—অন্তত সেটাই বোধহয় সৎমার ভাবনার ধরন।'

'আর তোমার বাবার?'

'বাবার আবার মত-অমত কী—সৎমার মত ছাড়া?'

'সৎমাকে তোমার বাবা বিয়ে করার আগে অবস্থা কেমন ছিলো?'

কার অবস্থা? সৎমায়ের?'

'না, তোমার বাবার।'

'তখন বাবা আমার বাবা ছিলো। আমার মনে হয় পুরুষ মানুষের মাথার মধ্যে কিস্সু নেই?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। একটু পরে সে জিগেশ করলে: 'আচ্ছা, স্থারাম্মা এ-বাড়ির ওপর তোমার কোনো অধিকার বা দাবি নেই?'

'আমার আবার অধিকার কীসের?' বললে স্থারাম্মা। 'সৎমা বিয়ের সময় পণের যে টাকা এনেছিলো তাই দিয়েই তো বাড়িটার সব দেনা মেটানো হয়েছে। বাবা বলে মায়ের অসুখের সময়ই নাকি সব ধার হয়েছিলো—তারপর শ্রাদ্ধের খরচ। যদি মা বেচারি অন্তত আরো দু-বছর বাঁচতো, আমি তবে বি-এ টা পাশ করতে পারতুম। সহজেই একটা চাকুরিও জোটাতে পারতুম।'

'কত যে বি-এ পাশ বেকার মেয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই,' কেশবন নায়ার বললে।

'সে যাই হোক, তোমার নিজের যে কোনো কাজ নেই এটাই দুঃখের কথা, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা পত্রিকা থেকে চোখ তুলে বললে, বেশ দীন স্বরেই, 'তুমি যে-ব্যাঙ্কে কাজ করো, সেখানে কি কোনো চাকরি আছে? যে-কোনো কাজ—যে-কোনোখানে?'

কেশবন নায়ার স্যারাম্মার টলটলে স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকালে, তাকিয়ে দেখতে দেখতে পেলে তার গ্রীবার স্বর্ণাভা, তার টশটশে মৃদুকঠিন স্তন দুটি, আর মনে-মনে ভাবলে: কোনো পুরুষকে ভালোবাসা ছাড়া মেয়েদের আবার কাজ কী? ভগবান মেয়েদের সৃষ্টিই করেছেন ভালোবাসা দেবার জন্যে—ভালোবাসা পাবার জন্যে। কোনো আপিশে গিয়ে প্যাখম তুলে নাচবার জন্যে নয়! তবু সে বললে, 'আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবো।'

'কোথাও কোনো কাজ খালি আছে? জানো কিছু?'

'জানবো না কেন, খুব জানি!' কেশবন নায়ার ভাবলে। 'আমার হৃদয়েই তো একটি বড়ো চাকরি খালি আছে। তার জন্য কাউকে কোনো ঘুষ দিতে হবে না অথবা কোনো মুরুব্বি পাকড়ে, সুপারিশ জোটাতে হবে না।' সে আস্তে-আস্তে তার বুকে হাত বোলাতে-বোলাতে বললে, 'একটা চাকরি অবশ্য আছে।'

'কোথায়?'

'কাল বলবো।'

'কী কাজ?'

'সেটা—'কেশবন নায়ার হাসলে। তাকিয়ে ত্যাখো এর দিকে? দলামোচা করো আমার প্রেমপত্র, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দাও সেটা—বেশ মজা পেয়েছো, না? আর তারপর ও নিয়ে টু শব্দটিও আর করা না? আমাকে দেখে কি তেমন লোক ব'লে মনে হয় যে রোজ একটা ক'রে মেয়েকে প্রেমপত্র লিখি? হুম, চাকরি চাই! বেশ, আমি চাকরি তৈরি ক'রে দেবো। সে যে পুরুষ হ'য়ে জন্মেছে এই ভেবে কেশবন নায়ারের বেশ একটু গর্বই হ'লো। বাঁ হাত তুলে সে ওপরের ঠোঁটটায় হাত বোলালো। আমাকে অন্তত সরু একটা গোঁফ রাখতে হবে। প্রসন্নতায় তার চোখ ঝকমক ক'রে উঠলো, সে ঘোষণা করলে: 'দেখো, ঠিক বলবো তোমাকে—কাল।'

'বললেই শুধু হবে না। কাজটা আমি পাবো তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আঃ, বাঁচালে!'

প্রেমপত্র সম্বন্ধে একটা কথাও না-ব'লে স্যারাম্মা আঁকশি আর পত্রিকাটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, উঠোনে, নিজের ঘরে যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে: 'আর সেই অন্য ব্যাপারটাও ভুলো না কিন্তু।'

কেশবন নায়ার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু না-ব'লে। উঠোনে দ'লেমুচড়ে যে প্রেমপত্রটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে সেটার দিকে তাকাতে তার সাহস হ'লো না।

সে রাগ চেপে বললে, নম্মা!'

'এই যে আমার হৃদয়ের চাবি!' পরদিন ব্যাঙ্কে যাবার সময় তার ঘরের চাবিটা স্যারাম্মার কোলে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললে কেশবন নায়ার।

সন্ধেবেলায় সে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এলে স্যারাম্মা তাকে চাবিটা ফিরিয়ে দিলে। কেশবন নায়ার আগের দিনের পত্রিকাটাও তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলো। চেয়ারটাকে দরজার কাছে টেনে সে ব'সে প'ড়ে পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে লাগলো। কী ঘটতে যাচ্ছে এ-কথা ভেবে মন তার সুখে ভরা। তার জন্য কী কাজ জুটিয়েছে, এটা যখন স্যারাম্মা জানতে পাবে, তখন কি তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়েই ফেলবে? কেশবন নায়ার এ নিয়ে একটু ভেবে-টেবে নিজের মনেই হেসে উঠলো। সে যখন ওভাবে ব'সে আছে, তখন স্যারাম্মা ওপরে উঠে এলো। কেশবন নায়ার যদিও ঠিক জানে যে কাজের খবরটার জন্য স্যারাম্মা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, তবু সে এমন ভান করলে যে যেন এ-সম্বন্ধে তার কোনো খেয়ালই নেই. বরং তাকে সে রোজকার মতো জিগেশ করলে, 'তারপর, কী খবর, বলো, স্যারাম্মা।'

'ও, কিছু না,' স্যারাম্মা রোজকার মতো হাসলে, তারপর জিগেশ করলে: 'তোমার ঘর থেকে কিছু চুরি গেছে কি না, দেখেছো?

কেশবন নায়ার বললে: 'আমি খুঁজে দেখিনি।'

'তাহ'লে একবার মিলিয়ে দ্যাখো।'

কেশবন নায়ার ভান করলে যেন হাতের কাগজটায় সে তন্ময় হ'য়ে আছে—এদিকে সে মনে-মনে কিন্তু মহড়া দিচ্ছে তাকে সে এখন কী বলবে—সেই দুর্লভ গোপন কথাটি যা তাকে সে খুলে বলবে। তার হৃদয়ের গোপন রহস্য যেন ফেনিয়ে উঠছে বেরিয়ে আসার জন্যে—শিশি থেকে যেমন বেরিয়ে আসে সুগন্ধ।

স্যারাম্মা কেশবন নায়ারের মুখোমুখি ব'সে পড়লো জানলায়। তার কোঁকড়ানো চকচকে চুলের মাঝখানে সযত্নে টেরি কাটা, তবে ভুরুর কাছে কেমন একটা গোলাপি আভা—আস্তে সন্তর্পণে তার ভুরু নাচে, তার চওড়া বিশাল বুক—যেটা ওঠে আর নামে: কেশবন নায়ারের এইসব দেখতে-দেখতে স্যারাম্মা তাকে মৃদুস্বরে বললে, 'তুমি কিন্তু কাজটা সম্বন্ধে আমায় কিছুই বলোনি।'

'তুমি যে কাজটা নেবে, তা আমার মনে হয় না, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা বললে: 'মাইনে কম হ'লেও কিছু এসে যায় না। আমি নেবো, এখানে সকলেরই বোঝা হ'য়ে উঠেছি। এমন জীবনে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। সত্যি-বলতে

তুমি জানো মাঝে-মাঝে আমি কী ভাবি ?'

'কী ভাবো ? শুনি ?'

'ধুর, তুমি কেবল সবসময় আমায় নিয়ে ঠাট্টা করো। আমি সিরিয়াসলি বলছি। কাজটা যাই হোক না কেন, আমি নেবো।'

'স্যারাম্মা, তুমি রাঁধতে জানো ?'

স্যারাম্মা একটু অবাক হ'য়ে গেলো। 'হঠাৎ ? এ-কথা ?'

'নেহাৎই একটা কৌতূহল !'

স্যারাম্মা বললে : 'তা একটু-আধটু রান্না জানি বৈ কি। ভাত-তরকারি রাঁধতে পারি জলখাবার বানাতে পারি, চা বানাতে পারি, কফি বানাতে পারি, কোকো বানাতেও পারি, ওভালটিনও বানাতে পারি—'

'সংক্ষেপে, তোমায় কিছু চাল দেয়া গেলে তুমি ভাত রেঁধে দিতে পারবে—'

'কেন, তুমি কি আমাকে কোথাও রাঁধুনির চাকরি দিতে চাও না কি ?'

'না, না, সে-রকম কিছু নয়। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলুম। লেখাপড়া-জানা মেয়েরা অনেক সময় আবার রান্নাবান্না করতে পারে না কি না। রান্নাঘরের ধোঁয়া কালিঝুলির সঙ্গে তাদের কাপড়চোপড় খাপ-খায় না। তারা জানে কেমন ক'রে সাজতে-গুজতে হয়, পাউডার মাখতে হয়, ঠোঁট রাঙাতে হয়, একশো পঁয়ষট্টি ভঙ্গিতে চুল বাঁধতে হয়, তারা সাজগোজ করে, নিজেদের অলংকৃত করে, হাতে থলি ঝোলায়—'

'থলি ?'

'ঐ যতসব বটুয়া।'

'ওঃ !'

'বটুয়া ঝুলিয়ে হেঁটে যায়। পাক্কা মহিলা এক-একজন ! আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলুম স্যারাম্মাও একজন মহিলা কি না।'

'আমার কোনো বটুয়া নেই।'

'তাহ'লেও স্যারাম্মা, তাদের ঐ বটুয়ায় কী থাকে বলো তো।'

'একটা ছোট্ট আয়না, খুদে একটা পাউডারের কৌটো, একটা ছোট্ট চিরুনি—'

'তাতে প্রেমপত্র থাকে ?'

'প্রেমপত্র ?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্র—ঐ যে-সব প্রেমপত্র তারা পায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। দিনের শেষে বটুয়া যখন ভর্তি হয় তখন তারা সে-সব তুলে রাখে মস্ত তোরঙ্গে।'

'সে আমি জানিনে। আমার জন্যে তুমি কী কাজ পেলে, সেটাই বলো।'

'ও তোমার পছন্দ হবে না, স্যারাম্মা।'

'হবে।'

'ঠিক জানো?'

'হাজার বার জানি।'

'তাহ'লে,'—কেশবন নায়ার ইতস্তত করলে। কেমন ক'রে সে কথাটা পাড়বে?

'স্যারাম্মা, এ তোমার পছন্দ হবে না।'

'বাঃ রে, বললুমই তো হবে।'

'ধরো, পরে তোমাকে এজন্যে অনুতাপ করতে হ'লো?'

স্যারাম্মা অবিচল: 'না, যত কষ্টই হোক না কেন, যত ত্যাগই করতে হোক না কেন, আমি সব মেনে নেবো। একটা গোপন কথা জানো তুমি? কেশবন নায়ার, তুমি এখানে থাকতে আসার আগে ব্যাপারটা ঘটেছিলো। আমার বিয়ের জন্য তিন-তিনটে সম্বন্ধ এসেছিলো। একেবারে দুম-দুম ক'রে পর-পর তিনবার—গত বছরে। তিনবারই আমি খুশি হয়েছিলুম। সে এই জন্যে নয় যে যে-লোকটাকে জীবনে কখনও চর্মচক্ষুতে দেখিনি-শুনিনি তার সঙ্গে পরমানন্দে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখছিলুম আমি। খুশি শুধু এই ভেবে হয়েছিলুম যে তাতে এই নরক থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনটে সম্বন্ধই ফশকে গেলো। পণের টাকা ছাড়া কেউই আমাকে বিয়ে করবে না। আমার বাবা আর সৎমা বলে সে নাকি আমারই দোষ। পান থেকে চুন খশলেই সে আমার দোষ হ'য়ে যায়। এ-তল্লাটে যদি কোনো বৃষ্টি না-হয় তবে সেটাও কি আমারই দোষ! একটা চাকরির খোঁজে আমি হন্যে হ'য়ে সব জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু শুধু আমারই জন্যে কোথাও কোনো চাকরি খালি নেই।'

'খালি একটা আছে।'

'কোথায়?'

'একটু সবুর করো, বলছি। এই পণ ব্যাপারটা কী?'

'কোনো পুরুষ যাতে কোনো মেয়েমানুষকে রাখতে পারে তার জন্যে ভাড়ার টাকা।'

'উঁহু, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ধরো, কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইলো—'

'বেশ তো, আমিই না-হয় করবো।'

'ওঃ! যদি তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে চ'লে যাও—আমাকে খাওয়াতে-পরাতে টাকা লাগবে না? আমাকে স্নান করাতে, তেল, পাউডার, সুগন্ধি লাগবে, টাকা লাগবে যখন আমার বাচ্চা হবে—আঁতুড়ের সময়, আমি মরতে বসলে ডাক্তার-বদ্যির খরচ আছে, মারা গেলে শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা আছে। তা, এইসব টাকা আগাম জোগাতে হবে—তবেই আমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে।'

'এ-সব তো এই জন্যেই যে কেউ স্যারাম্মাকে ভালোবাসে না। ধরো, কেউ যদি তোমাকে ভালোবাসে···'

'তখনও পণের টাকা দিতে হবে। এ আমাদের শাস্তরে আছে।'

কেশবন নায়ার এই শাস্ত্র অনুমোদিত পণের কথাটা শুনে ভারি খুশি হ'য়ে উঠলো। উৎফুল্ল ক'রে তোলার মতোই ব্যবস্থা. সে মনে-মনে ভাবলে। 'এ রকম বিধান যদি না-থাকতো—ওরে বাপ্‌রে!'

স্যারাম্মা বললে: 'পণপ্রথাকে আমি ঘেন্না করি!'

কেশবন নায়ার বললে: 'এই পণপ্রথাকে আমি দারুণ ভালোবাসি।'

'কেন?'

'বলছি। এই পণপ্রথা বেঁচে আছে তো নাম্বুদিরিদের মধ্যেই।'

'মুসলমানদের মধ্যেও এটা আছে।'

কেশবন নায়ার বললে: 'পণের টাকা যারা দিতে পারে না. তাদের তাহ'লে যে পণ চায় না অন্য সম্প্রদায়ের এমন কাউকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া উচিত।'

'বাঃ, চমৎকার!'

'হ্যাঁ। কোনো নায়ার খ্রীস্টান বিয়ে করুক, খ্রীস্টান বিয়ে করুক কোনো নায়ার বা মুসলমানকে। মুসলমান বিয়ে করুক কোনো নায়ার বা নাম্বুদিরিকে—'

'একটা প্রশ্ন ক'রে তোমায় বাধা দিতে পারি?'

'করো তোমার প্রশ্ন!'

'আমার জন্যে কী কাজ পেয়েছো, সে-কথাটা কিন্তু তুমি এখনও আমাকে বলোনি।'

'ওঃ···কিন্তু, স্যারাম্মা, তুমি তো কাজটা নেবে না।'

'কতবার বললুম না, যে নেবো। নেবো-নেবো-নেবো,—'

'তাহ'লে,—' কেশবন নায়ার হঠাৎ তার হৃদয়ের আতরদানটির ছিপি খুলে ফেললে, ছিপিটি শব্দ ক'রে খুলে গেলো। 'স্যারাম্মা. তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তোমারও আমাকে তেমন ভালোবাসা উচিত। তোমার জন্যে এই কাজটাই খুঁজে পেয়েছি, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা আঁংকে উঠলো। হঠাৎ তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো। তার চোখের পাতা ভারি আস্তে নেমে গেলো। শুধু তাই নয়, সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো শান্ত আর রূপসী—মুখে মৃদু একটা হাসি, যা থেকে কোনো গভীর অনুভূতি উপচে পড়ছে।

কেশবন নায়ারের বুকের মধ্যকার বাঁধটা ভেঙে গেলো। সে বললে: 'আমি তোমাকে কতদিন ধ'রে ভালোবেসে আসছি, স্যারাম্মা। আমার এই বুকটার চেয়েও

বেশি, আমার প্রাণের চেয়েও বেশি, আমার এই দেশটার চেয়েও বেশি, আমার এই—!'

স্যারাম্মা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। তার গালে নতুন রং লেগেছে। তার চোখের তারা আরো উজ্জ্বল চকচকে হ'য়ে উঠেছে।

কেশবন নায়ার জিগেশ করলে: 'এবার তুমি চাকরিটা সম্বন্ধে কী বলবে বলো, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা হেসে উঠলো, নিচু স্বরে বললে: 'চাকরিটা তো ভালোই। তা কত মাইনে দেবে, শুনি।'

'মাইনে? ওঃ, তুমি বুঝি লড়তে চাচ্ছো আমার সঙ্গে। ঠিক হ্যায়, লড়াইই সই। ক্ষত্রিয়ের উগ্র রক্ত আমার ধমনীতে ব'য়ে যাচ্ছে…রমণী, তুমি আমাকে যুদ্ধের কী ভয় দেখাও…যুদ্ধ যদি চাও, তবে তাই পাবে, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' তারপর খুব গম্ভীর হ'য়ে কেশবন নায়ার শুধোলে: 'কত মাইনে চাও তুমি?'

'তুমি নিজেই দরটা ঠিক করো না।'

অনেকক্ষণ ভেবে কেশবন নায়ার মাইনে ঠিক করলে। 'কুড়ি টাকা।'

স্যারাম্মা বললে: 'অত কম!'

'আর একটা পয়সাও বেশি দিতে পারবো না। সারা মাস ধ'রে হপ্তায় ছ-দিন ন-ঘণ্টা ক'রে খেটে আমি নিজে মাইনে পাই কুললে চল্লিশ টাকা। তা থেকে তোমার বাবাকে ঘর ভাড়া দিতে হয়, রেস্তোর াঁয় খাবার খরচ দিতে হয়, ধোবাকে পয়সা দিতে হয়…আরো কত কী খরচ। যদি খরচ কমাইও, যদি প্রায় না-খেয়ে থাকবো ব'লেও ঠিক করি, তাহ'লে টেনেটুনে কুড়ি টাকায় নামাতে পারি। বাকি সব টাকাই আমি তোমাকে দিয়ে দিতে চাই, স্যারাম্মা। তাছাড়া তোমার কাজটা তো আর কঠিন নয়। সেটাও ভেবে ছাখো।'

স্যারাম্মা বললে: 'খুবই কঠিন কাজ। কেশবন নায়ার তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেবল ন-ঘণ্টা খেটেই খালাশ। দিনের বাকি পনেরো ঘণ্টা থাকে তার বিশ্রাম করার জন্যে। আর আমার কাজ—সেখানে বিশ্রাম কই এক মুহূর্ত? আমাকে দিবারাত্রি কেশবন নায়ারের কথা ভাবতে হবে—খাবার সময়, ঘুমের সময়—সবসময়—তাই না কি? কেশবন নায়ার যখন কাঁদে তখন আমাকে কাঁদতে হবে, কেশবন নায়ার যখন হাসে তখন আমাকে হাসতে হবে। সে না-খাওয়া অব্দি আমি খেতে পাবো না, সে যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে, তখন আমায় জেগে-জেগে তাকে ভালোবাসতে হবে।'

স্যারাম্মা এমনভাবে কেশবন নায়ারের দিকে তাকালে যেন সে ভারি একটা বিদঘুটে তেতো ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। তারপর সে জিগেশ করলে: 'চাকরিটা পাকা, না নেহাৎই দু-চারদিনের জন্যে?'

'পাকা! চিরস্থায়ী!' কেশবন নায়ার ঘোষণা করলে।

'ওঃ, তাও ভালো! তার মানে কেশবন নায়ারের যদি ভালোমন্দ কিছু-একটা হ'য়ে যায়, তখনও চাকরিটা আমার থাকবে?'

'তার মানে?'

'কেশবন নায়ার মারা যাবার পরেও আমার চাকরিটা থাকবে কি?'

'নিশ্চয়ই। আমি টেঁশে গেলেও আমাকে ভালোবেসে যেতে হবে তোমায়।'

স্যারাম্মা এবার একটা খ্যাচড়া তুললো। 'তুমি ম'রে গেলে আমাকে মাইনেটা দেবে কে, শুনি?'

কেশবন নায়ার চুপ ক'রে রইলো। কী-ইবা বলতে পারে সে?

কেশবন নায়ারকে চুপ দেখে স্যারাম্মা হেসে উঠলো। টিটকিরি দিয়ে বললে: 'আমার মাথায় চাঁদের আলো-টালো পোরা থাকলে কী হবে, চাকরিটার এই একটা মস্ত গোল আছে। তুমি ম'রে গেলে আমাকে কে মাইনে দেবে?'

কী বলবে বেচারা? কেশবন নায়ার গভীরভাবে ভাবলে কিছুক্ষণ। শেষটায় সে একটা পথ দেখতে পেলে। হেসে বললে: 'ধরো, আমরা যদি সহমরণে যাই —একসঙ্গে মরি যদি দুজনে?'

'আহা! স্বার্থপর, নগ্ন নির্লজ্জ স্বার্থপরতা! কেশবন নায়ার যখন মারা যাবে, তখন আমাকেও মরতে হবে—না?'

'স্যারাম্মা, তুমি আমাকে নিয়ে মশকরা করছো।'

'মোটেই না। তথ্যগুলো যাচাই ক'রে নেয়াকে কি মশকরা করা বলে? আমি কি মেয়েমানুষ নই? আমার মাথার খুলি যদি ফেটে দু-ভাগ হ'য়েও যায়, কোথায় পাবে তুমি আমার মগজ?'

'আমাকে মাফ করো। স্যারাম্মার জ্ঞান-বুদ্ধি-রূপ কোনোটাই আমার নেই।'

'এই তো, এবার কে ঠাট্টা করছে আমাকে!'

'স্যারাম্মা, আমি তোমাকে কক্ষনো ঠাট্টা করবো না—না, না, না!'

'বেশ, তবে যত পারো রসিকতা করো আমায় নিয়ে।'

কেশবন নায়ারের ভেতরটায় একটা স্নায়ু ছিঁড়ে গেলো। 'আমি আমার জীবন-সঙ্গিনীকে নিয়ে কখনো রসিকতা করতে পারি? আমার জীবনের দেবীকে নিয়ে আমি কখনো মশকরা করতে পারি? আমার প্রাণ, আমার আত্মা—তাকে কি আমি কখনো ঠাট্টা করতে পারি? আমি কী ক'রে আমার জীবনের দিব্যানুভূতিকে নিয়ে পরিহাস—'

স্যারাম্মা তার তোড়টায় বাধা দিলে। 'দয়া ক'রে থামো! তোমাকে একটা কথা জিগেশ করতে চাই।'

'জিগেশ? আদেশ করো।'

'আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী হ'তে হবে বুঝি?'

'হবে কেন—হ'য়ে আছো।'

'কবে থেকে?'

'অনেকদিন আগে থেকে?'

'অনেক মানে কতদিন?'

'অনেক, অনেক দিন আগে থেকে।'

'তাহ'লে অ্যাদ্দিন আমায় সে-কথা তুমি বলোনি কেন?'

'বলিনি তোমাকে? তোমার কথা আমি রোজ ভাবি, সারাক্ষণ। রোজ তোমাকে একটা ক'রে প্রেমপত্র লিখি আমি।'

'আর তারপর?'

'তারপর সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলি।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই: আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী হ'তে হবে? তাহ'লে আমি যা বলবো, সব তুমি শুনবে—তাই না?'

কেশবন নায়ারের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ: 'যা তুমি বলবে—সব? কাউকে খুন করতে হবে? ক'রে আসবো। তুমি চাও আমি সাঁৎরে সমুদ্র পেরোই? পেরুবো। আমি পাহাড় হাতে নিয়ে লোফালুফি করবো। আমি তোমার জন্য মরতেও প্রস্তুত, স্যারাম্মা।'

'আপাতত তোমায় মরতে হবে না—শুধু মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াও একবার। আমরা দেখি।'

'তুমি সত্যি চাও আমি মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াই?'

'ওঃ, এ-সবের মধ্যে আবার "সত্যি" ব'লে একটা হুমদো কথাও আছে।'

'না!' কেশবন নায়ার সানন্দে উঠে দাঁড়ালে। 'মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেই চলবে তো?'

'আপাতত চলবে বটে।'

'ঠিক হ্যায়!'

সে গা থেকে শার্টটা খুলে চেয়ারে রাখলে। তারপর ধুতিটা হাঁটু অব্দি তুলে মালকোঁচা মারলে। তারপর মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো, শূন্যে ঠ্যাং দুটো তোলা।

স্যারাম্মা খুশি-খুশি মুখে তাকিয়ে দেখলে তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল। তারপর মন্তব্য করলে: 'শাবাশ!'

ঐ অবস্থা থেকেই কেশবন নায়ার জিগেশ করলে : 'স্যারাম্মা কি আমায় ভালোবাসে ?'

স্যারাম্মা চুপ ক'রে রইলো।

কেশবন নায়ার আবার জিগেশ করলে : 'স্যারাম্মা, তুমি কি কাজটা নিয়েছো ?'

আস্তে, সাবধানে, কোনো আওয়াজ না-ক'রে, স্যারাম্মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, তারপর নিচে থেকে চেঁচিয়ে বললে : 'কাল তোমাকে জানাবো !'

'স্যারাম্মা, তুমি নিয়েছো তো কাজটা ?' পরদিন কেশবন নায়ার তাকে জিগেশ করলে !

স্যারাম্মা বললে : 'তোমাকে কাল বলবো।'

পরদিন আবার কেশবন তাকে একই কথা শুধোলে, আর স্যারাম্মাও সেই একই জবাব দিলে : 'কাল তোমাকে বলবো।'

পরদিন যখন কেশবন নায়ার তাকে আবারও এই একই প্রশ্ন করলে, স্যারাম্মাও সেই একই জবাব দিলে : 'আমি তোমাকে কাল বলবো !'

পরের দিন আবার কেশবন নায়ার তাকে প্রশ্নটা করলে আর স্যারাম্মা উত্তরে বললে : 'আমি তোমাকে কাল বলবো !'

কেশবন নায়ার পরদিন আর তাকে প্রশ্নটা করলে না। সে একটা ঘোষণা করলে বরং : 'আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি ! বেঁচে থেকে আর কী লাভ ?'

'চমৎকার প্রস্তাব ! এবার কেউ একটা শোকগাথা লিখতে পারবে !'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে : 'তো, তুমি তাহ'লে আত্মহত্যা করবে ব'লে ঠিক করেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'শুভক্ষণটি কখন আসবে ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে : 'কীভাবে আত্মহত্যা করবে ?'

'এ-বিষয়ে এখনও মনস্থির করিনি। আমি ভাবছি।'

স্যারাম্মা পরামর্শ দিলে : 'রেললাইনে মাথা পেতে দিয়ে মরতে পারো। কিংবা গলায় দড়ি দিতে পারো। এ-দুটোর মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। কী নিষ্ঠুর প্রাণ এর !

স্যারাম্মা আবারও পরামর্শ দিলে : 'আরেকটা উপায় অবশ্য আছে, কেউ জানতেও পাবে না। একটা ছোট্ট ডিঙি নাও, সঙ্গে ভারি একটা পাথর, আর একটা দড়ি।

সন্ধেবেলায় চুপি-চুপি লেকের মাঝখানটায় বেয়ে চ'লে যাও। তারপর দড়ির একদিক বাঁধো পাথরটায়, অন্যদিকটা ফশকা গেরো দিয়ে নিজের গলায় প'রে নাও। পা দিয়ে ডিঙিটাকে সরিয়ে দিতে হবে তোমায়—তারপর ডুবে মরো!'

ডবোল নিঠুর প্রাণ এর!

কেশবন নায়ার বললে: 'আমি নিজে আরেকটা উপায় ভেবেছি। আমি এখানেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বো। গলায় দড়ি দেবার সময় আমার পায়ে বাঁধা থাকবে মস্ত একটা কাগজ। তাতে বলা থাকবে: "শোনো, সারা জগৎ! স্যারাম্মা আর আমার মৃত্যুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই! এটা সত্যি যে আমি স্যারাম্মাকে ভালোবাসি আর স্যারাম্মা আমাকে ভালোবাসে না! এটাও সত্যি যে আমি ওকে যে প্রেমপত্র লিখেছিলুম সেটা সে দলামোচা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। তবু আমার মৃত্যুর সঙ্গে স্যারাম্মার কোনো সম্বন্ধই নেই। প্রয়াত কেশবন নায়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত"।'

'আর-কোনো খবর আছে?'

'না।'

স্যারাম্মা বললে: 'প্রেমপত্রটা আমি ছুঁড়ে ফেলিনি। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাতে আমি দাঁতের মাজনের গুঁড়ো মুড়ে রেখেছি।'

'আমার প্রেমপত্রে?'

'হ্যাঁ!'

রমণীহৃদয়ের কী কঠিনতা! কেশবন নায়ার কিছু বললে না আর। কত-যে লক্ষ্যহীন দিন কাটলো তার হিশেব নেই। মুখটা তার গম্ভীর থাকে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, কারুর দিকে তাকায় না।

মেয়েদের সে দু-চক্ষে দেখতে পারে না! 'হাঁদার দল! আকাট! পাষাণহৃদয়া!' স্যারাম্মা একটা হাঁদার হদ্দ! আর নিঠুরহৃদয়া! কেশবন নায়ার নিজেও হাঁদার হদ্দ একটা। কিন্তু তার হৃদয় কঠিন নয়। পৃথিবীর সব নারী-পুরুষই হাঁদার হদ্দ—প্রত্যেকে! কেশবন নায়ারের এই মত যখন কেলাসিত হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় স্যারাম্মা উঠোনে এসে তার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালে, যেন সে কিছু একটা প্রত্যাশা করছে। কেশবন নায়ার ভেবেই পেলে না সেটা কী হ'তে পারে।

স্যারাম্মা বললে: 'আমার মাইনেটা?'

'মাইনে? কীসের মাইনে?' কেশবন নায়ার কেমন বোমকে গেলো। তার এই ভ্যাবাচ্যাকা দশা দেখে স্যারাম্মা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে। তার গলার স্বরে বেশ ক্ষোভ, যেন সে তার কথা রাখেনি ব'লে স্যারাম্মা দারুণ অপমানিত বোধ করছে, 'ওঃ, ব্যাপারটা তাহ'লে এই রকম! আমার আগেই তা বোঝা উচিত ছিলো। লোকে কি

আর সাধে এ-কথা বলে যে আমার মাথায় কেবল চাঁদের আলোটালো পোরা আছে ? ঐ ভীষণ খাটুনির কাজটা নেবার পর পনেরো দিন কেটে গিয়েছে !'

'ওঃ !' কেশবন নায়ারের মুখের মেঘ কেটে গেলো, চোখ চকচক ক'রে উঠলো ! আকস্মিক সুখে তার বুক ফুটবলের মতো ফুলে উঠলো, বুকের বাঁ দিকের পাঁজরে কেমন একটা চাপ।

'সোনা ! এ-কথা তুমি আমাকে বলোনি কেন ?'

স্যারাম্মা আহত স্বরে নালিশ করলে : 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায় জীবন যখন টগবগ ফুটছে তারুণ্যে আর বুকে ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—লোকে যদি তখন মুখ করুণ ক'রে আত্মহত্যার কথা বিড়বিড় করে, কিছু শোনেও না, দ্যাখেও না—তবে আমার আর কী করার থাকে ?'

'আর-কোনো খবর নেই তবে, না কি আছে ?'

'না !'

কেশবন নায়ার হুকুমের স্বরে বললে : 'এসো !'

সে এগিয়ে গেলো, তার স্যারাম্মা গেলো তার পেছন-পেছন ! সিঁড়ি বেয়ে উঠলো তারা দোতলায়, কেশবন নায়ার ঢুকে পড়লো তার ঘরে, স্যুটকেসটা খুললো, বার ক'রে নিলে দুটো দশটাকার নোট, তার বুকে তখন টিপটিপ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, সে একটা খামের মধ্যে নোট দুটোকে পুরে ওপরে লিখলো 'শ্রীমতী স্যারাম্মার সমীপে,' তারপর সেটা তার হাতে তুলে দিলে।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে : 'এ কি কোনো প্রেমপত্র নাকি ?'

কেশবন নায়ার কোনো কথা বললে না। প্রেমপত্র ? তা ভাবুক না স্যারাম্মা যা-খুশি !

কিন্তু স্যারাম্মার মধ্যে উদ্বেগের কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। পাকা ব্যবসাদারের মতো সে খাম থেকে নোটগুলো বার ক'রে নিলে, তারপর আলোয় তুলে ধ'রে খুব গম্ভীরভাবে সেগুলো উলটেপালটে দেখতে লাগলো।

'জাল নোট নয় তো এগুলো, অ্যাঁ ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

'বেশ,' স্যারাম্মা সাবধান ক'রে দেবার স্বরে বললে,'এর পর থেকে কিন্তু আর এ-রকম দেরি কোরো না। আমার মাইনেটা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় চাই—একেবারে মাসপয়লায়।'

কেশবন নায়ারের ইচ্ছে হচ্ছিলো স্যারাম্মাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে একশো হাজার চুমোয় ওকে ভরিয়ে দেয়। সে তার কাছে এগিয়ে গেলো।

স্যারাম্মা বললে, 'চার হাত দূরে দাঁড়ালেই হবে—অত কাছে না—'

'আমি তোমাকে চুমু খেতে চাই।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এ রকম কোনো কথা তো চুক্তিতে ছিলো না, তাই না?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

এইভাবে এক-এক ক'রে পাঁচমাস কেটে গেলো। সবমিলিয়ে একশো টাকা হাত বদল হ'লো। কেশবন নায়ার ঘুণাক্ষরেও জানতে চায়নি ও-টাকা দিয়ে সে করছে কী, কিন্তু তৃতীয় মাসে স্যারাম্মা তাকে জানালে যে সে একটা লটারিতে হাজার টাকা জিতেছে। কেশবন নায়ার তাকে যে-মাইনে দিয়েছিলো, তারই থেকে এক টাকা দিয়ে সে লটারির টিকিট কিনেছিলো—সেই টাকাটার কল্যাণেই জিতেছে! কেশবন নায়ার কিন্তু এ-কথায় খুব একটা পাত্তা দিলে না। তুচ্ছ টাকাকড়ির ব্যাপারে সে মন দেয় কী ক'রে? সে তো প্রেমের জোৎস্নায় আলো হ'য়ে আছে, তার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তাকে যা-ই বলে তাতেই সে বিশ্বাস করে, প্রতিদানে সে যে কিছুই পাচ্ছে না, এতে তার কিছুই এসে যায় না। যা তার ইচ্ছে, তাতেই তথাস্তু। সে যেদিকে যেতে বলবে কেশবন নায়ার সেদিকেই যাবে। স্যারাম্মার ইচ্ছে অনুযায়ীই কেশবন নায়ার দূর দূর জায়গায় চাকরির দরখাস্ত পাঠাতে লাগলো। কেন? না, স্যারাম্মা তাকে পাঠাতে বলেছে। তবে স্যারাম্মা তাকে করতে বলেনি, এমন কাজও কেশবন নায়ার করছে বৈ কি! স্যারাম্মার অসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যি ডেকে আনছে, তার তার জন্য ওষুধ-পথ্য কিনছে, তার আর তার সৎমার মধ্যে যাতে ভাব হয় সেজন্য চেষ্টা করছে, পিতামাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে স্যারাম্মার বাবার কাছে লেকচার দিচ্ছে—এইসব। স্যারাম্মার কিন্তু তার এ-সব কাজের জন্য মুখ ফুটে ধন্যবাদ দেয়া দূরের কথা তাকে দেখলে মোটেই একটুও কৃতজ্ঞ ব'লে বোধ হয় না। কেশবন নায়ার সব সহ্য করছে হাসি মুখে। কিন্তু যেটা তার একেবারে অসহ্য ঠেকে সেটা হ'লো স্যারাম্মার এই ভঙ্গিটা, কোনো কথা পাড়বার আগে সে সবসময় ভণিতা হিশেবে বলে: 'এত ছোট্ট আয়ুটার জীবন যখন টগটগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—' এ-কথাটা শোনবামাত্র কেশবন নায়ার কেমন পাণ্ডুর হ'য়ে যায়। যখনই স্যারাম্মা কিছু বলবার জন্য মুখ খোলে, সে উৎকণ্ঠায় থাকে এই বুঝি সে ঐ কথা শুরু করেছে। ও-কথা সে না-বললে কেশবন নায়ার খুব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। এ-সব সত্ত্বেও তার প্রেম কি একটুও কমেছে? একতিলও না। বরং দিনে-দিনে প্রেম তার বেড়েই চলেছে। সবসময়েই তার স্যারাম্মাকে চোখে-চোখে রাখতে ইচ্ছে করে। তাকে জড়িয়ে ধ'রে তার চুমো খাবার ইচ্ছে করে, আর—। তার কামনার কি কোনো শেষ আছে?

আর স্যারাম্মা ? সে যে কেশবন নায়ারের প্রেমে পড়েছে এমন কোনো লক্ষণই তার হাবভাবে দেখায় না—না-কথায় না-কাজে, কিছুতেই মনে হয় না যে সে কেশবন নায়ারকে ভালোবাসে।

তারপর একদিন এলো, যখন তুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ অত্যাসন্ন হ'য়ে উঠেছে। দূরের কোন-এক শহরে একটা চাকরি পেয়েছে কেশবন নায়ার, মাইনে পাবে আড়াইশো টাকা। স্যারাম্মার পরামর্শ অনুযায়ী কেশবন নায়ার লিখে জানিয়েছে যে সে চাকরিটা নেবে। স্যারাম্মা বলেছে 'এখন থেকে, তাহ'লে, আমার মাইনে হবে একশো পঁচিশ টাকা।'

ব্যস, শুধু এই। তার যেন আর কিছুই বলার নেই। তবু, স্যারাম্মা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে : 'প্রতি মাসের এক তারিখে তুমি মানি অর্ডার করবে। ঠিকানাটা তো জানো, না ভুলে গেছো ?'

কেশবন নায়ার কিছুই বলেনি।

স্যারাম্মা জিগেশ করেছে : 'তা, কবে যাচ্ছো, শুনি !'

কেশবন নায়ার বলেছে : 'তুমি তো জানোই আমাকে দশ দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। ভাবছি পরশু রওনা হবো। ব্যাঙ্কের কাজটায় আমি ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি।'

'যাবে ব'লেই ঠিক করেছো তুমি, তাই না ?'

'এ আবার কেমনতর প্রশ্ন ?'

'আমি তো এখনও তোমার জীবনের দেবী, তাই নয় কি ?'

হঁ্যা।'

'আমার জন্য তুমি কি মরতেও রাজি আছো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'শপথ ক'রে বলতে পারবে ?'

'আমি দিব্যি গেলে বলছি।'

স্যারাম্মা বলেছে : 'অবশ্য, মরতে তোমাকে হবে না। তবে আমি যদি বলি এ-চাকরিটা নিয়ো না, তবে নেবে না তো ?'

চাকরিটা নেবে না ? সে যে তাহ'লে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে যাবে। বাড়িভাড়া দিতে পারবে না, খেতে-পরতে পারবে না। তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে রাস্তায় রাস্তায়, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে ! ভাবুক-ভাবুক মুখ ক'রে গালে হাতে দিয়ে কেশবন নায়ার চুপ ক'রে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

স্যারাম্মা উঠে প'ড়ে এগিয়ে গেছে সিঁড়ির দিকে। কেশবন নায়ার কষ্ট-কষ্ট গলায় ডেকেছে তাকে : 'স্যারাম্মা, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

স্যারাম্মা ফিরে এসেছে।

'প্রেমের কথা যদি বলতে চাও, তবে শোনো—ও-কথা শুনলেই আমার গা রী-রী ক'রে ওঠে!'

কেশবন নায়ার কিছু আর বলেনি।

স্যারাম্মা বলেছে : 'কী হ'লো? বলো! আমি যখন মাইনে পাই, তখন কী ক'রে বলি যে তোমার কথা শুনবো না।'

'আচ্ছা, স্যারাম্মা, সবকিছুই তোমার কাছে ঠাট্টা ব'লে মনে হয়, তাই না?'

'তুমি কি এ-কথাটা বলবার জন্যে আমায় ডেকেছিলে?'

'না।'

'তাহ'লে?'

'স্যারাম্মাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে। আমি ওখানে একা থাকতে পারবো না।'

স্যারাম্মাকে দেখে মনে হয়েছে. সে বুঝি এক্ষুনি হাসিতে ফেটে পড়বে। জিগেশ করেছে : 'ভয় করছে তোমার?'

'না আমি স্যারাম্মা। আমি তোমাকে ভালো...'

'স্যারাম্মা আমি তোমাকে ভালোবসি! এ-কথাটা বোধহয় একশো হাজার বার শুনেছি! তা এই ভালোবাসা ব্যাপারটা কী?'

এ-কথার জবাব দেয়া খুবই কঠিন! কেশবন নায়ার খুব ভালো ক'রেই জানে ভালোবাসা কাকে বলে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলতে তার কেমন যেন লজ্জা করে।

'স্নেহ, ভালোবাসা—এ-সব যেন চাঁদের আলোর মতো···প্রেম হ'লো যেন সুবাসিত জোৎস্না,—'

'চাঁদের আলো! জোৎস্না!' স্যারাম্মা ভারি অবাক হ'য়ে গেছে। 'তুমি না বলেছিলে এ-সব থাকে মেয়েদের মগজে?'

কেশবন নায়ার সায় দিয়ে ঘাড় নেড়েছে। একটু পরে বলেছে : 'তুমি আমার সঙ্গে আসবে, স্যারাম্মা?'

'এসে করবোটা কী?'

'আমার বউ হ'য়ে থাকবে।'

'আমাদের দুজনের ধর্ম কি আলাদা নয়?'

'তাতে কী হয়েছে? আমরা রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করবো।'

'কোনো পণ চাই না তোমার? যৌতুক?'

'স্যারাম্মাই আমার যৌতুক! স্যারাম্মাই আমার···'

'থামো, থামো! আমার আরো-সব খটকা আছে।'

'কী সে-সব?'

আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিশেবে থাকার বিস্তর ঝামেলা আছে। একজন যখন পুজো দিতে মন্দিরে যাচ্ছে আরেকজন যাচ্ছে চার্চে—উপাসনায়! আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে কী করতে পারবো? গির্জে আর মন্দির—এ দুটো সবসময়েই আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে—তাই না?'

কেশবন নায়ার খুশিতে ডগমগ ক'রে উঠেছে। 'এ আর এমন কী?' সে ব'লে উঠেছে: 'ও-সব গির্জেটির্জে মন্দিরটন্দির ছাড়াই আমাদের চলবে—চলবে না? চার্চ আর মন্দির যদি স্যারাম্মা আর কেশবন নায়ারকে না-চায়, তবে স্যারাম্মা আর কেশবন নায়ারেরও চার্চ আর মন্দিরে কোনো কাজ নেই। ভেবে দ্যাখো একবার, স্যারাম্মা! ভেবে দ্যাখো, কত কষ্ট তুমি সয়েছো! তোমার বাবা আর সৎমা তোমার সঙ্গে বেদম খারাপ ব্যবহার করেননি অ্যাদ্দিন? চার্চ তখন তোমার কী করেছিলো? কী করেছিলেন তখন, ঈশ্বর? মন্দিরও আমার কোনো উপকার টুপকার করেনি! এক কথায়, যদি ঈশ্বর, চার্চ আর মন্দির আমাদের না-ই চায়, তবে তাই-সই—আসুক তারা, আমাদের পায়ে প'ড়ে থাকুক!'

'অতীব খাঁটি কথা!' স্যারাম্মা বলেছে: 'কিন্তু আমার আরো অনেক সংশয় আছে—'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'বলো স্যারাম্মা, বলো। তোমার এই কেশবন নায়ার তোমার সব সংশয় ঘুচিয়ে দেবে!'

হঠাৎ একটু লাজুক হ'য়ে পড়েছে স্যারাম্মা। বলেছে: 'আরেকটা ব্যাপার আছে—'

'বলো, বলো!'

সে বলেছে: 'আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না? তাদের ধর্ম কী হবে? আমি ওদের হিন্দু হিশেবে বড়ো ক'রে তুলতে চাই না। আবার খ্রীস্টান হিশেবেও যে তাদের বড়ো করা হবে—আমার—আমার স্বামী তা চাইবে না। সেক্ষেত্রে তাদের ধর্ম কী হবে?'

কেশবন নায়ারের ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিলা! এ-কথাটা তো তার মাথায় আসেনি। অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন এটা—ছেলেমেয়েদের ধর্ম কী হবে? কেশবন নায়ার এ নিয়ে ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলো। অনেক, অনেক ভেবেছে সে—গভীর ভাবে, প্রখর ভাবে। তার কপালের শিরগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে দু-ধারে। কপালে ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। এই জটটা খুলে তবু কোনো সহজ সমাধান তার চোখে পড়েনি! অন্ধকারে হাৎড়েছে সে ব্যাকুল ভাবে। কোথাও কোনো আলোর লেশও দেখা যায়নি! শেষটায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিলো তার মাথায়। যেন আলোজ্বালা একটা দরজা খুলে গেছে সামনে, তার ও-পাশে আছে একটা চমৎকার বাগান। সে উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে: 'হ্যাঁ, পেয়েছি!'

'কী ?'

'বলছি.' কেশবন নায়ার তাকে জানিয়েছে। 'কোনো ধর্ম অনুযায়ীই আমরা ছেলেমেয়েদের বড়ো করবো না। কোনো ধর্ম ছাড়াই তারা বড়ো হ'য়ে উঠবে !'

'আর তারপর ?'

'কেন, ওরা যখন বড়ো হবে আমরা নিরপেক্ষভাবে সবগুলো ধর্মের কথাই ওদের ব'লে দেবো। কুড়ি একুশ বছর বয়সে, তারপরও, যদি ওদের কোনো ধর্ম কাজে লাগে, তাহলে যে-ধর্ম ইচ্ছে সেই ধর্মেই ওরা দীক্ষা নেবে।'

কেশব নায়ারের মুখের দিকে না-তাকিয়েই স্তারাম্মা খুশি-খুশি গলায় বলেছে 'এতে অবশ্য যুক্তি আছে···আর নাম ? ধরা যাক, প্রথমে আমার এক ছেলে হ'লো। তো ছোট্ট সোনার নাম কী হবে ?'

কেশবন নায়ার মুশকিলে পড়েছে আবার। 'সত্যি তো, ছোট্ট সোনার নামটা কী হবে ? ওকে আমরা হিন্দু নামও দিতে পারবো না, আবার খ্রীস্টান নামও দিতে পারবো না।' কেশবন নায়ার ভেবেছে একটু গভীরভাবে, তারপর আবার উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠেছে : 'জানো, আমরা অন্য কোনো সম্প্রদায় থেকে বেছে-বেছে কোনো দারুণ নাম দিতে পারি ওকে। ছিমছাম, সপ্রতিভ, সুন্দর !'

'তখন ও-সম্প্রদায়ের লোকেরা কি ভাববে না যে সে তাদেরই একজন ?'

'ঠিক !' কেশবন নায়ার তক্ষুনি সায় দিয়েছে। 'যদি কোনো মুসলমানি নাম দেয়া হয় তো লোকে ভাববে যে সে বুঝি মুসলমান। পার্শি নামের বেলাতেও তথৈবচ। কোনো রুশী-চীনে নামেও সেই একই ঝামেলা বেঁধে বসবে।'

'কী নাম দেবে ছেলের ? এমন-একটা নাম হওয়া চাই, যেটা এর আগে আর-কেউ কখনো ব্যবহার করেনি। নাম শুনে যেন কেউ ধর্মটর্ম সম্বন্ধে কোনো আঁচই না-পায়। এমন নাম কোত্থেকে পাবে ওরা ?'

হঠাৎ স্তারাম্মা তখন বলেছে : 'একটা চীনে নাম কেমন শোনাবে ?'

কেশবন নায়ার একটা দৃষ্টান্ত চাখিয়েছে : 'সিং লি কো।'

'সিং লি কো ?' স্তারাম্মা তার প্রথমজাত শিশু, তার সোনামণির নামটা উচ্চারণ করেছে। 'ওরে হতচ্ছাড়া, ওরে সিং লি কো, কোথায় গেলি হতভাগা ?—সিং লি কো ?'

'বাঃ, কেমন একটা স্টাইল আছে, না ?'

'উঁহু,' স্তারাম্মার মোটেই পছন্দ হয়নি। 'না, আমার ছেলের জন্য অমন নাম আমি চাই না !'

'তাহ'লে রুশী নাম। যে-কোনো একটা নামের পেছনে "স্কি" জুড়ে দাও।'

স্তারাম্মা বলেছে : 'কোন্ "স্কী" ?'

'যে-কোনো নামের সঙ্গে জুড়ে দাও।'

'স্বি ...স্বী...উঁহু! চলবে না!

'এইবারে পেয়েছি!—দারুণ নাম, দারুণ স্টাইল!' কেশবন নায়ারের কল্পনা বল্গাহীন ছুটে বেরিয়েছে, সে একটার পর একটা নাম ব'লে গেছে: 'ভারতবর্ষ। প্রেমপত্র। ছোটোগল্প। তুফান। সাহারা। আকাশ। চন্দ্রালোক। মুক্তো। প্রতীকীবাদ। তাল। লজেনচুষ। নবনাট্য। সাগর। চিংড়িচোখো। গদ্যকবিতা। পোখরাজ। অগ্নিশিখা। অধ্যাত্মবাদ। তারা—'

'থামো, থামো! আমি একবার পরখ ক'রে দেখি নামগুলো: "কই রে বেটা, চিংড়িচোখো! মায়ের সোনা চিংড়িচোখো!"···না—!'

সে অন্য নামগুলোও হেঁকে দেখেছে। 'কই রে সোনা, গদ্যকবিতা? ওরে হতচ্ছাড়া ছোটোগল্প! ওরে দুষ্টু, চন্দ্রালোক!'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'এসো, বরং কাগজের টুকরোয় নামগুলো লিখে চোখ বুঁজে তুলে নিই। দুজনে দুটো—। ডবোল নাম আজকাল খুব খাচ্ছে—দারুণ ফ্যাশন!'

স্যারাম্মা রাজি হয়েছে।

ছোটো-ছোটো কাগজের টুকরোয় নামগুলো লিখে তারা সেগুলো মিশিয়ে দিয়েছে। স্যারাম্মা তারপর একটা কাগজ তুলেছে, কেশবন নায়ার আরেকটা। কেশবন নায়ার তার কাগজটা খুলে বলেছে: 'লজেনচুষ!'

স্যারাম্মাও তার কাগজটা খুলেছে, নিচু গলায় বলেছে: 'আকাশ!'

দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েছে তারপর।

স্যারাম্মাই সাহস ক'রে চেঁচিয়ে ডেকেছে তার ছেলেকে: 'লজেনচুষ-আকাশ! ওরে, নচ্ছার, লজেনচুষ-আকাশ!···আমার সোনা লজেনচুষ-আকাশ!···'

'ভুল!' কেশবন নায়ার তাদের ছেলের নামটা শুধরে দিয়েছে, গম্ভীর গলায় ডেকেছে: 'আকাশ-লজেনচুষ!'

স্যারাম্মার সেটা দারুণ মনে ধরেছে। সে একেবারে স্নেহে গ'লে গিয়ে ডেকেছে: 'আকাশ-লজেনচুষ! ···আমার সোনা আকাশ-লজেনচুষ! আকাশ-লজেনচুষ, কোথায় তুই?

'চমৎকার!' কেশবন নায়ার তার রায় দিয়েছে: 'মিস্টার আকাশ লজেনচুষ! শ্রীযুক্ত আকাশ লজেনচুষ! কমরেড আকাশ-লজেনচুষ!'

স্যারাম্মা আঁৎকে উঠেছে: 'আমার সোনামণি কি কমিউনিস্ট না কি?'

কেশবন নায়ার হেসে উঠেছে: 'প্রশ্নের ছিরি ভাখো! ও যা হ'তে চায়, তাই হোক

না, ক্ষতি কী ! ওর যা খুশি ও তা-ই হবে—'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে যে-দলেই যোগ দিতে চাক, দেবে !

আমার ছেলে ? স্যারাম্মার ছেলে ? কেশবন নায়ার চ'টে উঠেছে ! স্বার্থপর !

সে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে : 'স্যারাম্মা, এতক্ষণ ধ'রে তুমি কেবলই বলেছো, "আমার সোনা", "আমার ছেলে"—সেটা তোমার খেয়াল আছে ? এমন স্বার্থপরতা মোটেই ভালো কথা না ! লোকে যদি তোমার কথা শোনে তবে ভাববে যে আকাশ-লজেনচুষের ওপর বুঝি আমার কোনো দাবিই নেই ! এখন থেকে তোমাকে বলতে হবে "আমাদের ছেলে"। নারী, তুমি বুঝিয়াছো ?'

স্যারাম্মাও অমনি তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠেছে। 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো !' তার মুখ দেখে মনে হয়েছে সে বুঝি তেতো একটা বড়ি গিলেছে। 'আমি কেবল এ-প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাচ্ছিলুম, ব্যস, এইমাত্র ! ভুলেও ভেবো না যে আমি তাই ব'লে তোমার বউ হ'য়ে গিয়েছি। বুঝলেন, মিস্টার কেশবন নায়ার ?'

অমনি কেশবন নায়ারের মুখ করুণভাবে ঝুলে পড়েছে। সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেছে, 'কিন্তু, স্যারাম্মা, তুমি আগে কী বলেছো ?'

'কী বলেছি ?'

'যে তুমি আমার বউ হবে ?'

'আর তারপর ?'

'অ্যাঃ, স্যারাম্মা, তুমি কেবল আমাকে ঠাট্টা করছো !'

'ঠাট্টা ? তুমি জানো হাসিকৌতুক জীবনের কী ?'

'আমি জানতে চাই না।'

'বাঃ, চমৎকার ! তুমি আমার কথাটাও শুনতে চাও না ! আমি তোমার কাছে নিছকই একটা "নারী"। আমি না তোমার জীবনসঙ্গিনী ! আমি না তোমার জীবনের দেবী !'

'বলো, স্যারাম্মা, কী সেটা ?'

'কোনটা ?'

'জীবনের কাছে হাসিকৌতুক কী ?'

'আঃ, ও-রকম একটা হাসি—' সে উঠে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে চেঁচিয়ে বলেছে : 'জীবনেরই সুবাস !'

কৌতুক, তবে, জীবনেরই সুবাস। না, মোটেই খারাপ নয় কথাটা !

'স্যারাম্মা কাল খুব ভোরেই আমাকে চ'লে যেতে হবে।' সন্ধে হচ্ছে তখন, কেশবন

নায়ার বললে স্যারাম্মাকে, 'চূড়ান্ত-কিছু আমাকে তোমার বলার আছে, স্যারাম্মা— কোনো শেষ কথা ?'

স্যারাম্মা বললে : 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায়, জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর হৃদয় ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—কতগুলো প্রশ্ন আছে।'

হঠাৎ কেশবন নায়ারের ভীষণ মন খারাপ হ'য়ে গেলো।

স্যারাম্মা ব'লে চললো : 'প্রশ্ন এক—বাবার কাছে বাড়িভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছো ?'

'দিয়েছি !'

'চমৎকার ! প্রশ্ন দুই—রেস্তোঁরার সব টাকা শোধ দিয়েছো ?'

'দিয়েছি।'

'প্রশ্ন তিন—তোমার রাহাখরচ সব আছে ?'

'আছে।'

'তাহ'লে আরো-একটি ছোট্ট আনুষঙ্গিক প্রশ্ন—টাকা পেলে কোত্থেকে ?'

'হাতঘড়িটা আর সোনার আংটিটা বেচে দিয়েছি '

'শাবাশ ! তাহ'লে মাননীয় কেশবন নায়ার একবার এখান থেকে চ'লে গেলে তাঁর কথা আর কারু ভুলেও কখনো মনে পড়বে না। আমি তাঁকে আমার যাবতীয় শুভেচ্ছা জানাই !'

এই ব'লে স্যারাম্মা হাসতে-হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো।

বুকে কেমন একটা কষ্ট নিয়ে কেশবন নায়ার চেঁচিয়ে ডাক দিলে : 'স্যারাম্মা !'

কে শোনে ওর ডাক ? কঠিন হৃদয়েরই অন্য নাম স্ত্রীলোক। ঠিক তাই—এর মধ্যে আর-কোনো কথাই নেই !

কেশবন নায়ার চুপচাপ ব'সে রইলো একটা জ্যান্ত মড়ার মতো। রাত্রি এলো। আকাশে উঠে এলো চাঁদ। কেশবন নায়ার ব'সেই রইলো। শেষটায় যখন সে উঠে গিয়ে বাতি জ্বাললো, তার অ্যালার্ম ঘড়ি বললে রাত বাজে এগারোটা।

ভোর চারটের জন্য অ্যালার্ম লাগিয়ে দিয়ে সে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো বিছানায়, অবসন্ন। শেষ রাত এটা ! খিদে, তেষ্টা তার কোনো বোধই তার নেই। কেশবন নায়ার শুয়ে রইলো, চোখ-দুটি খোলা। কিছুই ভাবছে না সে, অথচ চোখ-দুটি জলে ভ'রে উঠছে। নিষ্ঠুর জন্তু এই মেয়েরা ! পুরুষরা কত ভালো ! ভগবান কেন এই মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন ? এর পেছনে তাঁর কি কোনো উদ্দেশ্য ছিলো ? কেশবন নায়ার প্রায় কান্নায় ফেটেই পড়ে বুঝি।

হঠাৎ বাইরে এক গলার স্বর···নরম, গানের সুরের মতো : 'ঘুমিয়ে পড়েছো '

ও ? ঘৃণ্য নিষ্ঠুর ! পাষাণ হৃদয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি !

কেশবন নায়ার চুপ ক'রে রইলো!

আবার সেই একই গলা: 'খোলো! আমি এসেছি!'

কেশবন নায়ার উঠে প'ড়ে দরজা খুলে দিলে।

স্যারাম্মা ঢুকে পড়লো ভেতরে। কেশবন নায়ার দাঁড়িয়েই রইলো দরজায়।

স্যারাম্মা খুব নরম ক'রে বললে. 'একটু কাছে এসো না। তোমাকে একটা কথা বলবো।'

কেশবন নায়ার ফিরে এসে বিছানায় বসলো। স্যারাম্মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলো চুপচাপ। সব ঠিক আছে। সে দরজা বন্ধ ক'রে চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে, ব'সে পড়লো। তার চুল খোলা—কনুই দুটো বিছানায় ভর দেয়া। দুই হাতের ফাঁকে তার গাল, তার স্তন দুটি ছুঁয়ে আছে জাজিম।

কেশবন নায়ারের ইচ্ছে করছিলো ঐ স্তন দুটোয় চুমো খায়। কিন্তু সে নিজেকে কঠিনভাবে শাসন ক'রে বালিশে হেলান দিলে। তার চোখ দুটো এখনও জলে ভরা।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে: 'তুমি কাঁদছো কেন?'

কেশবন নায়ার কোনো সাড়া দিলে না। স্যারাম্মা উঠে বিছানায় বসলো. তারপর কেশবন নায়ারের দিকে ঝুঁকে হঠাৎ তার ঠোঁটে একটা সাংঘাতিক মিষ্টি চুমো খেলো!

মৃদুস্বরে ফিশফিশ ক'রে জিগেশ করলে: 'আমার ওপর আর-কোনো টান নেই বুঝি তোমার?'

'আছে।' কেশবন নায়ার তাকে বুকে টেনে আনলে। আর তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু তার হাসির মধ্যে দেখা গেলো তবু তার গাল বেয়ে দরদর ক'রে চোখের জল ঝরছে।

স্যারাম্মা বললে: 'এ যেন বৃষ্টির মধ্যে রৌদ্রের একটা ঝলক—'

'তোমার মাথায় কত-কী উপমা খেলে যায়—তোমাকে ভোরবেলায় সাড়ে-চারটের সময় আমার সঙ্গে যেতে হবে ট্রেনে ক'রে?'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে যাবো।'

'যদি আসি—'

'উঃফ, স্যারাম্মা সবসময় আমাকে কেবল ঠাট্টা করে।'

'কৌতুক জীবনের কী, সেটা জানো?'

'আমি জানি। আমার মধুরার ঠোঁটে যা আছে, ইত্যাদি।'

'বেশ! আমাকেই ঠাট্টা করো তবে!' স্যারাম্মা তার ব্লাউসের ভেতর থেকে একটা

পুরু খাম বার ক'রে সেটা কেশবন নায়ারের হাতে গুঁজে দিলে। 'শুধু ট্রেন ছাড়বার পরেই খামটা খুলে ভেতরে কী আছে দেখবে তুমি!'

'বেশ ভারি দেখছি!' কেশবন নায়ার বললে: 'এ কি কোনো প্রেমপত্র?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্রই!' স্যারাম্মা ছোট ক'রে হাসলো। 'তোমাকে কিন্তু দিব্যি গেলে বলতে হবে—ট্রেন ছাড়ার আগে এটা তুমি খুলবে না!'

সে বললে: 'আমি দিব্যি করছি!'

'উঁহু, তাতে হবে না। তোমাকে এমন-একটা কিছুর নামে শপথ করতে হবে যার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে।'

কেশবন নায়ার স্যারাম্মার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে শপথ করলে: 'আমার স্যারাম্মা—যার ওপর আমার অগাধ আস্থা আছে, যাকে আমি ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি—আমার সেই স্যারাম্মার নামে শপথ ক'রে বলছি, শুধু ট্রেনে ওঠবার পরেই আমি খামটা খুলে দেখবো ভেতরে কী আছে!'

স্যারাম্মা উঠে প'ড়ে দরজা খুললো। 'ভোরবেলায় যাবার আগে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। এবার শান্তিতে একটু ঘুমোও।'

ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠলো।

কেশবন নায়ার প্রায় তড়াক ক'রে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় চারটে বাজে। সে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হ'লো। জামা কাপড় প'রে সে তার বিছানাপত্র বেঁধে নিলে। তার অন্যসবকিছুই তোরঙ্গে সাজানো হয়েছে, আগেই। বাইরে গিয়ে সে একটা গাড়ি ডাকলো, গাড়োয়ান তার জিনিশপত্তর গাড়িতে তুলে দিলে। তারপর কেশবন নায়ার এসে তার টর্চ জেলে স্যারাম্মার ঘরের জানলা দিয়ে আলো ফেললো, নিচু গলায় ডাক দিলে: 'স্যারাম্মা! স্যারাম্মা! কিন্তু কোথাও কারু কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দরজায় ধাক্কা দিলে আস্তে।

দরজাটা খুলে গেলো।

সে চারপাশে টর্চের আলো ফেললে। ভেতরে কেউ নেই।...না স্যারাম্মা না বা তার স্যুটকেস! ··অ্যাঁ, কী ব্যাপার এটা? কোথায় যেতে পারে ও? আলো এসে পড়লো টেবিলের ওপর একটা খামের গায়ে। তার বুক টিপটিপ করছে, সে খামটা খুলে পড়লো:

এ-চিঠি স্যারাম্মা লিখছে তার বাবা আর সৎমাকে: এই এত ছোট্ট আয়ুটায়, জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—এমতো সময়ে আমি যেহেতু একটা উঁচু মাইনের কাজ পেয়েছি, আমি তাই কাজের জায়গায় চ'লে যাচ্ছি। আমি এমন একজনকেও পেয়েছে যে আমাকে কোনো পণ না-নিয়ে

আমি যেমন আছি তেমনি সাজেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি! আমি যেহেতু তাকে ভালোবাসি আর সেও আমাকে ভালোবাসে, আমি তাই চাই তোমরা যেন এ-বিষয়টা ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো। তোমাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে—

আমি

আমার বাবা ও সৎমায়ের একান্ত

স্যারাম্মা

কেশবন নায়ার চিঠি টেবিলে রেখে দিলে, তারপর দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো। স্টেশনে এসে দ্যাখে, স্যারাম্মা দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মৃদু হাসি।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে: 'কী ক'রে টের পেয়েছিলে যে আমি এসেছি?'

'দৈবজ্ঞান! পুরুষের প্রজ্ঞা!'

'পুরুষের প্রজ্ঞা! তোমার মাথা! আমার বাবা আর সৎমাকে যে-চিঠিটা লিখেছি সেটা চুরি ক'রে প'ড়ে নয় বুঝি?'

'বলবো! ওহে রমণী, সবই বলবো তোমাকে।'

কেশবন নায়ার গিয়ে দুটো টিকিট কিনে আনলে দুজনে সব লটবহর নিয়ে উঠে পড়লো ট্রেনের কামরায়। ট্রেন সোল্লাসে একটা বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিলে। তারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে ব'সে আছে চুপচাপ। কামরাটা ফাঁকা হবার আগে তিন-তিনটে স্টেশনে থামলো ট্রেন।

ট্রেন আরেকটা স্টেশনে থামলো। কেশবন নায়ার চাওলাকে দু-পেয়ালা চা দিতে বললে। স্যারাম্মা বললে তারা দুজনেই কফি খাবে এখন। কেশবন নায়ার বললে তারা দুজনে এখন চা খাবে। দুজনেই চ'টে আগুন। শেষটায় কেশবন নায়ার খেলে এক গেলাশ কফি আর স্যারাম্মা চুমুক দিলে একটা চায়ের পেয়ালায়। সূর্য উঠলো। ট্রেন আস্তে-আস্তে একটা ব্রিজ পেরুলো তার তলায় ব'য়ে যাচ্ছে একটা সোনারং ছোট নদী। তারা দুজনেই তাদের একটু আগের চা আর কফি নিয়ে ঝগড়াটা ভুলে গেলো। অবিমিশ্র আনন্দের সঙ্গে কেশবন নায়ার নিচু গলায় স্যারাম্মাকে বললে: 'আমার মধুরা, আমার সুগন্ধ, আমার সোনা!'

স্যারাম্মা কাছে ঘেঁষে এলো, জিগেশ করলে: 'কী বলছে আমার আকাশ-লজেনচুষের বাবা!'

'আমার সোনার চাঁদের আলো!'

স্যারাম্মা একটা চিমটি কাটলো কেশবন নায়ারকে। কেশবন নায়ার বললে: 'মেরে তোমায় পাট ক'রে দেবো।'

স্যারাম্মার দু-চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। মেয়ে তো, চোখের জলের আর অভাব কোথায়? সে অকারণেই কাঁদতে লাগলো। তা দেখে পুরুষ কেশবন নায়ার খুব কষ্ট পেলে। সে তার চোখের পাতায় চুমু খেলে।

'না!' স্যারাম্মা বললে, 'তুমি আমাকে ছোঁবে না!'

'কেন ছোঁবো না?'

'তোমার জন্য অত-কিছু ত্যাগ করার পরও তুমি কি না আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো!'

'কেমন ব্যবহার? তাছাড়া তোমার ত্যাগগুলো কী, শুনি, স্যারাম্মা?'

'আমার প্রিয় বাবা ও সৎমাকে ছেড়ে আমি কি তোমার সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি না?'

'তুমি আমার সঙ্গে আসছো। তো কী?'

'একটু কফি খাও, অন্তত আমার খাতিরে···অন্তত একটু একটুখানি ত্যাগ স্বীকার করো···আর এখন কি না তুমি বলছো আমায় মেরে পাট ক'রে দেবে!'

'ওহে ত্যাগের প্রতিমা! ওহে নারী, আকাশ-লজেনচুষের জননী!'

'বলুন, আমার জীবনদেবতা!'

'আজই আমরা রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসবো। লোকের জানা উচিত। তোমার তা মনে হয় না?'

স্যারাম্মা কিছু বললে না।

কেশবন নায়ার তার উরুতে চিমটি কেটে বললে: 'তোমার তা মনে হয় না?'

'বললুম না হ্যাঁ? মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।'

'শুধু তিনটে ব্যাপারে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।'

'শুধু তিনটে তুচ্ছ নগণ্য ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড় আর ধর্মবিশ্বাস।'

'তবে কি আমাদের বাড়িতে দুটো রান্নাঘর থাকবে?'

'একটা, ছোট, একরত্তি রান্নাঘর!'

'আমাকে কি দু-রকম খাবার রান্না করতে হবে?'

'শুধু একরকম।'

'কার ইচ্ছে মতো?'

'আমার রান্নাঘরের কর্ত্রীঠাকরুনের ইচ্ছেমতো।'

স্যারাম্মা মৃদু হাসলো। 'সকালে আমি শুধু কফি বানাবো!'

'ওঃ···ঠিক আছে, পরে আমি বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসবো।'

'সে আমি হ'তে দেবো না। তোমার পুরো মাইনেটা—বুঝলে তো—সবটাই

আমাকে দিতে হবে—আমার হাতে থাকবে সব, শুধু আমার।'

'ওহে মেয়েমানুষ, তাহ'লে আমি চা খাবো কী ক'রে?'

'চা ছেড়ে দাও! যে-মেয়েমানুষটা এত সব ছেড়ে দিয়ে এলো তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু শেখো!'

'আমি কি তোমার হুকুমে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াইনি?'

'হুঁ...সে নাকি আবার বাহাদুরির ব্যাপার! প্রেমের জন্য কেউ-কেউ রাজ্য-সিংহাসনও ছেড়ে দেয়নি কি প্রেমের জন্যে লোকে ড্র্যাগনের সঙ্গেও লড়াই করেনি কি?'

'ওহে রমণীকুলরত্ন! ওহে চাঁদের আলো! তুমি যদি চাও তবে আমি আরামকেদারায় ব'সে দশ দশটা সাম্রাজ্যও ছেড়ে দিতে পারি! অথবা হাজারটা ড্র্যাগনের সঙ্গেও লড়তে পারি! কিন্তু একবার প্রেমের খাতিরে নিজের মাথায় ভর দিয়ে মুণ্ডু তলায় পা উপরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা ক'রে ছাখো! ওহে মেয়েমানুষ! প্রেমের জন্য এমন কীর্তি কে কবে স্থাপন করেছে? কেশবন নায়ারই শুধু তার স্যারাম্মার সামনে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসে তার আর কোনো সমান্তর নেই! এর চেয়ে বড়ো কোনো ত্যাগ কোথাও হ তে পারে?'

'ওহে আকাশ লজেনচুষের বাবা!'

'কী বলিতে চাহো, নারী?

'বলছি।'

ব'লে সে ঝুঁকে প'ড়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। কেশবন নায়ার তাকে জোর ক'রে টেনে তুলে বুকে টেনে নিলে। ট্রেন চলেছে দুলকি তালে। কে আর বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে ওদের?

স্যারাম্মা হঠাৎ কেশবন নায়ারের পকেটে তার হাত ঢুকিয়ে দিলে।

'কী খুঁজছো, গন্ধমধুর চাঁদের আলো?'

'যে-খামটা তোমাকে দিয়েছিলুম!'

'প্রেমপত্রটা! আরে! সেটাই পড়তে কি না ভুলে গিয়েছি!'

কেশবন নায়ার খামটা খুললো। ভেতর থেকে কাগজগুলো বার ক রেই হাঁ হ'য়ে গেলো—নোট কারেন্সি নোট, এক বাণ্ডিল কারেন্সি নোট!

এক-এক ক'রে গুনলো সে। একহাজার নিরানব্বুই টাকা!

'শোনো—ঐ দিয়ে তোমায় একটা হাতঘড়ি আর একটা সোনার আংটি কিনতে হবে। বুঝলে?'

টাকা দেখে খুশি হ'লেও কেশবন নায়ার প্রেমপত্রটার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলো: সে জিগেশ করলে: 'আর ওটা কোথায়?'

'ওটা আবার কী ?'

'প্রেমপত্রটা ?'

'পড়তে চাও বুঝি ? খুব ইচ্ছে করছে ?

'একবার শুধু দেখতে চাই, আমার সোনার টুকরো !'

'তাহ'লে ত্যাখো !' সে একটু লাজুকভাবে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, তারপর সরাসরি কেশবন নায়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে : 'দেখতে পাচ্ছো না তুমি ? আমিই প্রেমপত্র। তরুণ, তরুণী—সে-ই তো প্রেমের চিঠি।'

তক্ষুনি কথাটা কেশবন নায়ারের দারুণ মনে ধ'রে গেলো। 'তুমি আর আমি ! চমৎকার ! কিন্তু ওটা কই ? দেখাও ?'

স্যারাম্মা তার ব্লাউসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চিলতে কাগজ বার ক'রে আনলে, দিনের পর দিন ঘাম লেগে-লেগে কাগজটা বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, তারপর সেটা সে কেশবন নায়ারের হাতে তুলে দিলে। সে ভাঁজ খুলে হাত বুলিয়ে সমান ক'রে আলোয় তুলে ধরলে কাগজটা। একটা চিঠি—আগেই সে এটা দেখেছে কবে কোন অতীতে অনাদি কালে লেখা চিঠি। সে সেটা পড়তে শুরু করবামাত্র স্যারাম্মা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলে। বললে : 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায় জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে, তার বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—তোমাকে বলিনি আমি, আগেই ? আমরাই প্রেমপত্র !'

'নারী, বুঝিলাম সবকিছু। সব টের পেয়ে গেছি ! এবার আমার কান দুটো ছেড়ে দাও। চিঠিটা শুনতে দাও আমায়।'

'না, তুমি শুনবে না।' সে তাকে বুকে টেনে নিয়ে গালে মুখে ঘাড়ে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলো। ট্রেন স্ফূর্তিতে বাঁশি বাজালো, আর জোর গতিতে এগিয়ে চললো স্যারাম্মা তার দুই স্তনের মধ্যে থেকে যে কাগজটা বার ক'রে এনেছিলো সেটা পড়তে চেষ্টা ক'রে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো কেশবন নায়ারকে। কিন্তু তবু সে চেঁচিয়ে পড়লো থেমে-থেমে :

প্রিয়তমা স্যারাম্মা :

কেমন ক'রে আমার প্রিয় কমরেড কাটাচ্ছে তার এই এত ছোট্ট পরমায়ু যখন জীবন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে ?

আমার কথা যদি ধরো—আমার জীবন কাটে পলে-পলে স্যারাম্মারই প্রেমে। আর তোমার, স্যারাম্মা ?

খুব ভালো ক'রে এটা ভেবে দেখবার জন্য মিনতি করছি তোমায় ; আমাকে একটা মধুর, সদয় জবাব দিয়ে কৃতার্থ কোরো।

স্যারাম্মারই একান্ত

কেশবন নায়ার

# হাত ফেরতা

রাগে মাথার চুল আলুথালু ক'রে একটা প্রলয় নৃত্যই জুড়ে দিলে শারদা। সম্পাদক গোপীনাথ তবু ঠাণ্ডা গলায় বললে: 'কাল যে খবরকাগজ বেরুবার দিন, তা কি তুমি জানো না, শারদা? আজ রাত্তিরে আমার অনেক কাজ; খাবার তৈরি থাকলে চট ক'রে কিছু দিয়ে দাও।'

'খাবার!' শারদার গলা চ'ড়ে গিয়েছে। 'আমি কিছুই রাঁধিনি। রাঁধতে ইচ্ছে করেনি। তোমার ইচ্ছে হ'লে তুমি নিজেই কিছু বানিয়ে খেয়ে নাও। আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।'

গোপীনাথকে কোনোদিনই ভালোবাসতে পারেনি শারদা। বিয়ের আগেই সে ব'লে দিয়েছিলো: 'প্রেম-ট্রেম আমি বুঝি না। আমার পক্ষে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।' সে নিয়ে আজ অব্দি শারদাকে কিছু বলেনি গোপীনাথ। এমনকী প্রেমের কথা ব'লে কোনোদিন তাকে চুমু পর্যন্ত খায়নি।

গোপীনাথ বললে: 'এ-সব আবোলতাবোল কথা আমি অনেকদিন ধ'রেই শুনে আসছি। কিন্তু ব্যাপার কী? আমি কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেছি?'

'কেন তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে?' নিজের উঁচু স্তন দুটিকে স্পষ্ট ক'রে অহংকারী গলায় জিগেশ করলে শারদা।

গোপীনাথের খারাপ লাগলো। বললে: 'কেন তুমি বিয়ে করেছিলে?' তা, এখন এ-সব কথা পেড়ে লাভ আছে কিছু?'

শারদার চোখ জানলার বাইরে, গলিতে। জোরালো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকছে ঘরে।

'ঘরে জল ঢুকছে দেখতে পাচ্ছো না বুঝি!' শারদা বললে, 'জলে ভিজলে তোমার কিছু হবে না — তবে ঘরদোর নোংরা হচ্ছে না?'

জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে শারদার কাছে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে চ'লে এলো গোপীনাথ। শারদার চোখের জলে বিদ্যুতের ঝিলিক। বুক চাপড়ে সে বললে, 'এর চেয়ে ম'রে গেলেই ভালো হ'তো!'

গোপীনাথ শারদার হাত ধরলে।

'ছোঁবে না আমাকে!' শারদা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি অশুদ্ধ, অপবিত্র—'

গোপীনাথ তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

'আমি ম'রে যাবো!' বলতে-বলতে হাত ছাড়িয়ে দূরে ছিটকে গেলো শারদা, দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করলে। তারপর শাড়িটাকে ফালা-ফালা ক'রে ছিঁড়তে শুরু ক'রে দিলে।

'কেন এমন জঘন্য জীবন হ'লো আমার!' খেপে গিয়ে হাতের বালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে শারদা, পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে খাটে আছড়ে প'ড়ে চীৎকার করতে লাগলো।

চিন্তিত গোপীনাথ ধপ ক'রে ব'সে পড়লো একটা চেয়ারে। সে শুধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে-বারে একটি কথাই ভাবছে: সে তো শারদাকে কোনোদিনই কিছু বলেনি, তাহ'লে ও অত চ'টে আছে কেন। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ সত্যি ভারি অদ্ভুত! এই চিন্তায় ডুবে গিয়ে সে চুপচাপ ব'সে রইলো।

নানা ঘটনায় যখন গোপীনাথ জীবনের প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, সেই সময়েই আচমকা তার সঙ্গে শারদার দেখা। তার নিজের অবস্থা তখন মরুভূমিতে দিশেহারা পথিকের মতো। শরীরে হাড়-পাজড়া ছাড়া আর-কিছু নেই। নারী-হৃদয়ের স্বচ্ছ গহন জলই তখন তার একমাত্র কাম্য—যেন নারীর সান্নিধ্যই তাকে শান্ত করতে পারে। মনে হ'তো, কারু ভরা বুকে লীন হ'য়ে হালকা স্নিগ্ধ স্বরে কথা কয়। কিন্তু কার সঙ্গে?

ঠিক এমন সময়েই তার জীবনে অদ্ভুতভাবে শারদার আবির্ভাব। সেও এমনি এক ঝড়বাদলের রাত। কাগজের আপিশ থেকে বাড়ি ফিরে এসে গোপীনাথ দেখতে পেলে দরজার কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আরো-কাছে এসে দেখতে পেলে সে-এক যুবতী। এই-ই যে শারদা—তা সে তখন জানতো না। গোড়ায় গোপীনাথের সব প্রশ্নের জবাবে সে-একটি কথাও বলেনি। বর্ষার ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁপছে: গোপীনাথ তাকে ভেতরে আসতে বলেছিলো।

কিন্তু গোপীনাথের কথায় সে কোনো সাড়া দেয়নি। যেমন ছিলো, তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো।

'অমনভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না,' গোপীনাথ বলেছিলো, 'ভেতরে এসে বোসো।'

তখন সে আস্তে দরজার দিকে এগিয়েছিলো। হাতে ছিলো একটি স্যুটকেস। চোখ লাল হ'য়ে আছে, গালে তখনও চোখের জলের দাগ শুকোয়নি। পরনে চওড়া

পাড়ের শাদা শাড়ি আর কা:লা ব্লাউস, সে এমনভাবে গোপীনাথের দিকে তাকিয়েছিলো যেন গোরু তাকিয়ে আছে বাঘের দিকে।

আশ্বাস দিয়ে গোপীনাথ বলেছিলো, 'ভয় পাবার কিছু নেই। ভেতরে এসে বোসো।'

সে ভেতরে আসার পর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো গোপীনাথ।

'কোথায় যাচ্ছিলে '

'... . ...'

'পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড় বদলে নাও। এখানে আমি একাই থাকি। আমাকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমার বাবা, ভাই…' বলতে-বলতে থেমে গিয়েছিলে গোপীনাথ।

সে বলেছিলো, বদলবার মতো কাপড়ও তার কাছে নেই।

বীণার ঝংকারের চেয়েও মধুর সেই গলা শুনে চমকে উঠেছিলো গোপীনাথ। নিজের তোরঙ্গ থেকে ধোয়া কাপড় বার ক'রে তাকে পরতে দিয়েছিলো।

পাশের ঘরে গিয়ে সে কাপড় বদলে এসেছিলো।

'কিছু খেয়েছো?' জিগেশ করেছিলো গোপীনাথ।

'আমার কিছুই দরকার নেই,' আস্তে বলেছিলো সে।

গোপীনাথ বলেছিলো, তুমি আমার অতিথি—এক পেয়ালা চা অন্তত খেতেই হবে।' ব'লে হেসেছিলো।

সে কিন্তু ব'সে ছিলো নিঃশব্দ, চুপ।

তখন গোপীনাথ তাকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো, 'আমার নাম গোপীনাথ। আমি একটা সাধারণ খবর-কাগজের সম্পাদক। তোমার নাম কী?'

'শারদা' আনত মুখে মিষ্টি গলায় সে বলেছিলো।

চা বানাতে ভেতরে গিয়েছিলো গোপীনাথ। জানলায় শুকোচ্চে শাড়ি, ব্লাউস, কাঁচুলি আর সায়া…এই প্রথম তার ঘরে নারীদেহের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। আনন্দে মন ভ'রে গিয়েছিলো গোপীনাথের। নিজেকে সে আর সামলে রাখতে পারেনি। লুকিয়ে-লুকিয়ে সে চুমু খেয়েছিলো শাড়িটাকে, তারপর কাঁচুলিটি। স্টোভ জ্বেলে চা বানিয়েছিলো। দুই পেয়ালা চা নিয়ে এসে দেখেছিলো সে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ব'সে আছে

নাও, শারদা, চা খেয়ে নাও।'

শারদা যেন অবসাদের প্রতিমা, সারা শরীরে ক্লান্তির ছাপ। আস্তে সে চায়ে চুমুক দিয়েছিলো।

গোপীনাথ শুধিয়েছিলো, 'কী ? ঘুম পাচ্ছে ?'

শারদা বলেছিলো, 'আমি চেয়ারেই শুচ্ছি।'

'না-না, পাশের ঘরে গিয়ে দোর লাগিয়ে শুয়ে পড়ো। আমিই চেয়ারে শোবো।'

শারদা আর আপত্তি করেনি। ভেতর থেকে দোর লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলো।

গোপীনাথের ঘুম আসেনি। অনেক কথাই সে ভেবেছিলো। কে এই মেয়েটি ? কোত্থেকে এলো এমন অসহায়, সম্বলহীনা ? চোখের জলেরই বা কী কারণ ? একটার পর একটা সিগারেট টেনেছিলো সে। ঘুম এসেছিলো অনেক পরে।

ভোরে বাইরের ঘরে পায়ের আওয়াজ শুনে দরজা খুলেছিলো শারদা।

গোপীনাথ 'সুপ্রভাত' জানিয়েছিলো।

উত্তরে সেও জানিয়েছিলো 'সুপ্রভাত'।

'ঘুম হয়েছিলো ?'

'হ্যাঁ।'

'স্নান করবে ?'

সাবান, তেল, মাজন, তোয়ালে ইত্যাদি তার হাতে তুলে দিয়ে স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিয়েছিলো গোপীনাথ। তারপর বাইরে গিয়ে দোকান থেকে ফ্লাস্কে কফি আর ঠোঙায় ক'রে জলখাবার কিনে এনেছিলো।

ততক্ষণে শারদা স্নান সেরে বেরিয়েছে। গোপীনাথও স্নান সেরে নিলে। দুজনে একসঙ্গে কফি খেয়েছিলো। এতক্ষণে পরিষ্কার চোখে শারদার মুখ দেখেছিলো গোপীনাথ। সে-মুখে বিষাদের ছায়া। আপিশ যাবার জন্যে সে তৈরি হ'তে শুরু করেছিলো : শাদা প্যান্ট, শাদা কোট, শার্ট আর বাদামি রঙের জুতোজোড়া প'রে নিয়েছিলো। তারপর জিগেশ করেছিলো শারদাকে : 'তুমি কোথায় যাবে ?'

শারদা কিছু বলেনি। শুধু তার চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল গড়িয়ে পড়েছিলো।

'এ কী! কাঁদছো কেন ?'

'এমনি।' চোখ নিচু করেছিলো শারদা।

'কাল রাত্তিরে কোত্থেকে এলে ?'

'হাসপাতাল থেকে।'

'তুমি নার্স বুঝি ?'

'না।'

'ডাক্তার ?'

'না।'

'ডাক্তারি পড়ছো ?'

'না।'

'কাজ করো কোথাও ?'

'না।'

'বাড়ি কোথায় ?'

শারদা একটি গ্রামের নাম বলেছিলো, ...

সে-গ্রাম এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে।

'সেখানে কী করতে ?'

'পড়তাম।'

'কোন ক্লাসে ?'

'বি-এ।'

'মা-বাবা আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা কী করেন ?'

'ওখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার।'

'বাড়িতে ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছো ?'

শারদা চুপ ক'রেছিলো।

'বাড়ি যেতে চাও ?'

'না।'

'তবে কোথায় যাবে ?'

'জানি না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

শুনে গোপীনাথ হতবাক। একবার ভেবেছিলো, মাথা খারাপ নয়তো ? কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। বেশ কিছুক্ষণ ভেবেছিলো সে, গভীর ভাবেই। ভেবে সে ভবিষ্যৎ স্থির ক'রে নিয়েছিলো। মস্ত জনতার সামনে সকলের আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তার অবস্থা যে-রকম অস্থির আর ভীত হ'য়ে ওঠে, ঠিক সে-রকমই হয়েছিলো গোপীনাথের দশা।

'আমি কিছু বলতে চাই।' বলেছিলো গোপীনাথ, 'আমি তোমার কাছে আর তুমি আমার কাছে পুরোপুরি অচেনা। সবেমাত্র কাল রাতে আমাদের দেখা হয়েছে। তোমার মা-বাবা আছেন, বাড়ি আছে। অথচ তুমি বলছো, তোমার কোথাও যাবার জায়গা নেই। কেন, তা আমি জানি না। তোমার সম্বন্ধে এর চাইতে বেশি কিছু জানবারও কোনো প্রয়োজন দেখি না। আমার ইচ্ছা, এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকি।'

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো। শেষে শারদা বলেছিলো, 'আমি কীভাবে থাকবো?'

শুনে খুশি হয়েছিলো গোপীনাথ।

'আমার স্ত্রী হিশেবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজই তোমাকে বিয়ে করতে পারি।'

'বিয়ে!' স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো শারদা। 'বিয়ে?'

'হ্যাঁ। তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

অপলকে গোপীনাথের চোখের দিকে তাকিয়েছিলো শারদা।

'আপনি মহৎ!' বিষণ্ণ স্বরে সে বলেছিলো, 'কিন্তু আমি যে ভারি নোংরা—আপনার সঙ্গে কীভাবে নিজের জীবন জড়াবো?'

'থাক—থাক। আমিও কোনো মহাপুরুষ নই।'

'আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না।'

'এতে ঠকাবার কী আছে?'

'আপনি আমাকে চেনেন না।'

'নারী আর পুরুষ কখনোই পরস্পরকে ভালো ক'রে চিনে উঠতে পারে না। ভেতরে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বুঝে-নেবার ব্যাপার তো এটা নয়। আত্মা টাত্মা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমার ধারণা মানুষের চোখই তার আত্মা। তোমার চোখে আমি আত্মার সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি। ঐ আত্মাকে আমি নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসি।' আবেগে কেমন আপ্লুত হ'য়ে উঠেছিলো গোপীনাথ।

শারদা কিন্তু তবু ক্ষান্ত হয়নি। বলেছিলো, 'আমি খুব খারাপ মেয়ে।'

হো হো ক'রে হেসে উঠেছিলো গোপীনাথ। 'শারদা! নিজেকে খারাপ বলছো কেন? তোমার শরীর কি আর পবিত্র নেই?'

'এই পৃথিবীতে আমার আর-কোনো আশ্রয়, আর-কোনো অবলম্বন নেই। আপনি কি কথা দিচ্ছেন আমি সবকিছু পাবো? একটু পরিচয় হ'তেই আপনি বলছেন "তোমাকে ভালোবাসি", বলছেন আমাকে বিয়ে করতে চান!'

'ছিঃ, অমন ক'রে বলছো কেন? আমি সত্যি তোমাকে সবকিছু দিতে চাই।'

'তবু...'

'তবু... হুম, এই তবুটা কী, শুনি!'

'আমার অতীত জীবন—'

'ও, এই কথা! তা, ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আমারও একটা অতীত

আছে। সেটাও তেমন-একটা সুন্দর নয়। পুরোনো কাসুন্দি ভুলে গিয়ে এই মুহূর্তের বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়েই আমরা সুখী হ'তে পারি।'

'আপনি কিছুই জানেন না –' দাঁতে ঠোঁট চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো শারদা। ধরা গলায় বলেছিলো, 'হাসপাতালে আমার একটি বাচ্চা হয়েছে।'

কিছুক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলতে পারেনি।

শেষে গোপীনাথ জিগেশ করলে, 'সে-বাচ্চা কোথায়?'

'মারা গেছে।'

'স্বামী?'

'আমার বিয়ে হয়নি।'

'বাচ্চার বাবা কে?'

'আমার এক সহপাঠী।'

'কে সে?'

'অনার্স নিয়ে পড়ছে।'

'তারপর?'

'সে তার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই ব্যস্ত। স্পষ্ট ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছে।'

'কী-রকম ভবিষ্যৎ?'

'সে এক কবি। অনেক বই লিখেছে। গত হপ্তায় তার পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পাশ করলে, ভবিষ্যতে, কলেজেই চাকরি পাবে।'

'কী নাম এই কবির?'

শারদা তার নাম জানিয়েছিলো।

'আদর্শবাদী?'

'হ্যাঁ,' শারদা বলেছিলো, 'আমি তার কবিতা পড়তাম। তখন সে আমাদের হস্টেলের মুখোমুখি একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো। গোড়ায় আমি তার কাছে একটা বই চেয়ে চিরকুট পাঠিয়েছিলাম। এইভাবেই আমাদের পরিচয় হয়। আমরা চিঠি চালাচালি করতাম। আমার বন্ধুরা আমায় হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিলো, বলেছিলো লোকটা সে সুবিধের নয়। তবু আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। পরস্পরকে আমরা কথা দিয়েছিলাম। রাতে হস্টেলের পাঁচিল টপকে সে আমার ঘরে আসতো। পাশের আমগাছের ছায়ার তলায়......

'ব্যাপারটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু বন্ধুরা এই নিয়ে কানাঘুষো শুরু ক'রে দিয়েছিলো। বাড়ি এলাম। দেখি, সেখানেও সবাই সবকিছু জানে। আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। হাসপাতালই তখন আমার একমাত্র আশ্রয় হ'য়ে

উঠলো। তাকে আমি তিনটি চিঠি লিখেছিলাম পর-পর। শেষে তার একচ্ছত্র উত্তর এলো, লিখেছে, "আমাকে নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে।" আমার কাছে টাকাকড়ি কিছুই ছিলো না। পরশু রাতে হাসপাতালে মরবার চেষ্টা করেছিলাম। জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবো, এমন সময় পুলিশের বাঁশি কানে এলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, বিষ খেয়ে মরবো। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টিবাদল তুচ্ছ ক'রে সেই দুপুর থেকে হাঁটছিই। শেষে যখন আর পারলাম না, তখন আপনার দরজায়—'

'বাস, যথেষ্ট!' গোপীনাথ বলেছিলো, 'সেজন্য ভাবতে হবে না। জীবন শুধু কাঁদবার জন্যেই নয়। তুমি একটা ভুল করেছো, অবিবাহিতা কোনো-কোনো মেয়ে এই ভুলটা ক'রে বসে। এ-ব্যাপারে ছেলে মেয়ে সবাই সমান। পুরোনো কথা ঘেঁটে কোনো লাভ নেই। আমি তোমার জন্যে কাপড় নিয়ে আসছি।'

'কেন?'

'বাঃ রে, আমার স্ত্রী হ'য়ে থাকলে তোমার জামাকাপড়ের দরকার হবে না বুঝি? আমার ধুতিতে তো তোমার কাজ চলবে না।'

'না, এই বিয়ে ঠিক হবে না। আপনার মা-বাবা কী বলবেন? আপনার বন্ধুবান্ধবও এই সম্পর্ক ভালো চোখে দেখবে না।'

'কিন্তু, কী মুশকিল, বিয়েটা তো আমিই করবো। মা-বাবার মধ্যে শুধু মা আছেন। তিনিও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। ভাই নেই। এক বোন আছে, তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। এখন আমি একা। ধন-সম্পত্তি কিছুই নেই আমার। আই-এ অব্দি পড়েছি। আমার যথাসর্বস্ব বলতে ঐ কাগজ। আপিশের চাপরাশি, ম্যানেজার, সম্পাদক—আমিই সব। আমাকে বাধা দেবারও কেউ নেই।'

'কিন্তু আমার হৃদয়ে তো প্রেম নেই।' শারদা বলেছিলো, 'আমি কাউকে ভালোবাসতে পারবো না।'

'শারদা! তুমি আমাকে বিশ্বাস তো করতে পারো।'

কাঁদতে-কাঁদতেই শারদা তার মৌন সম্মতি জানিয়েছিলো।

রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী হয়েছিলো। একসঙ্গে ব'সে ছবি তুলিয়েছিলো দুজনে, আর সেই ছবি ছাপিয়েও দিয়েছিলো খবরকাগজে। সে-কাগজের একটা ক'রে কপি শারদার বাবা আর সেই কবির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

গোপীনাথ আর শারদাকে আশীর্বাদ করতে শারদার মা-বাবা এসেছিলেন। সেইদিনই এক সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করতে গিয়ে গোপীনাথ সেই

কবিকেও দেখেছিলো। গোপীনাথও সেই সভায় ভাষণ দিয়েছিলো। ভাষণের পর একফাঁকে কবি তার কাছে এসে জিগেশ করেছিলো—

'সম্পাদকমশাই সম্প্রতি বিয়ে করলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'মহিলাটিকে কি আগেই চিনতেন ?'

'না।'

'তার কিছু প্রেমপত্র অবশ্যি একজনের কাছে আছে।'

'সে-কথা শারদা আমায় বলেছে।'

'বিয়ের আগে যে-বাচ্চা হয়েছিলো, তাও বলেছে ?'

'সবকিছু।'

'ও যে হাত-ফেরতা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মাল, তাও বলেছে ?' ব'লে কবি ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছিলো।

গোপীনাথও হেসেছিলো, 'শারদা সে-কথাও বলেছে। আর কে যে তার এমন হাল করেছে, সেই কবির নামও বলেছে।'

এ-কথা শুনে কবির মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলো। হাসতে-হাসতেই বিদায় নিয়ে চ'লে এসেছিলো গোপীনাথ।

কবির সঙ্গে যে তার মোলাকাৎ হয়েছিলো শারদাকে সে-কথা জানায়নি গোপীনাথ। শারদাকে খুশি ক'রে রাখাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। আর শারদারও কোনো কষ্ট নেই এখন। এখন সে বেশ হাসিখুশি। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না, ডাকে পাঠাবার জন্যে মোড়কে খবর-কাগজ ভরা—সব ব্যাপারই সে মন দিয়ে করে। তবু, সব সত্ত্বেও তার মন বলে, 'আমার হৃদয়ে প্রেম নেই।' 'আমি কাউকে ভালোবাসতে পারবো না'—এই ভাবটা আর তার মন থেকে গেলো না।

বৃষ্টি আর তুফানের ঝাপটার মধ্যে শারদার কথাগুলোই শুধু গোপীনাথের কানে ঝমঝম করতে লাগলো। আর এখন কি না সে বলছে, 'আমায় তুমি বিয়ে করলে কেন ?'

ছাতা হাতে নিয়ে বেরুবার জন্যে তৈরি হ'লো গোপীনাথ। শারদাকে বলতে গিয়ে দেখতে পেলে—সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। গোপীনাথের ইচ্ছে হ'লো ওকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খায়, কিন্তু শারদা তাকে ভালোবাসে না এ কথাটা মনে পড়তেই আর এগুলো না। বললে, 'আমি একবার প্রেস থেকে ঘুরে আসছি।'

কাঁদতে কাঁদতেই, ধরা গলায়, শারদা বললে, 'ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।'

'কোথায় যাবে?'

'যে-দিকে দু-চোখ যায়—'

'এখানে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'অসুবিধে?' শারদার ভরা স্তন দুটি দুলে উঠলো। 'একটুও না।' বলে বুক চাপড়াতে লাগলো শারদা। গোপীনাথ এগিয়ে এসে তার হাত ধরলে।

'আমাকে তুমি ছোঁবে না। আমি অপবিত্র!'

'অপবিত্র! কী বলছো তুমি, শারদা!'

'কিছু না। আমায় ম'রে যেতে দাও।'

'মরতে চাচ্ছো? কেন, শারদা? তোমার কী দুঃখ, আমাকে একবার খুলে বলো।'

'কিছু না', ধরা গলায় সে বলল, 'এই ঘেন্নার জীবন, এই কলঙ্কিত জীবন আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'কে তোমার জীবন ঘৃণ্য করেছে?'

'তুমি!'

'আমি!'—গোপীনাথের মুখ দিয়ে আর-কোনো কথা বেরুলো না।

'হ্যাঁ, তুমি।' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সে বললে, 'আমাকে কি তোমার মনে ধরে না? আমাকে পছন্দ করো না তুমি?'

'আমি!—তুমিই তো আমাকে ঘৃণা করো!'

'আমি—' অসহ্য বেদনায় গোপীনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো শারদা। 'আমি···তোমাকে ··নিজের···জীবনের চেয়েও···বেশি···'

# নীল আলো

আমার জীবনের আশ্চর্য ঘটনাগুলোরই একটা এই কাহিনী। না, ঘটনা নয়। বরং একে বলা যেতে পারে বিস্ময়ের এক বিশাল বুদ্বুদ। বৈজ্ঞানিক সত্যের ছুঁচ বিঁধিয়ে আমি এই বুদ্বুদটাকে ফুটো ক'রে দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু না, বুদ্বুদটাকে ফাটানো যায়নি। হয়তো আপনারা তা পারবেন: চুলচেরা বিশ্লেষণ ক'রে একে ফাটিয়ে খুলে দিতে পারবেন। আমি একে আশ্চর্য ঘটনাই বলি...হ্যাঁ, তাছাড়া আর কীই বা বলবো একে ?

যা ঘটেছিলো, তা এই :

দিন, মাস, বছর—এ-সব মোটেই জরুরি ব্যাপার নয়। আমি একটা বাড়ি খুঁজছিলুম। সেও কোনো নতুন-কিছু ব্যাপার নয়। সবসময়েই আমি বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পছন্দ হয় এমন-কোনো বাড়ি, নিদেন একটা ঘরও আমি কখনও খুঁজে পাইনি। যে-সব জায়গায় থেকেছি তাদের একশো খুঁত আমি বার ক'রে দিতে পারি। তবে নালিশ করি কার কাছে ? পছন্দ না-হয় তো কেটে পড়ুন—সাফ জবাব। কিন্তু যাই কোথায় ? অগত্যা থেকে যেতে হয়, বেজায় অসন্তুষ্ট হ'য়েই। সে যে কত বাড়ি, কত ঘর নিয়ে আমি ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হয়েছি! কারু দোষ নেই অবশ্য। বাড়িঘরগুলো আমার পছন্দ হয়নি। ফলে সে-সব আমি ছেড়ে দিই। আর-কেউ হয়তো থাকতে আসবে আমার জায়গায় : স্ত্রী বা পুরুষ, তার হয়তো বাড়িটা বা ঘরটা ভালো লেগে যাবে। ভাড়াটে বাড়ির চরিত্রই এই।

যখনকার কথা তখন ভাড়াটে বাড়ির বড্ড অভাব ছিলো। এককালে যা দশটাকায় ভাড়া পাওয়া যেতো, এখন তা পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিলেও মিলবে না। কাজেই বাড়ির খোঁজে আমায় হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিলো—তারপর, হঠাৎ, হঠাৎই, এই-যে, বাড়িটা।

ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। শহরের শোরগোল ও ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে। পৌরসভার এক্তিয়ারের একেবারে শেষ সীমায়। একটা প্রাচীন বোর্ড ঝুলছে : 'বাড়িটা ভাড়া দেয়া হবে'।

আমার ভালো লেগে গেলো, মোটামুটি। ওপরে দুটো ঘর আর বারান্দা। একতলায় চারটে ঘর—সঙ্গে একটা বাথরুম ফাউ। রান্নাঘর আছে, জলের কল আছে। শুধু বিজলির কোনো ব্যবস্থা নেই। রান্নাঘরের সামনে একটা কুয়ো। কাছেই, উঠোনের এককোণে, পায়খানা। কুয়োটা পুরোনো, ধারগুলো বাঁধানো, ছোটো দেয়াল তোলা। চারপাশে-দেয়াল-ঘেরা উঠোনে অনেক গাছপালা। একটা মস্ত সুবিধেও আছে—আশপাশে কোনো পড়শি নেই। একটা রাস্তার গায়ে ঠেশ-দেয়া বাড়ি।

যত অবাক হলুম, ততটাই খুশি। আর-কেউ বাড়িটা ভাড়া নেয়নি কেন?... আমি যেন কপালজোরে এক রূপসী মহিলার নাগাল পেয়ে গেছি। রূপসী মহিলাদের তো সচরাচর দেখাই যায় না। পেয়েছি যখন, একে এবার বোরখায় ঢেকে রাখতে হবে! ফাঁকা বাড়িটা দেখে এই-ই আমার মনে হ'লো। দারুণ একটা চাঞ্চল্য, একটা উত্তেজনা বোধ করলুম আমি। হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলুম, ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে হ'লো। টাকা ধার করলুম। দু-মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে তারপর চাবি জুটলো। এক-কথায়, আমি থাকতে চ'লে এলুম বাড়িটায়। সেদিন আমি একটা লণ্ঠনও কিনে নিলুম।

ঘরগুলো সব ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে-পুঁছে সাফসুতরো ক'রে নিলুম—মায় রসুই ঘর আর বাথরুম শুদ্ধ। চারপাশে বিস্তর আবর্জনা জ'মে ছিলো, আবার একদফা ঝাঁট, ধোয়া, পোছা। তারপর স্নান সেরে নিতেই বেশ শরীফ মেজাজ হ'য়ে এলো আমার। দিব্যি একটা ফুরফুরে সন্তোষের ভাব। বাইরে বেরিয়ে এসে কুয়োর দেয়ালটার ওপর ব'সে পড়লুম। বেশ সুখী-সুখী বোধ হচ্ছে। এখানে ব'সে-ব'সে চুটিয়ে খাশা স্বপ্ন দেখা যাবে। চাই কি, উঠোনে পায়চারি ক'রে বেড়াতেও পারি। উঠোনে বেশির ভাগই গোলাপঝাড়, কয়েকটা জুঁইয়ের লতা। এ-কথাই ভাবলুম, এবার রান্নার লোক রাখতে হবে—উঁহু, না, সে ভারি মুশকিল, ঝামেলার ব্যাপার। সকালে স্নান ক'রে একটা থার্মোস ফ্লাস্ক নিয়ে চায়ের দোকানে চ'লে গেলেই হবে—ফ্লাস্ক ভর্তি ক'রে চা নিয়ে আসা যাবে। হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে নেবো দুপুরে যাতে খাবার পাঠিয়ে দেয়। সন্ধেবেলাতেও খাবার পাঠাতে ব'লে দিলেই হবে। তারপর ডাকঘরে গিয়ে পিওনকে বলতে হবে যে আমি এ-বাড়িতে থাকতে এসেছি। তাকে এও ব'লে দিতে হবে যে বাড়িটা আর ফাঁকা নেই এ-কথা যেন কাউকে না-ব'লে দেয়···নিভৃত সৌন্দর্য রাতগুলোর, বিস্তর লেখা যাবে ···এ-সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে আমি ঝুঁকে কুয়োর ভেতর তাকালুম। জল আছে কি না দেখে বোঝা গেলো না। তলাটায় বেশ ঝোপ গজিয়েছে, শ্যাওলা। একটা ঢেলা তুলে নিয়ে আমি কুয়োর ভেতর ছুঁড়লুম।

'ঝুপ!' জলে কিছু পড়ার আওয়াজ, তারপর তার প্রতিধ্বনি। হুঁ, জল আছে তবে কুয়োয়।

তখন বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে।

আগের রাত্তিরে একবারও চোখের পাতা বোজাবার ফুরসৎটুকু পাইনি। সন্ধেবেলায় হোটেলের যাবতীয় বকেয়া চুকিয়ে দিয়েছি। তারপর দেখা করতে গেছি বাড়িওলার সঙ্গে। আমার নেয়ারের খাটটা গুটিয়ে ভাঁজ করেছি। প্যাক করেছি আমার গ্রামোফোন আর রেকর্ডগুলো। আমার কাগজপত্তর, বই-পত্রিকা বাক্সবন্দী করেছি, আরামচেয়ারটাকে গুটিয়ে বেঁধেছি, বইয়ের শেলফটাও প্যাক করেছি—এই আমার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। তারপর ভোরবেলায় দুটো ঠেলাগাড়িতে সব চাপিয়ে রওনা হ'য়ে পড়েছি।

আমার নতুন বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিলুম। রাস্তায় বেরিয়ে এসে বন্ধ ক'রে দিলুম ফটকটা। তারপর চাবিটা পকেটে পুরে বেশ একটু গর্বের ভঙ্গিতেই হণ্টন শুরু ক'রে দিলুম। মনে-মনে ভাবলুম, কার গান বাজিয়ে আজ গৃহপ্রবেশ উদ্‌যাপন করবো। …একশোরও বেশি রেকর্ড আছে আমার। আরবী, ইংরেজি, উর্দু, তামিল, বাংলা। মলয়ালম কোনো রেকর্ড নেই। মলয়ালমেও অনেকে ভালো গান করেন। তাঁদের রেকর্ডও কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুরগুলো বড্ড বাজে। কবে যে মলয়ালমে ভালো সুরকার আর সংগীত পরিচালক পাওয়া যাবে? পঙ্কজ মল্লিক বা দিলীপকুমার রায়ের মতো? নিজেকেই জিগেশ করলুম, কার গান বাজাবো আজ প্রথমে? পঙ্কজ মল্লিক, দিলীপকুমার রায়, সায়গল, বিং ক্রসবি, পল রোবসন, আবদুল করিম খান, কাননদেবী, কুমারী মঞ্জু দাশগুপ্তা, খুরশিদ, যূথিকা রায়, এম এস সুব্বুলক্ষ্মী…দশ-বিশটা নাম পর-পর মনে প'ড়ে গেলো। শেষে আমি মনস্থির ক'রে ফেললুম: একটা গান আছে। 'এই যে এলো পরদেশী,' তার শুরুটা এইরকম 'দূর দেশ কা রহনেওলা আয়া'। গানটা কে গেয়েছেন? মহিলা কেউ, না পুরুষ? মনে পড়লো না। দেখে নিতে হবে। আমি হনহন ক'রে হেঁটে চললুম।

প্রথমে দেখা করলুম ডাকঘরের পিওনের সঙ্গে, তাকে সব খুলে বললুম। ও-বাড়িটা যে ভাড়া নিয়েছি এ কথা বলতেই সে কেমন আঁৎকে উঠে বললে: 'আইয়ো!…ও বাড়িতে…আজ্ঞে একটা অপঘাত মৃত্যু হয়েছে! কেউ ওখানে থাকে না আর। সেই থেকে এতকাল বাড়িটা ফাঁকা প'ড়ে আছে!'

বাড়িটায় অপঘাত মৃত্যু হয়েছে? খুনজখম? দুর্ঘটনা? কেমন একটু দ'মেই গেলুম আমি। জিগেশ করলুম: 'কী-রকম অপঘাত মৃত্যু?'

'উঠোনে একটা কুয়ো আছে না?…কে যেন তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলো। তারপর থেকে ও-বাড়িতে শান্তি বা স্বস্তি নেই। গোড়ায় অনেকেই থাকবার চেষ্টা করেছিলো। রাত্তিরে দুমদাম আওয়াজ ক'রে দরজার পাল্লা বন্ধ হয়। জলের কল

থেকে জল পড়তে থাকে···ধুপধাপ শব্দ হয় '

ধুপধাপ শব্দ? দুমদাম আওয়াজ ক'রে দরজা বন্ধ হয়? জলের কল থেকে জল পড়ে? তাজ্জব তো! জলের কল দুটোরই চাবি আছে, আঁটো শক্ত ক'রে লাগানো যায়। বাড়িওলা আমায় বলেছিলো যে লোকে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে স্নান করতো, তাই জলের কলগুলোর মুখ বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে! আমার তখুনি জিগেশ করা উচিত ছিলো, বন্ধ বাথরুমের মধ্যেও কলের মুখ আটকে তালা লাগানো কেন ···তখন আমার ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি।

'ওঃ, আপনার গলা টিপে ধরবে—প্রাণে মেরে ফেলবে! কেন, কেউ আপনায় এ-কথা বলেনি?'

আমি মনে-মনে বললুম: চমৎকার!... আর এদিকে কিনা দু-মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ব'সে আছি! এখন তাহ'লে কী করা? মুখে বললুম: 'ওঃ, সে তেমন সিরিয়াস ব্যাপার নয়। এক ছু মন্তরেই সব হাপিশ হ'য়ে যাবে। সে যাক গে, আমার চিঠিপত্তর-গুলো যাতে ঠিকঠাক ওখানে পৌছোয় সেটা দেখবেন।'

বেপরোয়া ভাব ক'রেই কথাটা আমি বললুম। আমি কিন্তু সাহসীও নই, আবার ডরপোকও নই। সাধারণ লোকে যা-যা ভয় পায়, আমিও তাকে ভয় পাই। সে-কথা মনে রাখলে আমাকে ভীরুই বলা যায়। তবে এমন-কোনো অবস্থায় পড়লে আপনারা কী করতেন

আস্তে হাঁটা লাগালুম এবার। কী করবো এখন? নিছক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবো বলেই আমি এমন-তেমন এটা-সেটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করি না। কিন্তু যদি কোনো অভিজ্ঞতা অনাহূত এসে হাজির হয়? কী হবে তখন?

একটা হোটেলে ঢুকে পড়লুম। কোনো খাবার খেতে ইচ্ছে করলো না। আমার পেটটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। হোটেলওলার সঙ্গে বাড়িটায় আমার খাবার পাঠিয়ে দেয়া নিয়ে কথা বললুম। সে যখন শুনতে পেলে কোন্ বাড়ি, কোথাকার, সেও বললে: 'দিনের বেলায় আমি আপনাকে খাবার পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু রাত্তিরে! ছোঁড়াগুলো কেউ যাবেই না! মাড়াবেই না ওধার! ও বাড়িতে কে-এক মেয়ে কুয়োয় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছিলো! বাড়ির মধ্যেই কোথাও সে আছে এখনও! আপনি, সার, ভূত-পেত্নিকে ভয় করেন না?'

আমার ভয়ের আধখানাই প্রায় উধাও হ'য়ে গেলো। মেয়ে মরেছে, এ বুঝি মেয়েভূত? আমি বললুম: 'ও, সে কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। তাছাড়া আমি ঠিকঠাক মন্তর জানি!'

কোনো ফুশমন্তরই আমার জানা নেই। তবে এ'তো মেয়ে, আর যেমন বলেছি,

এ-কথা শোনবামাত্র আমার আদ্ধেক ভয় চ'লে গিয়েছে। সেখান থেকে আমি গেলুম কাছের একটা ব্যাঙ্কে। আমার দু-তিনজন বন্ধু ও-ব্যাঙ্কের কেরানি। তাদের গিয়ে আমি খবরটা দিলুম। শুনেই তারা আমার ওপর খুব রেগে উঠলো।

'তুমি একটা হাঁদার কতো কাজ করেছো। ওটা একটা হানাবাড়ি—ভুতুড়ে বাড়ি। ভূত আবার পুরুষদেরই বেশি ক্ষতি করে।'

হুম, এই মেয়েভূত তাহ'লে পুরুষদের ঘৃণা করে! তোফা! চমৎকার!

এক বন্ধু বললে, 'বাড়িটা ভাড়া নেবার আগে আমাদের কারু সঙ্গে কথা বলতে পারতে না?'

আমি বললুম 'এত-সব সাত কাহন তখন কে জানতো? আচ্ছা, আমাকে শুধু একটা কথার জবাব দাও। মেয়েটি ঐ কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছিলো কেন?'

'প্রেম', আরেক বন্ধু উত্তর দিলে। 'মেয়েটির নাম ছিলো ভার্গবী। বয়েস, একুশ। সবে বি-এ পাশ করেছে। বি-এ পরীক্ষা দেবার আগেই সে কার যেন প্রেমে পড়েছিলো —গভীর প্রেম। কিন্তু ছেলেটি আর কাউকে বিয়ে ক'রে বসে। বিয়ের রাতেই ভার্গবী কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করে।'

আমার ভয় তিন-চতুর্থাংশই উধাও হ'য়ে গেলো। পুরুষদের প্রতি তার এমন রাগ ও বিদ্বেষের কারণ তবে এটাই?

আমি বললুম: 'ভার্গবী আমার কোনো অনিষ্ট করবে না।'

'কেন?'

আমি বললুম: 'ফুশমন্তর!'

'হুম দেখবো...রাত্তিরে বাছাধন কত চীৎকার-চ্যাচামেচি করেন।'

সে কথার উত্তরে আমি কিছু বললুম না।

বাড়ি ফিরে এলুম আমি। দরজাগুলো খুললুম সব—জানলাগুলো খুলে দিলুম পরপর। তারপর নিচে নেমে এসে কুয়োর কাছে দাঁড়ালুম।

'ভার্গবী কুট্টি!' গলা নামিয়ে মৃদু স্বরে আমি ডাক দিলুম। 'আমাদের পরস্পরের দেখা হয়নি অবশ্য, তবে আমি এখানে থাকতে এসেছি কিন্তু। আমার নিজের ধারণা আমি লোকটা ভালোই। এত বয়েসেও বিয়ে হয়নি—অর্থাৎ কনফার্মড ব্যাচেলার। শুনুন, ভার্গবী, আমি আপনার সম্বন্ধে বেশ কিছু নালিশ শুনেছি। শুনে বুঝেছি, এ বাড়িতে এসে কেউ থাকুক এ আপনি চান না। রাত্তিরে আপনি জলের কল খুলে দেন। দরজাগুলো ধুমদড়াক্কা ক'রে বন্ধ করেন। পুরুষদের গলা টিপে ধ'রে দম আটকে মারবার চেষ্টা করেন...এইসব কথাই আমি শুনেছি। কিন্তু আমি কী করবো, বলুন তো?

আমি দু মাসের ভাড়া আগাম দিয়েছি। তাছাড়া, জায়গাটাও আমার দারু। মনে ধ'রে গিয়েছে।

'আমি এখন নিরিবিলি ব'সে ব'সে কাজ করতে চাই। তার মানে, আমি কতগুলো গল্প লিখতে চাই। ও-হ্যাঁ, ভার্গবী কুট্টি, একটা কথা গোড়াতেই জিগেশ ক'রে নিই। আপনার গল্প ভালো লাগে তো? যদি লাগে, আমি কিন্তু আপনাকে আমার সব গল্প প'ড়ে শোনাতে পারি, ভার্গবী কুট্টি। প'ড়ে শোনাবো?...আপনার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই ভার্গবী কুট্টি। কারণ আপনার আমার মধ্যে কোনো কিছু ঘটেনি।...কিছু না-ভেবেই আমি অবশ্য কুয়োর মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়েছিলুম। ও-রকম কিন্তু আর কক্‌খনো ঘটবে না। আমাকে মাফ ক'রে দিন এবারকার মতো। কী? আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছেন তো, ভার্গবী কুট্টি? আমার কাছে একটা খাশা গ্রামোফোন আছে। গোটা দু-এক প্রথম শ্রেণীর গানের রেকর্ড আছে। আপনি গান ভালোবাসেন তো?'

অত কথা বলবার পর আমি হঠাৎ চুপ ক'রে গেলুম। এ-সব আমি বলছি কাকে? ...মুখ হা-করা এক কুয়োকে, যে কিনা সবকিছু গেলবার জন্যে তৈরি হ'য়ে আছে? বলছি কি গাছপালাকে, বাড়িটাকে, ছমছমে আবহাওয়াটাকে, আকাশ বা মাটি-পৃথিবীকে? কাকে?...আমি কি কথা বলছি আমার চঞ্চল অস্বস্তিতে ভরা মনকে? মনে-মনে বললুম: আমি আমার মনের জীবকেই এ-সব কথা বলছি। ভার্গবী? তাকে আমি চোখেও দেখিনি। সে তরুণী, একুশ বছর বয়েস, কাকে যেন সে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলো, তার বউ হ'য়ে থাকতে চেয়েছিলো, চেয়েছিলো তার জীবনসঙ্গিনী হ'তে, লোকটার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে নিয়ে তার বাকি দিনগুলো কেমন কাটবে, এ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলো ভার্গবী। কিন্তু সেই স্বপ্ন...হ্যাঁ, স্বপ্ন শেষ অব্দি স্বপ্নই থেকে গেছে। মোহভঙ্গ হয়েছে ভার্গবীর, পরিত্যক্ত হয়েছে সে...

'ভার্গবী কুট্টি!' আমি বললুম, 'আপনার কিন্তু অমন কাজ করা উচিত হয়নি। ভুলেও ভাববেন না আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি। আপনি যাকে অত ভালোবাসতেন, সে আপনাকে তেমন ভালোবাসেনি—সে আর কোন মেয়েকে বেশি ভালোবাসতো। তাকে সে বিয়ে করেছিলো। কাজেই জীবনটা আপনার কাছে তিক্ত আর বিস্বাদ হ'য়ে গিয়েছিলো। হ্যাঁ, গিয়েছিলো। তবে জীবন তো আর শুধু এমন তিক্ততাতেই ভরা নেই। আচ্ছা, এ-প্রসঙ্গটা বাদ দিন। অন্তত আপনার বেলায় যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না, সেটা বলতে পারি।

'ভার্গবী কুট্টি, আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি এটা ভাববেন না যেন। সত্যি কি আপনি প্রেমের জন্য মারা গিয়েছিলেন? প্রেম তো কোনো চিরন্তন জীবনের উষা।

আপনি যে-রকম বোকা-সোকা কাজ ক'রেছেন, তাতে মনে হয় না আপনি জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতেন। পুরুষদের সঙ্গে আপনার এই শত্রুতাই সেটা বুঝিয়ে দেয়। আপনি শুধু একজন পুরুষকে জানতেন। ধ'রে নেয়া যাক, সেই বিশেষ পুরুষটি আপনার অনিষ্ট করেছিলে। কিন্তু তাই ব'লে সব পুরুষের দিকে অমন একটা কালো চশমার মধ্যে দিয়ে তাকানো কি উচিত? আত্মহত্যা না-ক'রে আপনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে অ্যাদ্দিনে নিজেই বুঝে যেতেন যে আপনার ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল ছিলো। কত লোক আসতো জীবনে, যারা আপনাকে দেবীর মতো মনে করতো, আপনার স্তুতি করতো পুজো করতো। কিন্তু আমি তো বলেইছি, যে একবার আপনার জীবনে যা ঘটেছে তার কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না।

'তা, যা ই হোক, আমার কোনো ক্ষতি করবেন না যেন। না-না, এ কোনো রণে আহ্বান নয়—এ আমার অনুরোধ। আপনি যদি আজ আমার গলা টিপে মারেন, তবে এমন কেউ নেই যে এসে জিগেশ করবে কেন মেরেছেন। কেউ যে আপনার ওপর সেজন্যে প্রতিশোধ নেবে, তা নয়। প্রতিশোধ নেবার কেউ থাকবেই না—কারণ আপন বলতে আমার কেউ নেই।

ভার্গবী কুট্টি, পরিস্থিতিটা এবার হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তো? আমরা দুজনেই এখানে থাকছি। তার মানে, আমি এখানে থাকবো ব'লে মনস্থ করেছি। কুয়ো আর বাড়িটা এখন আমার, আইনসংগত ভাবেই আমার অধিকারে। সে-কথা না-হয় বাদ দিন। আপনি নিচের তলার চারটে ঘর আর কুয়োটা ব্যবহার করতে পারেন। রান্নাঘর আর বাথরুমটা আমরা দুজনেই সমানভাবে ব্যবহার করবো। কী, এই ব্যবস্থাটা আপনার মনঃপূত হ'লো তো?'

আমি বেশ তুষ্টই হলুম। কিছুই ঘটলো না।

রাত্রিবেলা। আমি খাবার খেতে বেরোলুম, এক ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে ফিরে এলুম। টর্চটা জালিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথমে লণ্ঠনটা জেলে নিলুম। ঘরটা হলদে আলোয় ভ'রে গেলো।

টর্চ হাতে নিচের তলায় এলুম। অন্ধকারে খানিকক্ষণ চুপচাপ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। অভিপ্রায় ছিলো জলের কলগুলো তালাবন্ধ ক'রে দেয়া। সব জানলা খুলে দিলুম। তারপর রান্নাঘর আর কুয়োটার কাছে গেলুম। মনে-মনে ঠিক করলুম, জলের কল তালাবন্ধ ক'রে রাখা উচিত হবে না।

দরজাগুলো বন্ধ ক'রে খিল লাগিয়ে ওপরে চ'লে এলুম। একটু চা খেলুম, তারপর একটা বিড়ি জালিয়ে তারপর খানিকক্ষণ ব'সে রইলুম চেয়ারটায়। লিখতে শুরু করবো ভাবছি, এমন সময় টের পেলুম কে যেন আমার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে… ভার্গবী!

আমি বললুম : 'লেখার সময় কেউ ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখুক এটা আমি পছন্দ করি না।'

ব লে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি···কেউ কি ছিলো না এখানে, এইমাত্তর !

কেন যেন লিখতে আর ইচ্ছে করলো না আমার। উঠে ঘর দুটোয় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলুম। একফোঁটাও হাওয়া নেই। বাইরে, গাছে একটা পাতাও নড়ছে না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি...একটা আলো !

কী-রকম আলো ! নীল ? লাল ! না কি হলদে ? সেটা কিছু বোঝা গেলো না। শুধু এক ঝলক চোখে পড়েছিলো আলোটা।

ওহ্, তাহ'লে চোখের ভুল, নিজেকে আমি বোঝালুম। আলোটা যে দেখেইছি, হলফ ক'রে বলতে পারবো না—তবে এও বলতে পারবো না যে আলোটা আমার চোখেই পড়েনি। তবে, না-ই যদি দেখে থাকি, আলোটা আমি কল্পনা করলুম কীভাবে ?

অনেকক্ষণ পায়চারি ক'রে বেড়ালুম আমি। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম একটুক্ষণ। কিছুই অন্যরকম, বা অসাধারণ, চোখে পড়লো না। একটা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুতেই মন বসানো গেলো না। তাহ'লে সকাল-সকালই শুয়ে পড়া যাক আজ, এই ভেবে বিছানা পাতলুম। বাতিটা নিভিয়ে দিলুম। তারপর হঠাৎই মনে হ'লো কিছু গান বাজালে হয়।

আবার উঠে বাতিটা জেলে আমি গ্রামোফোনের ঢাকা খুললুম। সাউণ্ডবক্সে একটা নতুন নীডল লাগিয়ে দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে দম দিলুম।

কার গান বাজাবো ? সারা জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে আছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা চাপা গুঞ্জন—আমার কানের মধ্যে কেমন-একটা গুনগুন সুর বেজে উঠছে। আমার মোটেই ভয় করছিলো না। কিন্তু কেমন-একটা রোমাঞ্চ, একটা শিহরন খেলে যাচ্ছে যেন আমার মধ্যে। হাওয়ার মধ্যে যেন একটা ছমছমে স্তব্ধতা ঝুলছে - তাকে আমি হাজার টুকরোয় ভেঙে দিতে চাই। কার গান ভাঙবে এই স্তব্ধতা ? রেকর্ডগুলোর মধ্যে খুঁজে শেষটায় বার করে আনলুম কালো মার্কিন গায়ক পল রোবসনের একটা রেকর্ড। পল রোবসন যন্ত্রটার মধ্যে গান ক'রে উঠলেন। তাঁর গভীরমধুর সুনাদী পুরুষ গলা গান ধরলো : 'জোশুয়া ফট দি ব্যাটল অভ জেরিকো।'

তারপরে বাজলো পঙ্কজ মল্লিক : 'তু ডর না সুরভি !' 'সুরভি, তোমার কোনো ভয় নেই।'

তারপর নরম সুরেলা নারীকণ্ঠ, এম এস সুব্বুলক্ষ্মী 'কাটিনিলে বারুম গীতম'···'গান ভেসে আসছে হাওয়ায়।'

এম এস সুব্বুলক্ষ্মীর গান শেষ হ'য়ে গেলো।

তিনটে গানের পর আমার মনটা যেন একটু শান্ত হ'লো। আমি একটুক্ষণ চুপচাপ ব'সে রইলুম। তারপর ঠিক করলুম এবার মহান সায়গলের শরণাপন্ন হবো। তিনি সেই মাধুর্য আর বিষাদে ভরা নিচু গলায় গান গাইলেন : 'শো যা রাজকুমারী! 'ঘুমোও. রাজকুমারী, ঘুমোও সুন্দর সব স্বপ্ন দ্যাখো।'

সেই গানও একসময় শেষ হ'য়ে গেলো।

'আজ এই পর্যন্ত থাক ; আবার কাল গান শোনা যাবে', এই ব'লে আমি গ্রামোফোনের ডালাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। বাতিটা নিভিয়ে. একটা বিড়ি ধরিয়ে, আমি শুয়ে পড়লুম। আমার পাশেই প'ড়ে আছে টর্চ আর আমার হাতঘড়ি।

শুয়ে পড়ার আগে আমি অলিন্দের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। রাত তখন দশটা হবে নিশ্চয়ই। শুয়ে-শুয়ে আমি উৎকর্ণ হ'য়ে আছি।

ঘড়িটার ছোট্ট অস্ফুট টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে এলো না। কেটে চললো মিনিট আর ঘণ্টা। কোনো ভয় নেই। মনের মধ্যে যা অনুভব করছি সেটা একটা ঠাণ্ডা ভাব—ঠাণ্ডা একটা সজাগ ভাব। আমার কাছে এ নতুন-কিছু নয়। কুড়ি বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে, আমার জীবনে, এমন অনেক অভিজ্ঞতাই ঘটেছে যার কোনো মানে তলিয়ে বুঝতে পারিনি। আর তাই আমার মন অতীত আর বর্তমানের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগলো। আর তার মধ্যেই আমি কান খাড়া ক'রে আছি··· কখন দরজায় কড়া নাড়ে কেউ ..কখন ছপছপ ক'রে জল পড়ে কল থেকে। গলা টিপে ধরলে দশ আঙুলের চাপে খুব কি ব্যথা পাবো আমি? রাত তিনটে অব্দি আমি শুধু নরম টিকটিক শব্দ শুনলুম।

তাছাড়া আর-কিছুই শুনিনি। কোনো নতুন বা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়নি আমার। পুরোপুরি শান্ত ও স্তব্ধ সব। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। কোনো স্বপ্নও দেখিনি। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো বেলা ন-টায়।

কিছুই হয়নি।

'ভার্গবী কুট্টি, অনেক ধন্যবাদ।...একটা জিনিশ আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি—লোকে, ভার্গবী কুট্টি আপনার দোষ ধরছে মিছামিছি, অকারণেই! বলুক না ওরা যা খুশি – কে পাত্তা দেয়—আপনার কি তা-ই মনে হয় না?'

এইভাবে কেটে চললো আমার দিনরাত্রি। বেশির ভাগ রাতেই, লিখতে-লিখতে যখন আমার ক্লান্ত লাগে, আমি রেকর্ড বাজাই। প্রত্যেকটা গান বাজাবার আগে আমি ঘোষণা করি গায়কের নাম, গানের বিষয়বস্তু। আমি বলি, 'এর পরের গানটা গেয়েছেন বাঙালি গায়ক পঙ্কজ মল্লিক। ভারি করুণ গান, হারানো দিনগুলোর বিধুর স্মৃতি

জাগিয়ে দেয়। মন দিয়ে শুনুন : গুজর গয়া ও জামানা ক্যায়সা…ক্যায়সা…'

কিংবা বলি : 'পরের গানটা বিং ক্রসবির। "ইন দি মুনলাইট।" তার মানে ..ও, আপনি তো বি-এ পাশ…মাফ করবেন।'

এ-সবই বলি আমি নিজেকে শুনিয়ে-শুনিয়ে। এইভাবে আড়াই মাস কেটে গেলো। আমি নিজের হাতে বাগান করলুম। যখনই কোনো ফুল ফোটে আমি বলি এ ফুল ভার্গবী কুট্টির। এর মধ্যে আমি একটা ছোট্ট উপন্যাস লিখেছি। অনেক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তাদের অনেকেই আমার সঙ্গে রাতও কাটিয়েছে এখানে। তারা ঘুমোতে যাবার আগে আমি সন্তর্পণে নিচে নেমে গিয়ে নিচু গলায় অন্ধকারে বলেছি : 'দেখুন, ভার্গবী কুট্টি আমার কয়েকজন বন্ধু আজ রাতটা এখানেই কাটাবেন। দোহাই, তাদের গলা টিপে মারবেন না। সে-রকম কিছু হ'লে পুলিশ এসে কিন্তু আমাকেই পাকড়াবে। দোহাই, একটু সাবধানে থাকবেন…আচ্ছা, শুভরাত্রি!'

এমনিতে, বাড়ি ছেড়ে বেরুবার সময়, আমি ব'লে যাই : 'ভার্গবী কুট্টি, বাড়িটা আপনার জিম্মাতেই রইলো। কোনো চোর-ছ্যাঁচড় এলে তাকে আপনি গলা টিপে মারতে পারেন। তবে লাশগুলো কিন্তু এখানে ফেলে রাখবেন না। মৃতদেহগুলো আপনাকে মাইল তিন-চার দূরে পাচার ক'রে দিয়ে আসতে হবে। না-হ'লে আমাদের বেজায় মুশকিলে পড়তে হবে।'

কোনো রাত্তিরে, শেষ শো সিনেমা দেখে এসে, আমি বলি : 'আমি এসেছি কিন্তু।'

এ-সবই ঘটেছে এখানে থাকতে আসার গোড়ার কয়েক মাসে। যত দিন যেতে লাগলো, ততই আমি ভার্গবীকে একটু-একটু ক'রে ভুলতে শুরু করলুম। তার মানে, আমি আর তার সঙ্গে তত কথা বলি না। মাঝে-মাঝে তার কথা আমার মনে প'ড়ে যায়। ব্যাস, এইটুকুই।

এই পৃথিবীতে জগতে মনুষ্য সৃষ্টির পর থেকেই…অগুনতি, লক্ষ-কোটি নারী-পুরুষ মারা গেছে। তারা সব ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে এই পৃথিবীরই মাটি হ'য়ে উঠেছে। আমরা সবাই সে কথা জানি। ভার্গবীই যেন তাদের সবার স্মৃতি হ'য়ে র'য়ে গিয়েছে। আমার অন্তত এইভাবেই তার কথা মনে পড়ে।

তারপর একরাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

রাত তখন প্রায় দশটা। আমি ন-টা থেকে একটা ছোটোগল্প লিখছিলুম। খুবই আবেগতাড়িত একটা লেখা। আমি প্রায় জরাতুর ভাবে লিখে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হ'লো আলো ক্রমেই মিইয়ে আসছে।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ঝাঁকুনি দিলুম। কেরোসিন প্রায় নেই বললেই চলে ; তবু

মনে হ'লো হয়তো কোনোক্রমে আরো-একটা পাতা লিখে ফেলতে পারবো। এ যে খুব ভেবেচিন্তে ঠিক করেছিলুম, তা নয়। আমার সব মন তখন যে-গল্পটি লিখছি তার ওপর প'ড়ে আছে। আলো যখন ক'মে আসে, তখন কারু স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কী হয়? ঝেঁকে দেখা যে তেল আছে কি না—আমি যেমন করেছি। তারপর আমি সলতেটা উশকে দিয়েছি। আমি লিখেই চললুম। আবারও আলো ক'মে এলো, আবারও আমি সলতেটা উশকে দিলুম, আর লিখেই চললুম। আবার আলো মিটমিটে হ'য়ে এলো। আবারও আমি সলতেটা উশকে দিলুম। এ-রকম হ'তে হ'তে লণ্ঠনের সলতেটা প্রায় আধ ইঞ্চি চওড়া চার ইঞ্চি লম্বা একটা জলজ্বলে ব্যাপার হ'য়ে উঠলো।

টর্চটা জ্বালিয়ে এবার আমি লণ্ঠনের সলতেটা একেবারে নামিয়ে দিলুম। বাতিটা যে নিভে গেলো তা বোধহয় বলার আর দরকার নেই।

নিজেকেই জিগেশ করলুম: 'একটা আলো জোটে এখন কোত্থেকে? কীভাবে?'

কেরোসিন জোগাড় করতে হবে চট ক'রে। মনে প'ড়ে গেলো আমি ব্যাঙ্কে চ'লে যেতে পারি। বাড়িটার এক অংশে আমার তিন কেরানি বন্ধু থাকে। তাদের স্টোভ থেকে, খানিকটা তেল ধার ক'রে আনা যায়। টর্চটা আর খালি কেরোসিনের বোতলটা তুলে নিয়ে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে নিচে নেমে এসে সদর দরজাটাও লাগিয়ে দিলুম। বাইরে এসে, ফটকটা বন্ধ ক'রে, রাস্তা ধ'রে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলুম। চাঁদের আলো কি-রকম ঝাপশা ঠেকছে, যেন কুয়াশায় মোড়া। আকাশটা মেঘলা।

আমি হনহন ক'রে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলুম।

ব্যাঙ্কের বাড়িটার সামনে পৌঁছে আমি ওপরে তাকিয়ে কেরানিদের একজনের নাম ধ'রে হাঁক দিলুম। দু তিনবার ডাকার পর ওদের একজন নেমে এসে পাশের দরজাটা খুলে দিলে। আমরা দালানের পাশ দিয়ে হেঁটে পেছনে এসে খিড়কির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলুম। এসে দেখলুম ওরা তিনজনে তাশ খেলছিলো।

আমি যখন ওদের কেরোসিনের কথা বললুম, ওদের একজন হেসে বললে: 'কী? তোমার ভার্গবীকে কেরোসিন নিয়ে আসতে বলতে পারলে না?'

আমি কিছু বললুম না বটে, তবে ওদের হাসিতে যোগ দিলুম। ওদের একজন যখন স্টোভ থেকে তেল বার ক'রে বোতলে ঢালছে, তখনই ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো।

আমি বললুম: 'আমাকে একটা ছাতাও দিতে হবে তোমাদের।'

ওরা বললে: 'ছাতার কথা ছাড়ান দাও, একটা ছড়ি অব্দি এখানে নেই যে ছাতার দাঁড় তৈরি করবো। বরং এসো, দু-এক দান তাশ খেলা যাক। বৃষ্টি ধ'রে এলে না-হয় যেয়ো।'

অতএব আমিও তাশ খেলতে ব'সে গেলুম। আমার পার্টনার আর আমি পর-পর তিন দান হেরে গেলুম। তার বড়ো কারণ আমি কিছুতেই মন বসাতে পারছিলুম না খেলায়। আমার সমস্ত মন তখন যে-গল্পটা লিখছি তার ওপর প'ড়ে আছে। বৃষ্টি যখন থামলো রাত তখন প্রায় একটা। আমি টর্চটা আর কেরোসিনের বোতলটা তুলে দিলুম। কেরানিরা শুয়ে পড়বার উদ্‌যোগ করলে। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে নামলুম, ওরা ততক্ষণে আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায়, জনপ্রাণীর কোনো সাড়া নেই, কোথাও একটা আলোও নেই। আমি হেঁটেই চললুম। কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন নেই—সব অন্ধকারে ঢাকা। আমি মোড় ঘুরে আমার বাড়ির কাছে এসে পড়লুম। মিটমিটে চাঁদের আলোয় সারা জগৎ যেন কেমন-একটা ভাপে-কুয়াশায় ঢাকা বিস্ময় হ'য়ে উঠেছে। মনের মধ্যে কী ভাবনা খেলে যাচ্ছিলো, খেয়াল নেই। হয়তো আমি বিশেষ কিছুই ভাবছিলুম না। ফাঁকা স্তব্ধ রাস্তাটা ধ'রে টর্চ জালিয়ে হনহন ক'রে হেঁটে আসছিলুম।

বাড়ি পৌছে, ফটকটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। ওপরে, দোতলায়, কোনো আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে ব'লে মনে করবার কোনো কারণ ছিলো না আমার। তবে একটা কথা বলা উচিত: কেন জানি না অকারণেই আমার মনটা ভারি বিষণ্ণ হ'য়ে ছিলো। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। আমি খুব সহজেই হো-হো ক'রে হাসতে পারি। কিন্তু কাঁদতে আমার খুব মুশকিল হয়। আমার চোখে সচরাচর কিছুতেই একফোঁটাও জল আসে না—একফোঁটাও না। যখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে তখন আমার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ঐশীভাব দেখা দেয়। তখন আমার ঠিক সে-ভাবটাই হচ্ছিলো।

ও-রকম বিষণ্ণ মন নিয়েই আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলুম। আর তখনই…আচমকা …একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে প'ড়ে গেলো। আমার অবচেতন মন সেটা খেয়াল করলো। যা ঘটেছিলো তা এই: যখন আমি দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে যাই, তখন তেল ছিলো না ব'লে লণ্ঠনটা পুরোপুরি নিভে গিয়েছিলো। ঘরটা ছিলো অন্ধকারে ঢাকা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়েছে। কোন-না তিন ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। দরজার ফাটল দিয়ে আলোর রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই আলোটাই আমার চোখে পড়েছে আর অবচেতন মন সেটা খেয়াল করেছে। কিন্তু এই তথ্য, গুপ্তরহস্য, তখনও আমার চেতন মনটায় গিয়ে পৌছোয়নি।

দস্তুর মাফিক আমি চাবি বার ক'রে নিলুম। তারপর টর্চ ফেললুম তালার ওপর।

তালাটা রূপোর মতো ঝকঝক করছে···কিংবা এই বললেই কি আরো সত্যি হয় না যে তালাটা যেন টর্চের আলোয় মুচকি হাসছে ?

দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লুম। তারপর নিমেষের মধ্যে সব একসঙ্গে চোখে পড়লো আমার। তার মানে, আমার গোটা অস্তিত্বটাই যেন এক ঝটকায় টের পেয়ে গেলো কী ঘটেছে। আমি ভয়ে আঁৎকেও উঠিনি, কেঁপেও উঠিনি। আমি শুধু স্তম্ভিত হ'য়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। কী রকম একটা গুমোট গরমভাব খেলে গেলো আমার মধ্যে—আমি ঘেমে গেলুম।

সারা ঘরটা আর তার চার শাদা দেয়াল একটা নীল আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আলো আসছে লণ্ঠনটা থেকেই···দুই ইঞ্চি নীল শিখা, জ্বলন্ত...আমি বিস্ময়ে অভিভূত আর হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কেরোসিনের অভাবে যে লণ্ঠনটা নিভে গিয়েছিলো, সেটা কে জ্বেলেছে ? কোত্থেকে এসেছে এই নীল আলো ?

## জন্মদিন 

মকরম্-এর আজ আট তারিখ, আজ আমার জন্মদিন। রোজকার যা অভ্যাস, তার উলটোটাই হ'লো আজ – একেবারে ভোরবেলাতেই উঠে পড়েছি, প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি সমাপ্ত ক'রে এমন কী স্নানটাও সারা ; তারপর খদ্দরের জামা আর ধুতি চাপিয়ে, ক্যানভাসের একজোড়া শস্তা জুতোয় পা গলিয়ে, কেমন ভারি মনে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি ইজিচেয়ারে। আমাকে এত ভোরে উঠতে দেখে আমার পাশের ঘরের প্রতিবেশী ম্যাথুকে – ম্যাথু বি এ. পড়ে – বেশ একটু অবাক দেখালো।

ইংরেজিতে সে বললে, 'হ্যালো ! গুড মর্নিং !'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ ! গুড মর্নিং !'

ম্যাথু শুধোলে, 'আজ যে এত ভোরে উঠে পড়েছেন ?···কোথাও যাবেন বুঝি ?'

'না', আমি বললুম, 'আজ আমার জন্মদিন।'

ম্যাথু ইংরেজিতে : 'ইওর বার্থডে ?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্, আই উইশ ইউ মেনি হ্যাপি রিটার্নস অভ দি ডে !'

'ধন্যবাদ।'

ম্যাথু দাঁতে একটা টুথব্রাশ চেপে বাথরুমে ঢুকে পড়লো। এর মধ্যেই চারপাশে হৈ-হৈ-চীৎকার ব্যস্ততা শুরু হ'য়ে গেছে। মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে সিনেমার প্রেমের গানের এক-আধটা কলি। এরা সবাই হয় ছাত্র, নয় কেরানি। এদের কি কারও কোনো উদ্বেগ বা ভাবনা আছে ? এদের কাছে জীবন উপভোগেরই বিষয়। ওদিকে আমি ব'সে-ব'সে ভাবছি কেমন ক'রে এক পেয়ালা চা জোটানো যায়। আজ দুপুরবেলায় যে খাওয়া জুটবে, সেটা নিশ্চিত : কাল, যখন বাজার যাচ্ছি, হামিদ হঠাৎ আমায় খেতে নেমন্তন্ন করেছে, কোনো কারণ ছাড়াই। হামিদ মাঝারি দরের একজন কবি, তবে মস্ত বড়োলোক। কিন্তু এখন, দুপুরের খাওয়া অব্দি, চা ছাড়া কাটাতে হবে নাকি ? তা হয় না। আমার ঘরে ব'সে-ব'সেই টের পেলুম ম্যাথুর বুড়ো চাকর তার জন্যে চা বানাচ্ছে— আমার ঘরটা আসলে ম্যাথুর রান্নাঘরেরই ভাঁড়ার। বাড়িওলা আমায় মাসে আট

আনায় ভাড়া দিয়েছে। সারা বাড়িটার সবচেয়ে খুদে ঘর। আমার ইজিচেয়ার, টেবিল, শেলফ আর খাট পাতার পর নিঃশ্বাস ফেলবারও একটু জায়গা নেই। দেয়াল-ঘেরা উঠোনটার মধ্যে তিনটে দালানেই থাকে ছাত্র ও কেরানিরা। আমিই হচ্ছি একমাত্র লোক বাড়িওলা যাকে ত্রিসীমানাতেও চায় না। কারণ আমি ওঁকে নিয়মিত ভাড়া দিই না। আমাকে বেজায় অপছন্দ করে এ-রকম আরো দুই তরফ আছে : হোটেলওলা আর সরকার। হোটেলওলার কাছে অবশ্য কিছু টাকা ধারি আমি, তবে সরকারের কাছে আমার কোনো ধারদেনা নেই ; অথচ তবু সরকার আমায় দু-চক্ষে দেখতে পারে না ; তা আমি তো আমার আস্তানা, খাদ্য আর দেশ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলেছি এবার আমায় আমার জামা-কাপড়-জুতো আর আমার বাতিটা সম্বন্ধে কিছু ব'লে নিতে হবে।

[ আর-কিছু লিখবার আগে এ-কথাটা আমার স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাবে ব'লে দেওয়া উচিত : এখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে এ-শহরটায় এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছি আমি ; ঘর ছেড়ে আমি বেরিয়েছিলুম কাগজ-কলম হাতে নিয়ে। এমনিতে তার কোনো বিশেষ কারণ ছিলো না, তবে আমি আমার দিনপঞ্জিতে একেবারে সূচনা থেকে শেষ অব্দি সারাদিনটার কথাই লিখতে চেয়েছিলুম। এর মধ্যে নিশ্চয়ই মোটামুটি অন্যরকম কোনো ছোটোগল্পের খোরাক জুটে যাবে। কিন্তু আমার ঘরে লণ্ঠনটায় কোনো তেল নেই, অথচ অনেককিছুই লিখবার আছে। সেই জন্যেই আমি খাট থেকে নেমে ঝিলের ধারে এই একলা বাতিটার তলায় এসে বসেছি, মনে সবকিছু টাটকা থাকতে-থাকতেই লিখে ফেলতে শুরু করেছি। ]

সারাদিনের সব ঘটনায়, আমার মন ওপরের আকাশের মেঘের মতোই ভারি হ'য়ে আছে—যে-কোনো মুহূর্তে হয়তো বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে। অথচ আজকের দিনটা অন্যদিনের চাইতে এমন-কিছু আলাদা ছিলো না। তবে আজ আমার জন্মদিন। বাড়ি থেকে অনেক দূরে আছি। আমার হাতে কোনো পয়সা নেই, কোথাও কোনো ধার জোটাবারও কোনো উপায় নেই। গায়ে যে-জামা-কাপড় চড়িয়েছি, তাও নানা লোকের। আমার নিজের ব'লে কিছু নেই। ম্যাথ্ যখন আমায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলো এ-রকম কোনো জন্মদিনের আরো অনেক সুখী পুনরাবৃত্তি হোক, আমার বুকের মধ্যে কেমন ছোট্ট একটা ব্যথা টনটন করছিলো।

মনে আছে সব :

তখন সাতটা বাজে। আমার ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি আপন মনেই ভাবছি : অন্তত আজকের দিনটায় যাতে খারাপ কিছু না-হয়, সেজন্যে সাবধান থাকতে হবে আমায়। আজ কারু কাছ থেকে কিছু ধার করা চলবে না। আজ যেন কোনো গণ্ডগোল বা

ঝামেলা না-হয়। আজকের "আমি" যেন অতীতের শাদা-কালো শেকলে বাঁধা শত-শত দিনরাত্রির ভিন্ন ভিন্ন "আমার" চাইতে অন্যরকম হয়। কত বয়স হ'লো আমার আজ? গত বছরের চেয়ে একবছর বেশি···গত বছর?···ছাব্বিশ? না না, বত্রিশ। নাকি সাতচল্লিশই হবে?

মনটা কেমন অস্থির হয়ে আছে। উঠে আমি আয়নায় গিয়ে তাকালুম। খুব খারাপ তো নয়। মোটামুটি বিশিষ্টই তো মুখশ্রী। উঁচু চওড়া কপাল; সুঠাম স্থির চোখ; বাঁকা তলোয়ারের মতো গোঁফের সূক্ষ্ম রেখা। সব মিলিয়ে তেমন মন্দ নয়··· ···এমনটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অতর্কিতে একটা বিষম ধাক্কা খেয়ে যাই: একটা পাকা চুল। কানের ওপরটায় কালো চুলের মাঝখানে সরু একটা শাদা রেখা। অনেক চেষ্টা ক'রে সেটাকে ওপড়ানো গেলো। তারপর মাথায় হাত বুলোই আমি: পেছনে বেশ মসৃণই তো ঠেকছে। কিন্তু মাথায় যখন হাত বোলাচ্ছি তখন কেমন মনে হ'লো কেমন যেন দপদপ করছে ভেতরটা, একটু যেন মাথা ধরেছে! সে কি এখনও চা খাইনি ব'লে?

বেলা নটা: হোটেলওলা আমাকে দেখেই বিটকেল মুখ ক'রে তাড়াহুড়ো ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলো। যে-নোংরা কালিঝুলি মাখা ছোঁড়াটা চা বানায়, সে নগদ পয়সা চাইলে।

আমি বললুম, 'ও, সে কাল দিয়ে দেবো।'

ছোঁড়া আমায় বিশ্বাসই করলে না। উলটে বলল, 'সে আপনি কালও বলেছিলেন।'

'তখন ভেবেছিলুম আজ কিছু টাকা পাবো।'

'পুরোনো ধার না-মেটালে আপনাকে চা দিতে বারণ করেছে আমায়।'

'ওঃ!'

বেলা দশটা: ঠোঁট দুটি শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে। মুখের মধ্যেটায় সব শুকনো, কোনো আর্দ্রতা নেই। দুপুরবেলায় কড়া গরম। আমার মধ্যে কিসের একটা মস্ত ভার যেন চেপে বসছে। ঠিক তখন দুটি রোগা মিরকুট্টে ফ্যাকাশে মুখ খ্রীষ্টান ছেলে এসে হাজির, আট-দশ বছর বয়েসে, তারা কাঠের খড়ম বিক্রি করতে এসেছে। এক-জোড়ার দাম মাত্র তিন আনা।

'ওরে, আমার কোনো খড়ম চাইনে।'

'আজ্ঞে হুজুর, আপনার মতো লোক যদি না কেনেন, তবে আর কে কিনবে?'

'ওরে শোন, আমার খড়ম চাইনে···আমার কোনো পয়সা নেই।'

'ওঃ!'

ওদের চোখেমুখে অবিশ্বাস। বাইরের ভোলটার আড়ালে কী সত্য লুকিয়ে আছে বোঝবার মতো বয়স ওদের হয়নি—এখনও ওরা সরল আছে। আমার জামাকাপড়, আরামকেদারায় আমার হেলান দিয়ে শোবার ভঙ্গি; আমাকে সম্বোধন করতে হয় আজ্ঞে, হুজুর: কিন্তু আরামকেদারা, গায়ের জামা ধুতি, ক্যানভাসের জুতোজোড়া—এসব কিছুই আমার নয়। নিজের বলতে আমার কিছুই নেই। এমন কি যে আমি এক উদোম ন্যাংটো মানুষ—সেই আমিও কি আমার? ভারতবর্ষের সব শহরে উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরে বেড়িয়ে, সে কত-কত জায়গায় কত-কত ভিন্নরূপে আমিই তো ছিলুম: আমার রক্তমাংস অস্থিমজ্জা—সব ভারতবর্ষেরই। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, করাচি থেকে কলকাতা—সত্যি, ভারতবর্ষের সর্বত্র আমার বন্ধু আছে। আজ আমার মনশ্চক্ষুর সামনে আমার বন্ধুদের এক এক ক'রে ফিরিয়ে আনি, স্ত্রী পুরুষ সবাইকে। পূর্ণিমারাতের জ্যোৎস্নাস্নিভিত আলোর মতো আমার ভালোবাসা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে যাক, ছাপিয়ে যাক। ভালোবাসা? কেউ কি আছে, যে আমাকে চেনে, জানে, আমাকে ভালোবাসে? জ্ঞান—আমার মনে হলো—রহস্যের ওপর থেকে পর্দাটা উঠিয়ে দেয় যদি কারু দোষত্রুটি অক্ষমতা দুর্বলতা সরিয়ে নেয়া যায়, তবে কী থাকে? ভালোবাসতে হ'লে ভালোবাসা পেতে হ'লে একটা কিছু থাকা চাই যা মন কাড়ে, মন মাতায়। কী ঝড়ের বেগে সময় কেটে যায়। যে-আমাকে এই সেদিনও পায়ের পাতার ভর দিয়ে বাবার আঙুলটা ধরতে হ'তো, যে-আমি এই সেদিনও মায়ের আঁচল জড়িয়ে থাকতুম আর বলতুম, 'আম্মা, আমার খিদে পেয়েছে', সেই-আমি, আজ, এখন ···ওঃ সময়ের এই গতি,—সে যে কী ভয়ংকর, দুঃসহ। সে যে কত-কত আদর্শের বোমা ফেটেছে আমার বুকে, ফেটে চারদিকে ছেৎরে গিয়েছে, আমার হৃদয়টাই এক রণক্ষেত্র। কী আমি, তবে, আজ? বিপ্লবী, রাজদ্রোহী, ধর্মনিন্দুক, কমিউনিস্ট—আমি তো একাই কত ধরনের মানুষ। কিন্তু আমি সত্যি কী, আসলে? উঃ, শরীরটা কী বেজায় খারাপ লাগছে! মাথায় এমন একটা যন্ত্রণা যে মাথাটাই যেন ছিঁড়ে পড়বে। সে কি এইজন্যে যে এখনও এক পেয়ালা চা জোটেনি আমার? মাথাটা অব্দি খাড়া ক'রে রাখতে পারছি না। তবে, অন্তত, দুপুরে একটা আস্ত ভোজ জুটবে, সেটাই যা ভরসা।

বেলা এগারোটা: হামিদ তার দোকানে নেই। বাড়ি চলে গেছে নাকি? আমাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ি নিয়ে গেলেই মানাতো না কি? হয়তো সে ভুলে গিয়েছে। নিজেই যদি তার বাড়ি গিয়ে হাজির হই?

সাড়ে এগারোটা: হামিদের দোতলাবাড়ির লোহার দরজার পাল্লা বন্ধ। আমি কড়া নাড়লুম।

'হামিদ সাব?'

কোন সাড়া নেই।

'মিস্টার হামি-ই-দ !'

ভেতর থেকে তেরিয়া রাগী স্ত্রী-কণ্ঠ : 'বাড়ি নেই !'

'কোথায় গেছেন ?'

সব চুপ। স্তব্ধ। আবারও দরজায় ঘা দিই। এতটা পথ ক্লান্ত অবসন্ন ফিরে যাবার আগে শেষবার। তখন শুনতে পাই কার পায়ের আওয়াজ কাছে আসছে ; চুড়ির রুনুঝুনু। একটু খানি খুললো দরজার পাল্লা। এক তরুণী মেয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম : 'হামিদ সাব কোথায় গেছেন ?'

জরুরী কী একটা কাজে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন !'

'কখন ফিরবেন ?'

'সন্ধ্যেবেলা—রাতও হ'তে পারে।'

রাতও হতে পারে !

'উনি ফিরলে বলবেন যে আমি এসে খোঁজ করেছিলুম।'

'কে এসেছিলেন বলবো ?'

কে আমি ?

'আমি···ও, না, থাক, কেউ না। কিছু বলার দরকার নেই।'

ভারি পায়ে হেঁটে হেঁটে ফিরে এলুম। শুকনো চিনির মতো তেতে আছে রুক্ষ বালি। ঝিলের জলটা কাচের মতো ঝলসাচ্ছে। আমার দু-চোখে মাথার মধ্যে কেমন একটা অন্ধকার। ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি। হাড়গুলো যেন ঝলসে উঠছে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা। খিদেয় পেটের নাড়িভুড়ি জ্বলছে। এমন খিদে যে গোটা পৃথিবীটাই যেন গিলে ফেলতে পারি। খিদের আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছে এই বোধ যে খাবার জোটাবার কোনো উপায়ই নেই আমার। সামনে প'ড়ে আছে অন্তহীন দিনরাত্রি—খাদ্য জোটাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছাড়াই। অবসাদে ধপ ক'রে প'ড়ে যাব বুঝি কোথাও ?

সাড়ে-বারোটা : আমার চেনা লোকেরাও আমার পাশ কাটিয়ে হনহন ক'রে চলে যাচ্ছে আমাকে চোখে না-দেখেই যেন। 'বন্ধুরা, শোনো আজ আমার জন্মদিন। আমার সুখ কামনা করো—আমার জন্মদিনে !' ফিসফিস ক'রে বললুম আমি মনে মনে। ছায়ারা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে আমার। বন্ধুরা আমাকে দেখেও কেন কোনো কথা কইছে না ?

নিশ্চয়ই আমার পেছনে কেউ লেগেছে, গোয়েন্দা, সি-আই-ডি-র লোক। নিশ্চয়ই তাই !

বেলা একটা : মিস্টার পি-র কাছে গেলুম আমি ; আগে একটা কাগজের

সম্পাদক ছিলেন, এখন একটা দোকানের মালিক। চোখে তখন অন্ধকার দেখছি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। পি. বললে : 'বিপ্লব আর কত দূরে?'

'বেশ কাছেই।'

'হা-হা-হা। কোত্থেকে আসছো? অনেকদিন তোমায় দেখিনি।'

'হা হা হা।'

'কোনো কাজ আছে?'

'ও, না, এমনিই।'

আমি তার কাছেই একটা চেয়ারে ব'সে পড়লুম। আমার অনেক লেখাই আগে তার নামে বেরুতো। তার সেই আগেকার জাজ্বল্যমান খ্যাতির হেতুগুলোকে দেখিয়ে বেড়াবার জন্যে সে পুরোনো সংখ্যাগুলোকে বাঁধিয়ে রেখেছে। আমি সেটা তুলে ধ'রে পাতা ওলটাতে লাগলুম। আমার মাথা ঘুরছে, বুকটা যেন খুব জোরে টিপটিপ ক'রে বলছে : 'এক্ষুনি এক পেয়ালা চা চাই আমার। আমি সত্যি ভারি ক্লান্ত। পি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছে না চা খাবো কিনা। সে কি আমার ক্লান্তি দেখতে পাচ্ছে না? খুব গম্ভীর মুখ ক'রে সে ব'সে আছে তার ক্যাশবাক্সের কাছে। আমি বোকার মতো চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে প'ড়ে-থাকা একচিলতে দোসার জন্যে দুই ভিখিরি ছেলে কাড়াকাড়ি করছে। আমার সারা অন্তরাত্মা যেন মৌন অনুনয় করছে : 'নিদেন এক পেয়ালা চা।' পি. তার ক্যাশবাক্স খুললো, টাকাকড়ি ও রেজকির স্তূপের মধ্য থেকে সে একটা আনি বার ক'রে একটি ছোকরাকে হুকুম করলে, 'চা নিয়ে আয়।'

ছোকরা তড়িঘড়ি ছুটলো। এতক্ষণে আমার বুকটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো। ছোকরাটি চা নিয়ে এলে, পেয়ালাটা তুলে ধ'রে পি. আমার দিকে ফিরে জিগেস করলে, 'কী হে, চা খাবে নাকি?'

আমি বললুম, 'না।' তারপর ঝুঁকে প'ড়ে এমন ভঙ্গি করলুম যেন আমি আমার জুতোর ফিতে বাঁধছি, যাতে সে আমার মুখ দেখে টের না পায় আমার বুকের মধ্যে কী ভীষণ তোলপাড় চলেছে!

পি. অনুযোগ করলে, 'তোমার কোনো বই কিন্তু তুমি আমাকে দাও নি!'

'দেবো।'

'আমি বইগুলোর সমালোচনা পড়ছিলুম।'

'ভালো।' আমি হাসবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু যখন কারু হৃদয়ে কোনোই আলো নেই, তখন তার মুখ হাসে কী ক'রে?

আমি উঠে প'ড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম।

সি-আই-ডি-র লোকটা আমার পেছন নিলে।

বেলা দুটো : আমার ঘরে আমার ইজিচেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে আছি। ক্লান্ত, অসহায়, নিরাশ। ভালো পোশাক পরা সুগন্ধি-ভুরভুর এক অচেনা মহিলা আমার দরজায় এসে হাজির। অনেক দূর থেকে আসছেন তিনি। তাঁর দেশের বাড়ি বন্যায় ভেসে গিয়েছে। কিঞ্চিৎ সাহায্য চাই। হালকা স্মিত মুখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। দরজার পাল্লায় বুক চেপে ধরে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার বুকের মধ্যে কেউ যেন কামনার একটা বীজ ছিটোলো। আশপাশের কোনো ঘরেই এখন কেউ নেই। বীজটা যেন বহুগুণ হয়ে আমার স্নায়ু আর শিরায় ছড়িয়ে পড়লো। আমার মনে হলো আমি যেন আমার বুকের ঢিপঢিপ শুনতে পাচ্ছি। ভয়ংকর বিপজ্জনক এক মুহূর্ত।

'বহিন, আমার কাছে কিছু নেই। আপনি বরং আর কারু কাছে গিয়ে সাহায্য চান। আমার কিচ্ছু নেই!'

'ওঃ!' হতাশ হয়ে মহিলা চ'লে গেলেন, হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে একটা উসকানির ভাব।

তিনি পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছেন তাঁর সৌরভ!

বেলা তিনটে : কারু কাছে গিয়ে ধার চাইলে কী হয়? অবসাদ এখন চরমে পৌছেছে। ভয়ংকর এক অসহায় বোধ। কার কাছে যেতে পারি? কার কাছে চাইতে পারি? অনেক নামই পর পর মনে প'ড়ে গেলো। কিন্তু এভাবে ধার চাইতে কেমন যেন আত্মসম্মানে বাধে···কী? আত্মহত্যাই ক'রে বসবো নাকি? কেমন হবে মরণ? আমার?

সাড়ে তিনটে : মুখের মধ্যে জিভটা যেন গুটিয়ে কুঁচকে গিয়েছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যেতো যদি! এমন অবস্থায় যখন চিৎ হয়ে পড়ে আছি ইজিচেয়ারে, কয়েকজন সম্পাদকের চিঠি এলো। এঁরা গল্প চান, চটপট, ফেরত ডাকেই। চিঠিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি অসহায় ভাবে শুয়েই রইলুম। ব্যাঙ্ক কেরানি কৃষ্ণ পিল্লের বাচ্চা চাকর দেশলাই চাইতে এলো। তাকে আমি এক গেলাস জল আনতে বললুম।

আমার জল খাবার ধরন দেখে ছেলেটি জানতে চাইলে: 'কত্তার কি শরীর ভালো নেই?'

'না, ঠিক আছে।'

'তাইলে··আপনি কি কিছু খাননি, কত্তা?'

'না।'

'কেন বলুন তো? খাননি কেন?'

সেই ছোট্ট মুখখানা, সেই কালো চোখ দুটি, পরনে তার কালোকোলো একটা নেংটি : ও জানতে চাচ্ছে! আমি চোখ বুজলুম। আস্তে নরম স্বরে কে ডাকলে : 'কত্তা!'

'উঁ?' আমি চোখ খুললুম।

'আমার কাছে দু-আনা পয়সা আছে।'

'তো?'

একটু সঙ্কোচের ভঙ্গিতে সে বলল, 'সামনের মাসে বাড়ি যাবার আগে আপনি ও পয়সা ফিরিয়ে দিলেই হবে।'

তার কথা আমায় গভীরভাবে স্পর্শ করলো। বললুম, 'আচ্ছা, নিয়ে আয়।'

ঠিক সে-সময় আমার বন্ধু গঙ্গাধর এসে হাজির। শাদা খদ্দরের ধুতি, আর শাদা খদ্দরের জোব্বা তার পরনে, কাঁধে একটা নীল উড়ুনি। তার ভরাট কালো মুখটায় কেমন গম্ভীর ভাব। আমাকে উদাসীন ভাবে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখে নেতা আমাকে বললে, 'তুমি একেবারে বুর্জোয়া হয়ে গেছো দেখছি!' আমার মাথা ঘুরলে কী হবে, আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম। এই নেতার পরনে এই যে ধবধবে পোশাক তার মালিক কে হতে পারে? আমি সেই ধাঁধাটার উত্তর খুঁজলুম। জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর মুখচ্ছবি পর-পর আমার মনশ্চক্ষুতে ভিড় ক'রে এলো।

'কেন, হাসছো কেন?' গঙ্গাধর আমায় জিজ্ঞেস করলে।

'ওঃ, না বৎস, ও কিছু না। তোমার গায়ের এই সংগ্রহশালা দেখে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেলো।'

'রসিকতা ছেড়ে আমার কথা শোনো। সামনে ভারি বিপদ: হাজার তিনেক মজুর ধর্মঘট করেছে। গত দশদিন ধ'রে ওরা উপোস ক'রে আছে। সামনে ভয়ংকর বিপত্তি।'

'কই, এ-কথা তো কোনো কাগজে বেরোয়নি!'

'কাগজে যাতে এ-খবর ছাপা না হয়, সেজন্যে ওপর থেকে চাপ এসেছে।'

'বাঃ, চমৎকার! তা আমাকে তুমি কী করতে বলো?'

'এই উপলক্ষে একটা জনসভা হবে। আমি তার সভাপতি। সেখানে যাবার জন্যে খেয়া পেরুতে আমার এক আনা পয়সা চাই। আজ সারদিন আমি কিছু খাইনি। তোমারও আমার সঙ্গে আসা উচিত।'

'বৎস, এ সবই সাধু প্রস্তাব, তবে আমার কাছে কানা কড়িটিও নেই। বেশ কয়েক দিন হয়ে গেলো এক মুঠো খাবারও জোটেনি। আজ আমার জন্মদিন। এখনও অবদি আমি কিছু খাইনি। তবে, দেখা যাক, একটু বোসো।'

তারপর গঙ্গাধর বললে শ্রমিকদের কথা—সারা দেশের শ্রমিকদের কথা—সারা দেশের শ্রমিকরা কী রকম আছে, আর তার সঙ্গে সরকারের কী সম্বন্ধ। আমি তাকে বললুম কাগজের সম্পাদক ও লেখকদের কথা। এদিকে এর মধ্যে বাচ্চা ছেলেটি ফিরে এসেছে। আমি তার কাছ থেকে একটা আনি নিয়ে বললুম, অন্য আনিটা দিয়ে চা, বিড়ি আর দোসা নিয়ে আসতে। সে এমন একটা দোসা এনে হাজির করলে তাকে দেখে ছোট্ট পাতলা ফিনফিনে পাঁপড় না দোসা বোঝবার জো নেই, সেই সঙ্গে এনেছে দু-আউন্স চা, আর কয়েকটা বিড়ি। যে মার্কিন কাগজের পাতা দিয়ে দোসাটা জড়ানো তাতে একটা ছবি ছিলো—সেটা আমার নজর কাড়লে। গঙ্গাধর আর আমি দোসা খেলুম। খেলুম এক গেলাস ক'রে জল, তারপর চা। তারপর আমি মৌজ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্য আনিটা গঙ্গাধরকে দিয়েদিলুম। যাবার আগে গঙ্গাধর রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলে, 'আজ তো তোমার জন্মদিন তাই না? জগতের উদ্দেশে তোমার কোনো বাণী আছে?'

আমি বললুম, 'বৎস, আছে। বিপ্লবের সঙ্গে জড়ানো।'

'শুনি কি তোমার বাণী।'

'বিপ্লবের বহ্নি জ্বলুক সর্বত্র। সর্বত্র বর্তমান সামাজিক বৈষম্য ঝলসে পুড়ে যাক, আর ভস্মের মধ্য থেকে জন্ম নিক এক নতুন বিশ্ব।'

চমৎকার! শ্রমিকদের কাছে আমি এই বাণী পৌঁছে দেবো।'

গঙ্গাধর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে চ'লে গেলো। আমি বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক এবং বিভিন্ন লেখকের কথা ভাবতে লাগলুম। কেমন ক'রে বাঁচেন তাঁরা? শুয়ে শুয়ে এ কথা ভাবতে ভাবতে দোসা-জড়ানো কাগজের টুকরোটা আমি তুলে নিলুম। আর ঠিক এমন সময় দেখতে পেলুম বাড়িওলা চৌকাঠ পেরিয়ে আমার দিকেই আসছে। কি ওজুহাত দেবো সে-কথা ভাবতে ভাবতে আমি ছবিটার দিকে তাকালুম। মস্ত একটা শহরের ছবি, স্কাইস্ক্রেপারে ভর্তি; আর তার মাঝখানে একটা লোক মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার শেকল দিয়ে সে মাটির সঙ্গে বাঁধা; কিন্তু সে শেকল বা মাটির দিকে তাকাচ্ছে না; সে তাকিয়ে আছে মস্ত একটা আলোর উৎসের দিকে—আকাশ থেকে সেই বিরাট আলোক রশ্মি ছড়িয়ে গিয়েছে অসীমে, অনেকদূর অব্দি; তার পায়ের তলায় প'ড়ে আছে একটা খোলা বই; তার দু পাতায় তার—না, শুধু তারই নয়, সত্যি বলতে সব মানুষেরই ইতিহাস লেখা। বয়ানটা এই: 'যদিও মানুষ শেকল দিয়ে মাটির সঙ্গে বাঁধা, সে তবু তাকিয়ে আছে দেশকাল ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অগ্রগতির দিকে।'

'কি মশায়?' বাড়িওলার ঠাণ্ডা গলা: 'আজ ভাড়া দিতে পারবেন তো?'

আমি বললুম, 'এখনও আমি টাকা পাইনি। এই দুচারদিনের মধ্যেই ভাড়া দিয়ে দেবো।'

বাড়িওলা কিন্তু মোটেই আর কোনো ওজর-ওজুহাত শুনতে রাজি নয়। সে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা এভাবে বেঁচে থাকার কী মানে হয় বলুন তো?'

সে-কথা সত্যি। এভাবে বেঁচে থাকার. সত্যি তো, কী মানে হয়? প্রায় তিন বছর হ'লো আমি এ বাড়িতে এসে উঠেছি। তিন-তিনটে রান্নাঘর আমার জন্যেই মেরামত করা হয়েছে। তাদের সব কটা থেকেই এখন ভালো ভাড়া মিলছে। এখন যখন আমি চতুর্থ ভাঁড়ার ঘরটাও বাসযোগ্য ক'রে তুলেছি, ইনি এসে আমায় বলছেন, এ-ঘরের জন্যে অনেক ভাড়াটে পাওয়া যাবে, যারা বেশি ভাড়া দেবে। আমি নিজে বেশি ভাড়া দিতে রাজি হ'লেও চলবে না—আমাকে এ-ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

উঁহু না, এ-ঘরটা আমি ছেড়ে দিতে রাজি নই।

বিকেল চারটে: সারা দেশটাই অসহ্য ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে আমার কাছে। এ-শহরে আমার ভালো লাগার মতো কিসসু নেই। সেই একই রাস্তাঘাট, একই দোকান-পাট, একই মুখ দেখে চলেছি দিনের পর দিন, রোজ সেই একই কথা শুনছি। সব কিছুতে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে···একটা শব্দও লিখতে পারছি না আর।

সন্ধ্যে ছটা: সুন্দর একটি সন্ধ্যা। অস্ত সূর্য যেন রক্তের একটি ফোঁটা, আর সমুদ্র যেন তাকে গিলে ফেলতে চাচ্ছে ..পশ্চিম আকাশে ভেসে আছে হালকা সোনালি মেঘ। সমুদ্রের যেন কোনো কূল নেই আর। কাছেই ঝিলমিল করছে লেগুন। তারও তীর শান্ত হয়ে আছে। শৌখিন সব তরুণ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তীরে বেড়াচ্ছে; তরুণীরা ঝলমলে শাড়ি প'রে অপাঙ্গে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, মুখে সূক্ষ্ম চতুর হাসি, তারা ব'সে আছে সেখানে। সিনেমাগুলোর মন-মাতানো প্রেমের গান বাজছে রেডিওয়—শোনা যাচ্ছে তার কলি। ফুলের সুরভি নিয়ে মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে...কিন্তু আমি বোধ হয় অজ্ঞানই হয়ে যাবো।

সন্ধ্যে সাতটা: এক পুলিস আমার এখানে এসে আমায় তার সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো। চোখ ধাঁধানো একটা প্যাট্রোম্যাক্সের সামনে আমায় বসানো হ'লো। সব জেরার উত্তরে আমি যখন এজাহার দিচ্ছি, ডেপুটি কমিশনার ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়ালেন, সজাগভাবে সারাক্ষণ খেয়াল ক'রে গেলেন আমার হাবভাব, একবারও আমার মুখের থেকে নজর সরাননি তিনি। কী ঔদ্ধত্য! যেন আমি কোনো বিষম অপরাধ করেছি! এক ঘণ্টা ধ'রে আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'লো: আমার বন্ধুবান্ধব কারা? কাদের কাছ থেকে চিঠি পাই? সরকারকে উচ্ছেদ করতে চাচ্ছে এমন কোনো

গুপ্ত সমিতির সদস্য নাকি আমি? নতুন কী লিখছি? সব আমাকে সত্য বলতে হবে, গোটা সত্যটাই! গোটা সত্যি বৈ কিছু বলা চলবে না।

'জানেন তো আপনাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার ক্ষমতা আমার আছে?'

'জানি। কিন্তু আমি অসহায়। সামান্য কোনো পুলিসের মাথায়ও খেয়াল চাপতে পারে আমায় গ্রেপ্তার ক'রে হাজতে পুরতে।'

সাড়ে আটটা: আমি আমার ঘরে ফিরে এসেছি, অন্ধকারে ব'সে ব'সে দরদর ক'রে শুধু ঘামছি। আজ আমার ঘরে কোনো বাতি নেই। পাবো কোথায় কেরোসিন? আর খিদের হাউ-মাউ থামাবার জন্যে কিছু একটা আমার খাওয়া উচিত। কে দেবে আমায় খাবার? আর আমি কারু কাছ থেকে ধার চাইতে পারি না। ম্যাথুকে বলবো? না বরং পাশের দালানটায় যে চশমা পরা ছাত্রটি থাকে তার কাছে একটা টাকা ধার চাইবো। এই সেদিন তার অসুখের সময় ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে সে বিস্তর টাকা খরচ করেছিলো, কিন্তু শেষটায় আমার চার আনার টোটকাতেই তার অসুখ সেরে যায়। প্রতিদানে সে আমায় একদিন সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলো। তার কাছে গিয়ে একটা টাকা চাইলে সে কি আমায় না দিয়ে পারবে?

পোনে নটা: যাবার পথে আমি ম্যাথুর খোঁজ করলুম। সে নাকি সিনেমায় গেছে। বেজায় শোরগোল, তর্কাতর্কি আর দমকা হাসি শুনতে শুনতে আমি অন্য দালানটার দোতলায় উঠে এলুম। সিগারেটের গন্ধ। গ্যাসবাতির আলো।

ধপ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লুম আমি, সহায়হীনতার প্রতিমূর্তি। তারা তাদের রাজাউজির মেরেই চললো: জাতীয় সমস্যা, সিনেমা, কলেজের সহপাঠিনীদের রূপ, দিনে দু-বার শাড়ি ছাড়ে এমন মেয়ের নাম···ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমিও তাতে যোগ দিলুম, সব কিছুতেই আমি মত দিলুম। এরই ফাঁকে একচিলতে কাগজে আমি লিখলুম: 'একটা টাকা চাই! খুব জরুরী দরকার। দু-তিনদিন পরেই শোধ ক'রে দেবো।'

ঠিক তখন চশমা পরা ছেলেটি হো-হো করে হেসে উঠলো: 'কী, কোনো ছোট গল্পের প্লট লিখে রাখছেন নাকি?'

আমি বললুম, 'না।'

তারপরেই আলোচনার মোড় ঘুরে গেলো ছোট গল্প লেখার কায়দা-কৌশলের দিকে।

সূক্ষ্ম গোঁফ গজিয়েছে, সুশ্রী দেখতে একটি ছেলে নালিশ করলে, 'ধুর, আমাদের ভাষায় ভালো কোনো গল্পই লেখা হয়নি!'

আমি জিজ্ঞেস করলুম: 'কোন্ কোন্ লেখকের গল্প পড়েছো?'

অনেক সাহিত্যিকেরই লেখা সে পড়েনি। একটা কারণ, মলয়ালম সাহিত্য পড়াটা মোটেই কোনো ফ্যাশন নয়।

আমি কয়েকজন মলয়ালম ছোটগল্প লেখকের নাম করলুম। এরা এমন কি এঁদের বেশির ভাগের নামই শোনেনি!

আমি বললুম, 'আজকে মলয়ালম ভাষায় এমন অনেক ছোটগল্প আছে, যা শুধু ইংরেজির সঙ্গেই নয়—বিশ্বের যে কোনো ভাষার গল্পের সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে। তোমরা ও-সব পড়ো না কেন?

ও, না, দু-একটা এরা পড়েছে!

'বেশির ভাগ গল্পই কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে দারিদ্র্যের কথা বলে। এ-সব লিখে কী লাভ?'

আমি কিছু বললুম না।

সোনার দাঁড়ওলা চশমা পরা ছেলেটি বললে, 'আপনাদের সকলের গল্প প'ড়ে মনে হয় দুনিয়ায় যেন মস্ত একটা গোল বেধেছে কোথাও!'

দুনিয়ায় আবার কী গোল বাধলো, কোথায়? মা-বাবা হাড়ভাঙা খেটে ফি মাসে নিয়ম করে টাকা পাঠান। সে টাকায় এরা দয়া করে লেখাপড়া শেখে; তার ওপরে, আরো আছে সিগারেট, চা-কফি, আইসক্রীম, সিনেমা, কিউটিকুরা পাউডার, ভ্যাসোলিন, শৌখিন পোশাক, দামী খাবার, সিফিলিস, গনোরিয়া। এরাই ভবিষ্যতের নাগরিক! ভাবী শাসক ও বিধানকর্তা! দুনিয়ায় আবার গোল বাধতে যাবে কেন?

আমার একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার লোভ হলো।

'আজকের পৃথিবী…' আমি শুরু করলুম। ঠিক তখন নিচে থেকে কার রিন-রিনে আওয়াজ পাওয়া গেলো: 'খড়ম চাই আপনাদের? কাঠের খড়ম?'

হো-হো ক'রে হেসে চশমাধারী বললে, 'ওপরে নিয়ে আয়।' অতএব আলোচনার বিষয়টাও পালটে গেলো। ওপরে যারা উঠে এলো, তারা সেই দুটি বাচ্চা ছেলে, সকালবেলায় যাদের দেখেছিলুম। এখন এরা কেমন যেন থরথর করে কাঁপছে। মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ কেমন মিইয়ে এসেছে, ঠোঁট শুকনো। সামনের ছেলেটি অনেক চেষ্টা করে বললে, 'হুজুর যদি চান তো আড়াই আনাতেই দেবো।'

সকালে এদের দাম ছিলো তিন আনা জোড়া!

'আড়াই আনা?' সন্দেহের চোখে একজোড়া খড়ম পরীক্ষা করতে-করতে চশমাধারী বললে, 'এ তো কয়িনজোত্তা কাঠ নয়!'

'হ্যাঁ হুজুর, কয়িনজোত্তাই!'

'কী রে, তোদের বাড়ি কোথায়?' বড়ো ছেলেটি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে। ওরা শহর থেকে তিন মাইল দূরে থাকে।

সোনার চশমা বললে, 'দু আনা দেবো।'

'হুজুর, অন্তত সোয়া ছ্-আনা দিন।'

'না।'

'ও: !'

মনখারাপ ক'রে বাচ্চাগুলো সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে। চশমাধারী আবার হাঁক দিলে: 'আয়, নিয়ে আয়।'

ওরা আবার ফিরে এলো। সোনার চশমাধারী খুব ভালো একজোড়া খড়ম বেছে নিয়ে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলে। বাচ্চা ছেলেগুলোর সঙ্গে একটা ফুটো পয়সাও নেই। ওরা কিছুই বৌনি করতে পারেনি। সকাল থেকে ওরা সওদা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো তিন মাইল দূরে ওদের মা-বাবার ছবি, কোথাও একটা ভাঙাচোরা ঝুপড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছে কখন ফিরে আসে ছেলেরা, উনুনে হাঁড়ির মধ্যে জল ফুটছে।

সোনার চশমা কোত্থেকে হাৎড়ে ছু-আনা বার ক'রে ছেলেগুলির হাতে তুলে দিলে।

'আরো একপয়সা, হুজুর!'

'আমার কাছে রেজকি এই-ই আছে; নইলে এই রইলো তোদের খড়ম।'

ছেলে ছুটি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি ক'রে কথাটি না-ব'লে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলো। নিচে রাস্তায় বিজলি বাতির তলার ছেলে ছুটিকে চ'লে যেতে দেখে সোনার চশমা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'জানো, কী করেছি? ওর মধ্যে একটা অচল আনি ছিলো!'

'হা-হা-হা!' তারা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। আমি মনে-মনে ভাবলুম, শত হ'লেও এরা সব ছাত্র! কী বলা যায় এদের? এরা এখনও দারিদ্র্যের জ্বালা বুঝতে শেখেনি। সকলের অগোচরে আমি আমার চিরকুটটা সোনার চশমাধারীর হাতে তুলে দিলুম। সে যখন চিরকুটটা পড়ছে, আমার সমস্ত মন তখন প'ড়ে আছে হোটেলে, মনশ্চক্ষুতে আমি দেখলুম আমি বসে আছি একথালা ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাতের সামনে। কিন্তু সোনার চশমাধারী সকলকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'ছুঃখিত। আমার কাছে কোনো খুচরো নেই।'

ও কথা যেই শুনলুম, আমার সারা শরীর থেকে গরম ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। ঘাম মুছে আমি নিচে নেমে এলুম, সোজা ফিরে এলুম আমার ঘরে।

রাত ন'টা: বিছানা পেতে আমি শুয়ে পড়েছি, অথচ কিছুতেই ছু-চোখের পাতা বুজতে চাচ্ছে না। মাথার মধ্যেটায় দপদপ করছে। তবু আমি বিছানায় শুয়ে রইলুম। জগতের সব নিঃস্ব নিঃসহায়দের কথা ভাবতে লাগলুম আমি: কত লক্ষ-লক্ষ লোক কত বিভিন্ন জায়গাতেই এখন নিশ্চয়ই বুভুক্ষু ও ক্ষুধার্ত শুয়ে আছে! আমিও

তাদেরই একজন। আমার বেলায় কী এমন বিশেষ অসাধারণত্ব আছে...আমিও গরিব মানুষ — ব্যস, সমস্ত কথাটা তো এই। এইসব ভাবছি আর শুয়ে আছি···আর আমার জিভে জল আসছে। ম্যাথুর রান্নাঘরে সর্ষে বাটার শব্দ — ভাত ফোটানোর গন্ধ।

রাত সাড়ে ন'টা : ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম আমি, বুকের মধ্যেটায় এমনভাবে ধক-ধক করছে যেন হৃৎপিণ্ডটা এক্ষুনি ফেটে বেরুবে! কেউ যদি আমায় দেখে ফ্যালে! আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি — উঠোনে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম। একেই বলে কপাল! বুড়ো চাকরটা একটা কুঁজো আর বাতি নিয়ে বেরিয়ে গেলো। দরজাটা খোলা, তবে ভেজিয়ে রেখে গেছে — গেছে কলতলার দিকে। অন্তত দশ মিনিট সময় লাগবে তার। টু-শব্দটি না-ক'রে, সন্তর্পণে,ভেজানো দরজাটা খুলে আমি রান্নাঘরে চ'লে গেলুম।

রাত দশটা : আমি বেরিয়ে এসেছি, ঘর্মাক্ত, তবে উদর এখন পূর্ণ। বুড়ো ফিরে আসতেই কলতলায় চ'লে এলুম, জল খেলুম খানিক, হাত মুখ পা ধুয়ে নিলুম, ফিরে এলুম ঘরে, একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিলুম। কেমন যেন অবসন্ন লাগছে নিজেকে। আমি শুয়ে প'ড়লুম। তন্দ্রায় ঢুলে পড়বার আগে মনে-মনে ভাবলুম : বুড়ো কি ধরতে পারবে ব্যাপারটা? যদি পারে, তবে ম্যাথুও সব জেনে যাবে। অন্যসব ছাত্র ও কেরানিরাও জেনে যাবে। সে এক মহাকেলেঙ্কারি হবে — অপমানের একশেষ। কিন্তু যা হয় হোকগে। আমার জন্মদিনে আমি তো আরাম ক'রে শান্তিতে ঘুমোতে পারবো। কাজেই তন্দ্রার ঘোরে চোখ বুজলুম! তারপরেই কে যেন আমার ঘরের দিকে এগিয়ে এলো!

'হ্যালো, মিস্টার!'...ম্যাথুর গলা! আমি দরদর ক'রে ঘামতে লাগলুম। আমার সব ঘুম তখন উধাও হ'য়ে গেছে। খাবার যা খেয়েছি সব এতক্ষণে পুরোপুরি হজম। ব্যাপারটা তক্ষুনি আমার মাথায় ঢুকলো। ম্যাথু সব জেনে ফেলেছে! বুড়ো নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিলো। আমি দরজা খুললুম। গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে ঝলসে উঠলো টর্চের আলো। আমি আলোর ঝলকটায় আটকা প'ড়ে গেছি। কী জিগেশ করবে ম্যাথু?

আমার মনে হ'লো বুকটা বুঝি ফেটে বেরিয়ে আসবে।

ম্যাথু বললে : 'জানেন, আজ একটা দারুণ সিনেমা দেখে এসেছি। ভিক্তর উগোর "ল্য মিজারাব্‌ল"। আপনার গিয়ে দেখে আসা উচিত।'

'হুঁ-হুঁ।'

'খেয়েছেন কিছু? আমার মোটেই খিদে নেই। ফেরার পথে আমরা "মডার্ন হোটেলে" গিয়েছিলাম।'

'ধন্যবাদ, আমি খেয়ে নিয়েছি।'

'ওঃ, বেশ, তাহ'লে ঘুমিয়ে পড়ুন এবার। গুডনাইট!'

'ও হ্যাঁ, গুডনাইট···।'

# দেয়াল

কেউ কি শুনেছেন এই ছোট্ট প্রেমের গল্পটা? এর নাম 'দেয়াল'। অবশ্য আমি এটার নাম দিতে পারতুম 'নারীর গন্ধ'। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম 'দেয়াল'ই নাম দেবো গল্পটার। শুনুন মন দিয়ে। ঘটনাগুলো ঘটেছিলো বেশ-কিছুকাল আগে। যাকে আমরা সাধারণত বলি অতীত। অতীতের তীরগুলো পেরিয়ে। মনে রাখবেন, আমি আছি এই তীরটায়। নিঃসঙ্গ এক হৃদয়। এই হৃদয় থেকেই উৎসারিত হবে এক করুণ গান, আর আপনারা শুনবেন।

উঁচু-উঁচু সব পাথরের দেয়াল, মনে হয় যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। সেনট্রাল জেল (আর আমাকে) ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়ালগুলোর মধ্যে আছে অনেক দালান-কোঠা। এই দালান-কোঠার মধ্যে আছে অনেক মানুষ। খুব-একটা শোরগোল নেই। বেশির ভাগ কয়েদীই ঘরবন্দী। কারু-কারু ফাঁসির হুকুম হয়েছে—কাল ভোরবেলায় তাদের ফাঁসি দেয়া হবে। অন্যদের জেলের মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাদের মুক্তি দিয়ে দেয়া হবে কাল। সবসত্ত্বেও, তবু, একটা শান্ত ভাব হাওয়ায়।

আমি হাঁটছিলুম। চওড়া কোনো রাস্তা নয়। আমার বামে আর ডানদিকে দীর্ঘ-সব উঁচু-উঁচু দেয়াল। আমার সামনেই হাঁটছে ওয়ার্ডার। আমার গায়ে কয়েদীর উর্দি পরিয়ে একটা নম্বর বসিয়ে দেবার পর মাত্র কয়েক মিনিট সময় কেটে গিয়েছে। শাদা টুপির গায়ে কালো-কালো ডোরা, শাদা শার্ট, শাদা ধুতি। শোবার জন্য একটা মোটা কাপড়ের শুজনি, গা ঢাকা দেবার জন্য কালো-একটা কম্বল, খাবার জন্য থালাবাসন—প্রত্যেকের গায়ে একটা ক'রে নম্বর বসানো। আমি তো আর নবীন নই। আগেও আমাকে একবার নম্বরে পরিণত করা হয়েছিলো। সংখ্যার ওপর একটা বই পড়েছিলুম একবার, সেটা আমার মনে প'ড়ে গেলো। আমার নম্বরটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার, তারপর সংখ্যাগুলো যোগ ক'রে দিলুম। নয়। নয় সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র কী বলে? কী হবে আমার, এই জেলখানায়?

ওয়ার্ডার ঘ্যানঘ্যান করলে: 'আরেকটু জোরে হাঁটতে পারো না?' আমার ইচ্ছে

রকলো হেসে উঠি। হাসবার কোনো সুযোগ পেলে আমি ছাড়ি না। হাসি তো ভগবানেরই বিশেষ উপহার।

আমি জিগেশ করলাম: 'এত-যে তাড়া. বলি যাচ্ছো কোথায়? এই বিশাল বিশ্বটাকে পেরিয়ে যাবে বুঝি?'

সে কোনো উত্তর দিলে না। সে শুধু হাঁটতেই থাকলো। আমি বললাম. 'আমাকে ঐ গর্তটায় ঢুকিয়ে তালা বন্ধ ক'রে দেবার পর তোমায় বুঝি মস্ত একটা ব্যাবসার শামাল দিতে হবে?'

বিষয়টা একটু সিরিয়াসই। পঞ্চাশ মাইল দূরের একটা মফস্বল শহরে পুলিশের হাজতে ছিলুম আমি। বারো মাস হবে, কিংবা চোদ্দ। ওরা আমার মামলাটা তুললেই না। শুধু হাজতে পুরে রেখে দিলে। পুলিশের দারোগার পরামর্শে আমি তারপর বেজায় চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলুম। অনশন শুরু ক'রে দিয়েছিলুম। অর্থাৎ সত্যাগ্রহ —হাঙ্গার স্ট্রাইক! মামলাটা এবার আদালতে উঠলো। সরকারিভাবে এবার সাজা দেয়ালুম নিজেকে। হাজতে তো আমি বলতে-গেলে একজন ঘরের লোকই ছিলুম। আমার ডান হাতের তর্জনী থেকে কব্জি অব্দি পিটুনির চোটে মণ্ড হ'য়ে যেতো! কে-সব রিজার্ভ পুলিশ কনস্টেবল এই কথাই জানিয়েছিলো আমার মা-বাবাকে। বাস্তবিক অবশ্য কোনো পুলিশের লোকই এ-কথা বলেনি. বলেছিলেন এক ম্যাজিস্ট্রেট. দণ্ডমুণ্ডের যিনি কর্তা। কী দেমাক এই পুলিশের লোকগুলোর! সেটা ঘটেছিলো আমাকে গ্রেফতার করতে এসে পুলিশ যখন আমার বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো। আমি তখন সেখানে ছিলুম না। কিন্তু শেষটায় তারা পাকড়ালে আমাকে। কেউ আমাকে মেরে পাট ক'রে দেয়নি। পুলিশদের মধ্যে বেশ-কিছু লোকই আমার ভক্ত হ'য়ে যায়। আমার সেখানে প্রায় হেড-কনস্টেবলের মতোই খাতির আর প্রতিপত্তি ছিলো। হাজতে থাকার সময় আমি গোটা-কয় রহস্য গল্পই লিখে ফেলি—পুলিশ যার নায়ক। দারোগা-সাহেব আমাকে পেনসিল আর কাগজ জোগাতেন। তাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই আসছি এখন। সঙ্গে ছিলো দুজন কনস্টেবল। বন্দুকধারী। তাদের পকেটে ছিলো হাতকড়া। এই দুজনই আমাকে সেনট্রাল জেলের হাতে সঁ'পে দিয়ে যায়। যে-সিরিয়াস ব্যাপারটার কথা পেড়েছি. সে কিন্তু এ-সব সাত কাহন নয়। ঐ কনস্টেবল দুজন দু-প্যাকেট বিড়ি, একটা দেশলাই আর একটা নতুন ব্লেড কিনে এনে দেয় আমাকে। ওয়ার্ডার আমার পকেট হাৎড়ে সব বার ক'রে নেয় আর বেশ মোলায়েম ভাবেই জানায়: 'জেলখানার মধ্যে এ-সব জিনিশের কোনো অনুমতি নেই।' সে তার মাথার ঐ মহান দেখতে-টুপিটা খুলে নিয়ে জিনিশগুলো সব ভেতরে রাখলে, টুপিটা ফের চড়িয়ে দিলে মাথায়, তারপর আমায় নিয়ে জুড়ে দিলে এই কুচকাওয়াজ ভঙ্গিটা

এমন যেন সিরিয়াস কিছুই ঘটেনি। তা, হাঁটুক না সে, হতচ্ছাড়া বেইমান!

রেজর ব্লেডটা কেন ছিলো, জানেন? উঁহু আপনারা যা ভাবছেন, সেজন্য নয়। সেটা জরুরি ছিলো দেশলাইয়ের কাঠিকে দু-ফালি করবার জন্যে। আমি এমন-সব মহা-মহাশিল্পী দেখেছি যাঁরা একটা কাঠিকে ছ-ফালি করতে পারতেন। ব্লেড অবশ্য আরো-অনেক কাজে লাগে। জেলখানায় একটা দেশলাইয়ের বাক্স জোটানো মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। তার জন্যে পয়সা লাগে। জেলখানায় কারু পয়সা থাকে না। কিন্তু ব্লেড কাজে লাগে 'চাক্কি' বানাতে। 'চাক্কি' কাকে বলে জানেন তো? না, আপনারা আর কী ক'রে জানবেন? রসুন, বলছি।

জেলের কর্তারা আপনাকে শোবার জন্য দেন মোটা একটা শুজনি। তার সুতো-গুলো জমান, দু-আঙুল সমান পুরু। লম্বায় সেগুলো হাতের চেটোমাফিক হওয়া চাই। এবার গেরো বাঁধুন একটা - দু-ইঞ্চি মতো ফাঁক গেরোটায়। বেরিয়ে থাকা সুতো এবার জ্বালিয়ে দিন। প্রতিভাবান শিল্পীরা এই পোড়া অংশগুলো ছোট্ট একটা চামড়ায় দু-তিন পাল্লায় ভাঁজ ক'রে ফেলতে পারে। আমাদের মতো যারা হতভগা-সব অপেশাদার, তারা সেটাকে পুরু কাঁঠাল পাতাতেও বেঁধে রাখতে পারে। এবার আমাদের চাই ছোট্ট-একটুকরো লোহা। সে আবার কোথায় পাওয়া যাবে? হুঁ-হুঁ শুধু কি লোহার টুকরো, অন্য যাবতীয় বস্তুই জেলখানায় পাওয়া যায়। অবশ্য হাতে যদি কারু পয়সা থাকে। যদি লোহার পাত থাকে অথবা ব্লেড, সিমেণ্ট বা গ্রানাইটে ঘ'ষে-ঘ'ষে ফুলকি ওঠানো যায়। যদি সে-ফুলকি আমাদের উদ্ভাবনটার পোড়া প্রান্তটাকে ছোঁয় তাহ'লে তো আগুনের কোনো অভাবই নেই। ব্লেডটাকে আবার একটা কাঠের টুকরোয় গেঁথে-রাখা চাই, যাতে একদিকের ফলাই শুধু বেরিয়ে থাকে: একেই বলে 'চাক্কি'। আর এই সবই এখন কি না প'ড়ে আছে ওয়ার্ডারের টুপির তলায়!

আমি বললুম: 'পুলিশরা কখনো খারাপ লোক নয়।'

ওয়ার্ডার কি তবে শুনতে পায়নি? সে হেঁটেই চলেছে, চুপচাপ। ও-জিনিশ-গুলো সব সে বিক্রি ক'রে দেবে। নচ্ছারটা এর মধ্যেই এত টাকা কামিয়েছে যে ছেলেপুলেই শুধু নয়, তাদেরও ছেলেপুলেকে খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে।

আমি জিগেশ করলুম: 'তোমার ছেলেপুলে কজন ওয়ার্ডারসাহেব?'

সে তার দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো যেন, বললে: 'ছয়: পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলে।'

আমি জিগেশ করলুম: 'ছেলেমেয়েরা আর তাদের মা—তাদের সকলেরই কুশল তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' ওয়ার্ডার বললে, 'তাড়াতাড়ি চলো।'

এত তাড়ার পেছনকার রহস্য খুবই স্বচ্ছ!

আমি জিগেশ করলুম: 'কী হবে বেচারিদের, যদি তুমি মারা যাও?'

ওয়ার্ডার বললে: 'ভগবান তাদের দেখবেন!'

আমি বললাম: 'তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।'

ওয়ার্ডার শুধোলে: 'ও কথা বললে কেন?'

আমি বললুম: 'দৈব অভিপ্রায় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ব'লেই।···আচ্ছা, বলছি কেমন ক'রে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হ'লো। আদ্ধেক সন্ন্যাসীই ছিলুম আমি। সারা ভারতবর্ষে এমন-কোনো মন্দির নেই যেখানে আমি যাইনি। এমন কোনো পবিত্র নদী নেই যার জলে আমি ডুব দিইনি। পাহাড়ের চুড়োয় উপত্যকায়-সমভূমিতে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, সমুদ্রের তীরে—'

'তো?'

'ভগবান তোমাকে এমনি-এমনি ছেড়ে দেবেন ব'লে ভেবো না!'

'আমি তো কোনো দোষ করিনি।'

আমি জিগেশ করলুম: 'তাহ'লে প্রকাশ্য দিবালোকে আজকের এই ডাকাতির ব্যাপারটা কী?'

ওয়ার্ডার তাজ্জব হ'য়ে গেলো। শুধোলে: 'দিনে ডাকাতি? সে আবার কী?'

আমি বললুম: 'ওয়ার্ডার তো মারা গেলো। তার আত্মা গেলো ঈশ্বরের জমকালো সন্নিধানে। ঈশ্বর জিগেশ করলেন—আরে ছোটোমন ওয়ার্ডার!...বেচারা বন্দীরের ঐ ব্লেড, দেশলাইয়ের বাক্স আর দু-প্যাকেট বিড়ি তুই কী করেছিলিস?'

আচমকা ওয়ার্ডার থমকে গেলো। আমি এগিয়ে গেলুম, হেঁকে বললুম: 'আরে, এসো-এসো! আমাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে কেটে পড়তে চাও না?'

ওয়ার্ডার থমকেই দাঁড়িয়ে রইলো। টু শব্দও করলে না সে। হাসিতে তার সারা শরীর ফুলে-ফুলে উঠছে। মাথা থেকে টুপিটা সে খুলে ফেললে। আমার সব সম্পত্তি সে আমাকে ফিরিয়ে দিলে।

'ভালো ওয়ার্ডার, সদাশয় ওয়ার্ডার,' আমি বললুম। 'আজ সকালে দারোগা-সাহেব বলছিলেন গান্ধিজি নাকি মৃত্যুশয্যায়। তুমি এ-সম্বন্ধে কিছু শুনেছো, ওয়ার্ডারসাহেব?'

'উনি অনশন ভঙ্গ ক'রে লেবুর রস খেয়েছেন।'

অতি উত্তম। মোহনদাস গান্ধি দীর্ঘজীবী হোন!

একের পর এক লোহার দরজা পেরিয়ে আমরা হেঁটে চললুম।

আমি জিগেশ করলুম: 'এখন এখানে কতজন রাজনৈতিক বন্দী আছে?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছো', সেখানে সবশুদ্ধ সতেরোজন আছে।'

হুঁ-হুঁ, তাই। তুমি তাহ'লে আমাকে একটা স্পেশ্যাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছো? সরকারবাহাদুর তাহ'লে এই দীনাতিদীনকে বেশ সমীহই করছেন। ভালো।

আর হাঁটতে-হাঁটতেই, হঠাৎ জগতের সবচেয়ে নেশাধরানো গন্ধ এসে পৌঁছুলো নাকে।

মেয়ের গন্ধ!

আমি বেজায় নাড়া খেয়ে গেলুম। আমার শরীরের সব ক-টা অণুপরমাণু সজীব আর সজাগ হ'য়ে উঠলো। আমার নাকের বাঁশি বিস্ফারিত হ'লো। সারা জগৎটাকে আমি শ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভেতরে টেনে নিলুম।

কোথায় এই রমণী?

চারপাশে ফিরে তাকালুম। কেউ নেই। কোথাও কিছু না।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা শুনতে পেলুম জগতের সবচেয়ে সুন্দর ধ্বনি।

মেয়েগলার খিলখিল হাসি!

শব্দ আর গন্ধ কি একসঙ্গে মিলে এসে পৌঁছুলো তবে? না কি একটা থেকেই আরেকটাকে আমি কল্পনা ক'রে নিয়েছি?

সৃষ্টির এই চমৎকার জীব—স্ত্রীরত্ন—তার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

যে হাসি শুনেছি, সেটা খুবই সত্যি, বাস্তব। যে-গন্ধ আমার ভেতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেও সত্যি।

সাবানের গন্ধের কথা বলছি না আমি। কিংবা এও বলছি না মেয়েরা যে-সব ভেষজ বা ফুলেল তেল মাখে। পাউডার আর ঘামের গন্ধে মাখামাখি কোনো ঝিম ধরা গন্ধও নয়। সত্যি-সত্যি, নেহাৎই স্ত্রীগন্ধ!

কোত্থেকে এলো এই গন্ধ?··· আর ঐ খিলখিল হাসি?

আবারও সেই গন্ধের কথা ভাবলুম আমি···কেমন আচ্ছন্ন লাগছে নিজেকে, ঝিম ধ'রে যাচ্ছে সব। আবার আমার নাকের পাটা ফুলে উঠলো। যেন উৎকণ্ঠায় আমার হৃৎপিণ্ডটাই ফেটে যাবে।

আমি জিগেশ করলুম: 'ঐ হাসি এলো কোত্থেকে?'

ওয়ার্ডার ঠাট্টা করলে: 'তুমি বিয়ে করোনি?'

আমি বললুম: 'না...কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রশ্নের সম্বন্ধ কী?'

কেন যে এ-সব কথা শোনো তুমি!

সেনট্রাল জেলে···ফাঁসির কাঠের ধারে-কাছে···কেউ হঠাৎ শুনতে পেলে মেয়েগলার খিলখিল হাসি। না, আমাকে শিগ্‌গিরই বিয়ে ক'রে ফেলতে হবে! শুধু তখনই

আমি জিগেশ করতে পারবো কোথেকে এলো ঐ হাসি ! কী চমৎকার যুক্তি !

ওয়ার্ডার হেসে ফেললে। বললে : 'হাসিটা এলো জেনানা ফাটক থেকে। তুমি তার পাশের জেলেই থাকবে। ক-দিনের মেয়াদ তোমার ?'

'দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস ও হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানা না-দিলে আরো ছ-মাস সশ্রম।'

'তোমার আর জেনানা ফাটকের মধ্যে কেবল একটা দেয়াল থাকবে।'

দেয়াল···জেনানা ফাটক।

আমরা হেঁটে চললুম। গুজনি আর কম্বলটা বুকের কাছে ধ'রে আছি আমি।

ওয়ার্ডার একটা লোহার খিল-লাগানো দরজা খুলে দিলে— আমরা ঢুকে পড়লুম বিশেষভাবে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক চত্বরে। অনেক গাছ, বেশির ভাগই কাঁঠাল। কয়েকটা ছোটো-ছোটো কুঁড়ে। পুবদিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে, দূরে দু-পাশে চোখে পড়বে দুটি উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে ডান দিকে আছে বিশাল মুক্ত জগৎ। বাঁ দিকে দেয়ালের ওপাশে আছে···জেনানা ফাটক।

কুঁড়ে বাড়িগুলো-সব নিচু দেয়ালে ঘেরা একেকটা তালাবদ্ধ কুঠুরি।

সেখানকার ওয়ার্ডার আমাকে তার জিম্মায় নিলে। যে-ওয়ার্ডার আমাকে নিয়ে এসেছিলো তাকে আমি বিদায় জানালুম। সেও বিদায় জানিয়ে ফিরে গেলো।

নতুন ওয়ার্ডার আমাকে একটা কুঁড়েয় নিয়ে গেলো। তার লোহার দরজাটা সে খুলে দিলে। একরত্তি একটা কুঠুরি। কুঠুরির বাইরে, একটু দূরে, পায়খানা। দরজার কাছে একটা জলের কল। কল খুলে আমি মুখ-হাত-পা ধুয়ে ঢকঢক ক'রে খানিকটা জল খেলুম। তারপর একটা কুঁজোয় জল ভ'রে, ভগবানের নাম নিয়ে ভেতরে ঢুকলুম, ডান পা আগে।

ওয়ার্ডার লোহার দরজা আটকে মস্ত একটা তালা লাগিয়ে দিলে।

আমি বললুম : 'এই অতিথি কিন্তু এখনো কিছু খায়নি।'

ওয়ার্ডার বললে : 'আজকের হিশেবের আওতায় তুমি পড়োনি। কাল থেকে তুমি খাবার পাবে।'

আমি বললুম : 'তাহ'লে আমাকে বাইরে যেতে দাও। আমি না-হয় কালকের হিশেবের আওতাতেই আসবো।'

ওয়ার্ডার জিগেশ করলে : 'তোমার অপরাধটা ছিলো কী ?'

'লেখা...রাজদ্রোহ।'

মনে হ'লো বোকা বনে গিয়েই ওয়ার্ডার বললে : 'রাজদ্রোহ !...ঈশ্বর আমাদের রক্ষে করুন !'

লোহার দরজার ওপরেই জোয়ালো একটা বিজলি বাতি জ্ব'লে উঠলো। ওয়ার্ডার প্রস্থান করলে।

মোটা শুজনিটা আমি পেতে দিলুম। বাসনকোশনগুলো রাখলুম এক কোণায়। আমি এবং হাজতের ভেতরটা—উভয়েই আলোয় ঝলমল করছি। আমি আজকের হিশেবের আওতায় পড়ি না। অতএব আজ রাত্তিরে আমাকে উপোশ করতে হবে। কী ক'রে একটু খাবার জোগাড় করা যায়, তার শুলুকসন্ধান আমার জানা আছে। লোহার দরজাটা নাড়িয়ে, ওয়ার্ডারের নাম ধ'রে চেঁচিয়ে, হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়া উচিত আমার। তাহ'লে ওয়ার্ডার, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং অন্তদের টনক নড়বে। আর তখুনি খাবার জুটবে। আমি অবশ্য তার বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত নিলুম। সাহিত্যের জন্যে আমার কিঞ্চিৎ আত্মত্যাগ করাও উচিত বৈকি। দেশের জন্যে বেধড়ক মার খেয়েছি আমি—বিস্তর। অনুগ্রহ ক'রে বন্দুকের বাঁট দিয়ে বুকের পাঁজরে ঘা দেয়া হয়েছে আমার, আর আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছি, আস্তে। আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে রাস্তা দিয়ে। এবং আমি বেশ কয়েক দফাই মেয়াদ খেটেছি জেলে।

এবারকার এই জেলের মেয়াদ তো সাহিত্যেরই মহিমায়। এই চিন্তা আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার করলে। আমি ঢকঢক ক'রে একটু জল খেয়ে নিলুম।

ব্লেড দিয়ে দেশলাইকাঠি দু-ফালি করতে আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। বাদশার মতো একটা আস্ত কাঠি জালিয়ে নিয়ে বিড়ি ধরালুম আমি। পাচ ছটা টান মেরে বিড়িটা আমি ঘ'ষে নেবালুম। উঁহু, অমিতব্যয় কোনো কাজের কথা নয়।

ব'সে প'ড়ে কানখাড়া ক'রে শোনবার চেষ্টা করলুম আমি। মেয়েগলার হাসি কানে এলো না আর। মেয়ের গায়ের গন্ধও নাকে এলো না। কেন? আমি তো জেনানা ফাটকের পাশেই ব'সে আছি।

ঐ গন্ধ—সে কি তবে ছিলো আমার কল্পনাতেই শুধু? একদা···কত যুগ-যুগান্তর আগে···যখন আমি ছিলুম আদম, আর ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলুম নন্দন কাননে, নাকে এসেছিলো হবার গায়ের গন্ধ!···হয়তো আমার আত্মার স্মরণকোষে আমি কোথাও জমিয়ে রেখেছিলুম সেই অভিজ্ঞতা।···যেমন ত্যাখে মরীচিকা, যত ক্লান্ত অবসন্ন তৃষ্ণাতুর পথিক...মরীচিকার মতোই তা মিলিয়ে গেলো—নাকের পাটা বিস্ফারিত···হৃৎপিণ্ড চুরমার।

কোথায় সেই মধুর স্বর? কোথায়, কোথায় সেই ঝিমধরানো সুগন্ধ?

বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম আমি। আলোর মধ্যে দিয়ে কিছুই চোখে পড়লো না। অন্ধকার ঢেকে রেখেছে জগৎ। কিন্তু সে-অন্ধকার কিছুতেই স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ে না।

একটা জিনিশ শুধু বুঝতে পেরেছি আমি। এ-যাবৎ আমি কখনোই অন্ধকারকে দেখিনি! সেই যে রাত নেমে আসে, হরণ করে হৃদয় আর লুকিয়ে রাখে সবকিছু! সেই সব তারা, লক্ষ-কোটি, মিটমিট জলা! জোৎস্নায় চকচক ক'রে ওঠা রাত!

তুমি···আর তুমি···আর তুমি আজও যে তোমাদের কাউকে আমি চোখে দেখিনি।

উঁহু, এটা মিথ্যে কথা। আমি তাদের দেখেছি। আমি তাদের সবাইকেই দেখেছি। কিন্তু তখন খেয়াল ক'রে দেখিনি। রাত, তারার আলো কেই বা সিরিয়াসভাবে নেয় তাদের সৌন্দর্য?

ভাবতে গিয়ে, সুন্দর একটা রাতের কথা মনে পড়লো আমার। ছোট্ট একটা গ্রাম। তার ওপরে হাজার-হাজার মাইল প'ড়ে আছে মরুভূমি। সময় ছিলো এই রকমই, সূর্য ডুবে যাবার পরক্ষণ। আমি মরুভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। বোধহয় মাইল খানেক হেঁটেছিলুম আমি···যেন শাদা রেশম ছড়িয়ে আছে চারপাশে। আমি ঠিক পৃথিবীর মাঝখানটায়, কেন্দ্রে। আমার ঠিক ওপরেই পূর্ণিমাচাঁদ, এত নিচু যে হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে।

নীল এক আকাশ, যেন ধোবার পর অমলিন।

পূর্ণিমাচাঁদ আর তারারা।

তারারা···দপদপ ক'রে জ্বলছে, উজ্জ্বল, দীপ্তিময়। লক্ষ তারা···লক্ষ কোটি তারা ·· অগুনতি তারা।

স্তব্ধ এক বিশ্ব···কিন্তু··তবু...কিছু একটা যেন আছে···কিছু একটা-কোনো ঐশ্বরিক নীরব সংগীত—সংরাগের এক অফুরান সুর, আর সবকিছু যেন তারই মধ্যে ডুবে আছে। বিস্ময়ে আমি থমকে গিয়েছিলুম, বিস্ময়ে আর উল্লাসে। আমার সেই বিস্ময় আর সেই উল্লাস চোখের জলে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছিলো। আমি কেঁদে উঠেছিলুম। অসহায়ভাবে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটেছিলুম আমি।

'জগতের মধ্যেকার আরো-যতসব জগতের যে-তুমি স্রষ্টা! আমাকে বাঁচাও! আমি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারছি না একে। তোমার এই বিপুল মহিমা·· এই নিখিল আশ্চর্য...তাকে আমি ধ'রে রাখবো কী ক'রে, যে-আমি নেহাৎই এক ছোট্ট সজীব প্রাণী। আমি দুর্বল, শক্তিহীন, আমাকে বাঁচাও।'

আমার পরিবেশ সম্বন্ধে আমি সচকিত হ'য়ে উঠলুম শুধু তখুনি, যখন ওয়ার্ডার এসে হাজির পরদিন সকালে তালাটা খুলে সে যখন দরজাটায় নাড়া দিলে কয়েকবার।

'প্রণাম বিশ্বচরাচর!' আমি উঠে পড়লুম, পোড়া বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে দারুণ কেতায় প্রাতঃকালীন ক্রিয়াকর্ম সারতে বেরিয়ে গেলুম।

আমি দাঁত মাজলুম নিমের দাঁতন দিয়ে। কলের তলায় দাঁড়িয়ে সারলুম স্নান, গায়ে চড়ালুম জেলের উর্দি. যে বাসনগুলোয় ক'রে ওরা খাবার দিয়েছিলো সেগুলো মাজলুম, নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লুম। এদের সবাই নেতা। যতক্ষণে সকলের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গেলো, ততক্ষণে এসে হাজির মস্ত এক ফ্যানভাত অর্থাৎ কাঞ্জির হাঁড়ি। প্রচুর চাটনি সহযোগে সেই গলানো কাঞ্জি পান করা হ'লো। আসলে আমি যা খেয়েছিলুম তা হ'লো কাঞ্জো। এই কাঞ্জো প্রস্তুতপ্রণালীটা ব্যাখ্য' করা যাক। প্রথমে কাঞ্জির জলটুকু ঢকঢক ক'রে গিলে নিতে হয়। তারপর যত প্রাণ চায় চাটনি দিয়ে সাঁটতে হয় বাকি ভাতটুকু। তারপরে কিন্তু আপনাকে হাতমুখ ও বাসনকোশন খুব ভালো ক'রে ধুতে হবে। তারপরে কয়েকঢেঁাক জল। অহো, জীবন ধন্য! এই পরম পরিতৃপ্তি উপার্জন ক'রে নেবার পর, একটা দেশলাইয়ের কাঠি দু-ফালি ক'রে নিয়ে আমি একটা বিড়ি ধরালুম। কয়েক টান দিয়ে বিড়িটা নিভিয়ে দিয়ে. আমি বেরোলুম জগৎদর্শনে, তার মানে, পুরো জেলখানাটা ঘুরে দেখতে। আমার চাই কিছু চা-পাতা ও চিনি। জেলের মধ্যেও আমার কিন্তু চা চাই। কালো চাও সই – তাতেও চলবে। নেতাদের কারু কাছেই না-আছে চা-পাতা. না-বা-চিনি। একজন মহান নেতা এক বোতল ইনোস ফ্রুট সল্ট লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেটা নইলে তাঁর প্রাতঃকৃত্যই সম্ভব হয় না। আরেকজন নামজাদা নেতার গোপন রহস্য হ'লো তাঁর কাছে কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল'-এর একটা খণ্ড ছিলো। আরেকজন নেতার কাছে ছিলো দু-প্যাকেট তাশ। আমাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি আমাকে ব্রিজ নামক চমকপ্রদ খেলাটি শিখিয়ে দেবেন।

আমি নেতৃসংসর্গ থেকে নিজেকে মুক্তি দিলুম।

একমাস পরে আমি প্রায় নবাবজাদার কেতায় 'ডিলুক্স' জীবন যাপন করতে শুরু ক'রে দিলুম।

আমার খাঁচাটার সামনেই আছে দুটো ইট। কাছেই প'ড়ে আছে শুকনো কাঁঠাল গাছের ডালপালার একটা বাণ্ডিল। তার পাশেই আছে একটা বাটি। এ সবই চা বানাবার শরঞ্জাম। চা পাতা আর চিনি আছে দুটো মোড়কে, বিছানার তলায় ছোট্ট-ছোট্ট বালিশের মতো। তারপরে আছে 'চাক্কির' একটি 'শোভন' সংস্করণ। যত বিড়ি। লেখার কাগজ। পেনসিল। একটা লম্বা ছুরি। অতীব মহানুভবতার সঙ্গেই এই ছুরিটা দিয়েছিলেন জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ... তিনি শুনেছিলেন যে আমি নাকি মালির কাজে ওস্তাদ, কলম বানাতে চারা রুইতে পারি। তিনি আমাকে বলেছিলেন কাজ শেষ হ'য়ে যাবার পরেই যেন তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ডারের হাতে সেটা সমর্পণ করি। আমি তা ভুলে গিয়েছিলুম। আমার হাজতের সামনেই চৌকো একটা বর্গক্ষেত্র সাফ-

ক'রে নিয়েছি আমি। চারধারে আছে গোলাপঝাড়, ফুল ফুটে আছে, চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাদের মিষ্টি গন্ধ। আর খাবার সময় আমি পাই মাছভাজা, ডিম, মেটে, আর একটা বিশেষ চাটনি। এই সচ্ছলতার শুরু হয় সেই মহাশয়ের আগমনে, যিনি সকালে আমার কাঞ্জি' নিয়ে আসেন। তিনি হচ্ছেন খোদ একজন 'লালটুপি'। তার মানে হ'লো তিনি কোনো মানবকে হত্যা করেছেন। তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়নি। সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। বেশ ফরশা নাদুশ-নুদুশ মানুষটি, গোলগাল মুখ, চোখে হাসি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি একটু ব্যায়াম ক'রে নিই। আমার গোলাপবাগের সামনে একটা ঢ্যাঙা ছিমছাম কাঁঠাল গাছ। তার সবচেয়ে নিচের ডালটা হবে আকারে আমার উরুর মতো। সেটাকেই বার হিশেবে ব্যবহার ক'রে আমি কতগুলো কসরৎ ক'রে নিই। যতক্ষণে ব্যায়াম-ট্যায়াম সেরে স্নান ক'রে নিই, তখন তিনি (হাসি চোখের সেই লালটুপি) উদিত হবেন দুটি ঢাকা বাটিতে ক'রে আমার 'কাঞ্জো' আর চাটনি নিয়ে। 'কাঞ্জি' ব'লে কোনো পদার্থই নেই। এ হ'লো ভাত। কিন্তু সত্যি কি ভাত? ভাতের সঙ্গে একটু 'কাঞ্জির জল'। যখন তিনি প্রথমবার আমার জন্যে 'কাঞ্জি' ঢেলে দিয়েছিলেন, তিনি ফিশফিশ ক'রে আমার কানে-কানে বলেছিলেন: 'হাসপাতালের চাপরাশির সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। সে আপনাকে চা দেবে।'

সেখানেই গেলুম। দেখতেও পেলুম তাকে। কালো, একহারা চেহারা, বাহারে একখানা গোঁফ আছে, সুন্দর ঝকঝকে শাদা দাঁত, মুখে ভারি সুন্দর হাসি। আমারই এক পুরোনো ইয়ার। তার গাঁয়েও থেকেছি আমি। একটা ডাকাতির মামলায় সে ফেঁসে গিয়েছিলো, ডাকাতি আর খুনজখম। তাছাড়া, দুজন খুনও হয়েছিলো। সেও একজন 'লালটুপি'। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। সদ্ব্যবহারের দরুন—তার ওপর শিক্ষিত-সে হাসপাতালের চাপরাশি হয়েছে। চা, চিনি, মেটে, রুটি, দুধ, বিড়ি ইত্যাদি-ইত্যাদি পেতে এরপর আমার আর কোনো মুশকিলই হ'লো না। ভাবতে-গেলে আমার গোলাপবাগটাই তো সরাসরি অন্য জায়গা থেকে এনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে; শেকড়, মাটি, সার সবসমেত হাসপাতালের পেছনের জমি থেকে এনে তৈরি অবস্থায় বসানো। নেতারা যখন আমার বাগান দেখলেন, তখন তাঁরাও বায়না ধরলেন, তাঁদেরও অমন বাগান চাই। আমি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য খুদে-খুদে বাগান তৈরি ক'রে দিয়েছিলুম। নেতারা সবাই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওয়ার্ডারদের মারফৎ। চিঠি যায়, চিঠি আসে। এই সবেরই জন্যে চাই পয়সা। রাতের বেলায় দেয়ালের ওপর দিয়ে পাচার হ'য়ে আসে ছোটো-বড়ো ঠোঙা, ধপ ক'রে মাটিতে পড়ে ভেতরে। কলাভাজা, কলার মেঠাই, লেবুর আচার ইত্যাদি।

মাঝে-মাঝে ও-সব ঠোঙা কুড়োবার সময় আমিও দলে ভিড়ে যাই। একবার এক নেতা আমায় খানিকটা লেবুর আচার উপহার দিয়েছিলেন। আহা, কী স্বাদ, কী তার—কী দুর্লভ ভোগ! আর আমার হাতে সেটা তুলে দেবার সময় তাঁর মুখের সেই ভাব! আমার মনে হয়েছিলো, আমি যদি এ-বিষয়ে কোনো মহাকাব্যও রচনা ক'রে বসি, তবু এই ঋণ কখনো শোধ হবে না।

আমি তাই এইভাবে আমার সহবন্দী আর আমার গুণমুগ্ধ সেই লালটুপিদের সঙ্গে দিব্যি শান্তি আর সম্প্রীতির সঙ্গেই দিন কাটাচ্ছিলুম। কোনো অভাবই নেই আমার, কিছুর না। মাঝে-মাঝে চোখ তুলে তাকাই জেনানা ফাটকের দিকে। সেই বিশাল শয়তানের-হাতে-গড়া দেয়াল! আমার মনে প'ড়ে যায় যে-খিলখিল হাসির স্বর আমি শুনেছিলুম, যে-গন্ধ টেনে নিয়েছিলুম বুক ভ'রে। বাগানের কাছের কাঁঠাল গাছটায় আমি উঠে পড়ি। সে শুধু তখনই যখন নেতারা সাঙ্গ করেছেন মধ্যাহ্নভোজ এবং দিবানিদ্রা লাগাচ্ছেন। আমি সোজা গাছের মগডালটায় উঠে দাঁড়াই। দেয়ালের ওপাশে খোলামেলা জগৎ, স্বাধীন। দূরে হয়তো নারী-পুরুষ হাঁটছে হাত ধরাধরি ক'রে, আমার অস্তিত্বের কথাই তারা জানে না।

ওহে ইয়ারবন্ধুরা, একবার তাকাও না এদিক পানে।...আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি। ...এই দিকে একবার ফিরে দেখুন না, কৃপা ক'রে!

কিছুক্ষণ পর আমি গাছটা থেকে নেমে আসি। জেলখানার দেয়ালঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে সব পুরুষই নিশ্চয়ই একই কথা বলবে। জেলের সব পুরুষই নিশ্চয়ই আমি যা ভাবি, সে-কথাই ভাবে। আমাদের যত নিঃসঙ্গ রাত আমাদের নিঃসঙ্গতার মতো আমাদের যত ভাবনা...এটা একদিক থেকে ভালোই যে আপনি আমাদের মনের অতটা গভীরে কখনো চ'লে যান না। আমার এই গোলাপবাগে হঠাৎ-হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে পড়ি নিথর। চারপাশে ফুলগুলো গন্ধ ঝরাচ্ছে। এই তো সৌন্দর্য! এই তো মাধুর্য! অথচ তবু কী নেই। কী?

না। এ-সব ভাবনা মোটেই ভালো কথা না। আমি হেঁটে বেড়াই। কত দেয়াল। কত দরজা। সবখানেই কোনো-না-কোনো ওয়ার্ডার। ওয়ার্ডারদের চোখ এড়িয়ে জেলখানার মধ্যে কিছুই করার জো নেই। একটা আবার উঁচু মিনারও আছে, যেখান থেকে তারা নিচের সবকিছুই দেখতে পায়।

ঐ প্রহরীমিনারের চারপাশেই আমি ঘুরে বেড়াই। কী-একটা দেখে কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারি না। চমৎকার দৃশ্য—শেকলে বাঁধা এক মস্ত হাতি। না...একটা লোক। কালো টুপি। ফর্শা লম্বা চওড়া এক যুবক। ঝকঝকে চোখ। মাথাটা শূন্যে সগর্বে, একটু পেছনে হেলে সে বেশ কষ্টে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার ঘাড় থেকে পিঠ বেয়ে

নেমে এসেছে দুটি শেকল, তার দু-পায়ে তারা জড়ানো। ঐ শেকলবেড়ির জন্তেই তাকে পেছনে বেঁকে যেতে হচ্ছে। এমন-কোনো কয়েদী, যে জেল থেকে পালাতে চেয়েছিলো! আমি তার কাছে গিয়েই স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম...সে যে আমারই স্কুলের এক সহপাঠী!

দুজনে দুজনের দিকে তাকাতেই চোখোচোখি হ'য়ে গেলো। হেসে ফেললুম আমরা, কত-কী বলাবলি করলুম। আবারও হেসে ফেললুম দুজনে! সে নাকি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি জিগেশ করলুম: 'তুই কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারতিস না?'

'ধর, যদি লোকে জেনে যায় তোতে-আমাতে চেনা আছে···তাতে তোর মানে ঘা লাগবে না?'

'চেনা আছে? বলিস কীরে হতভাগা! বলবি যে আমি তোর বন্ধু।'

আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে গালে চুমো খাই। যেন এই জেলের সব কয়েদীর গালেই আমি চুমো খেয়েছি। চুম্বনের খবরটি সারা জেলে র'টে গেলো। পুরো জেলখানাই রোমাঞ্চিত।

এই শেকলবেড়ি-পরা মানুষটা, ঝকঝকে চোখের মানুষটা, এই জেলখানারই জ্যান্ত শহিদ।

সে জেলে ঢুকেছিলো চোর হিশেবে, মেয়াদ ছিলো দেড় বছর। বিড়ি, গুড় আর শুঁটকি মাছের দিব্যি একটা কারবার ফেঁদে বসেছিলো সে। ছ-মাস যাবার পর জেলখানায় একটা খুবই ছোট্ট ঘটনা ঘ'টে যায়। এক ওয়ার্ডার এক ফেরেব্বাজি বাধিয়ে বসে...যা কি না কোনো ওয়ার্ডারই আগে কখনো করেনি। কৃপা ক'রে মন দিয়ে শুনুন এটা। ধরুন, এই ওয়ার্ডারের আমরা নাম দিলুম 'ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার'। এই ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডারের ফেরেব্বাজিটা আমার সহপাঠীর পছন্দ হয়নি। জেলের মধ্যে যত ব্যাবসাই চলে সব ওয়ার্ডারই তার কিছু-না-কিছু বখরা পায়। জেলের কয়েদীদের অনেককেই জেলচত্বর থেকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে রাস্তা সারাবার জন্তে খোয়া ভাঙবার কাজ দেয়া হয়েছিলো। সেইখানেই চলতো পাইকিরি ব্যাবসা। আর এই ভাবেই সহপাঠী হ'য়ে উঠেছিলো বড়ো ব্যাবসাদার। নেংটির ভেতর দিয়ে অনেক জিনিশই ঢুকে যায় জেলের চৌহদ্দিতে। ফটক একবার তল্লাশি হয়। ধুতি খুলে নিজেকে খোলাখুলি দেখাতে হয়। আধমিনিট, ব্যাস, তুমি সাফ! টুপি, শার্ট, ধুতি আর গামছা—জেল কর্তৃপক্ষই দেয় সেসব। সে-সবও তন্নতন্ন ক'রে হাৎড়ে দেখা হয়। কিছুই পাওয়া যায় না। নেংটি, ইজের—এ সবের কাহন জেলে কেউ কখনো শোনেইনি। সম্ভবত তাকে মনুষ্যশরীরের অংশহিশেবেই গণ্য করা হয়। অন্তত গল্প তো তাই বলে। কিন্তু সেটা এখানে জরুরি বিষয়

নয়। আমি বলছিলুম ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার আর তার ফেরেব্বাজির কথা। আমার সহপাঠী দুটো চমৎকার বিরাশি শিক্কার থাপ্পড় কষায় ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডারের মুখে—গাল, কান, সবশুদ্ধু···খবরটা হুড়মুড় ক'রে সারা জেলখানায় ছড়িয়ে পড়ে। শুধু পুরুষদের জেলেই তা নয়, জেনানা ফাটকেও। সকলেই পুলকিত, রোমাঞ্চিত ··আমার সহপাঠীকে খুঁটির গায়ে বেঁধে গুনে-গুনে বারো ঘা চাবুক মারা হয়। তার ঘা তো শুকিয়ে গেলো। আবারও সে হাঁটতে-চলতে শুরু করলে। স্বভাবতই সে চেয়েছিলো তাকে পাথর ভাঙতে বাইরে নিয়ে-যাওয়া হোক। কিন্তু ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার ছিলো তার বিপক্ষে।

'তুমি আমাকে চেনো না। তুমি জানো না যে আমি কোত্থেকে এসেছি। বেশ, তবে এই নাও!' এই মুখবন্ধ ক'রে আমার সহপাঠী ওয়ার্ডারের ঘাড়ে দুটো রদ্দা কষিয়ে দেয়। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ হিশেবে, নাভির ওপর সোজা একটা বেদম ঘা।

তাতে অবশ্য কোনোই দোষ ছিল না। এমনকী জেলের বাইরেও ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডারকে তার ফেরেব্বাজির জন্যে অনুরূপ পুরস্কার পেতে হয়েছে। তার কুকর্মের পরিসীমা তো এইই শুধু। কিন্তু তবু আমার সহপাঠীকে আবার বাঁধা হ'লো খুঁটির গায়ে, চাবুক মারা হ'লো চব্বিশবার। সে ঘাগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে সামলেছিলো। জ্ঞানও সে হারায়নি। তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হ'লো : ছ বছর।

জেলের মধ্যে ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার হ'য়ে গেলো একঘরে। কয়েদীদের কাছে সে হ'লো দাগি লোক। তাদের সবার চোখে সে দেখতে পেলে জিঘাংসা। ওয়ার্ডার ইস্তফা দিলে কাজে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বললে যে তার নিজের কিছু জরুরি কাজ আছে, তাতে মন দিতে হবে।

কতই তো শোনা যায় যে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। জেলখানায় অন্তত কয়েদীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। যদিও তাকে বাইরে পাথরকুচি ভাঙতে নিয়ে-যাওয়া হয় না তবু জেলের মধ্যকার সব কাজকারবারই চালাতো আমার সহপাঠী।

তো, এইভাবেই আমি বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলুম। খাঁচার মধ্যেই সব দরকারি জিনিশ পাই। বেশির ভাগ লোকেই তা জানতো। মাঝে-মাঝে অ্যাসিস ট্যান্ট জেলার আসতো আমার হাজতে। সুন্দর দেখতে, হাসিখুশি এক তরুণ, পরনে খাকি শার্ট প্যান্ট আর শোলার টুপি। কয়েদীরা তাকে বলতো জেলার-ভাই! সে কিন্তু হাজতের দশা দেখবার জন্য আমার ঘরে আসতো না। আসতো আড্ডা দিতে। তার একটা ছোট্ট অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিলো। তার নাম জোকার। আমরা তার ট্রেনিং ব্যায়াম, পথ্য এ সব নিয়ে আলোচনা করতুম। আমি তাকে বলতুম নানাবিধ সারমেয় কাহিনী। জেলার-ভাই সে সব খুব মন দিয়ে শুনতো। তার জন্যে কালো-চা বানাতুম আমি। বেশির ভাগ লোকেই জানতো আমার কাছে চিনি আর চা-পাতা

আছে। মাঝে-মাঝে কোনো ফাঁসির আসামী ভোর পাঁচটায় ফাঁসিতে যাবার আগে রাত্তিরে তো চা চাইতে পারে। ওয়ার্ডার আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ব'লে দিতো। আমি উঠে কালো-চা বানিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিতুম। তাকে জানিয়ে দিতুম সাহসী হ'তে। বলতুম যে মাত্র দু ভাবেই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া যায়। কান্নাকাটি করতে-করতে অথবা হাসিমুখে। কাঁদো-হাসো, যা-ই করো না কেন, মরণ কে ঠেকায়! সেইজন্যেই বরং হাসিমুখে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই ভালো!

সে-সব রাতে আমি জেগেই থাকতুম। ঘুমুতে যেতুম, সে ভোর পাঁচটার পর। ঢুলতে শুরু করেছি, অমনি কোনো রাজনৈতিক নেতা এসে আমাকে জাগিয়ে দিতো। আমাকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্য থেকে নয়। তারা কী ক'রে জানবে যে মৃত্যুর ওপর প্রহরায় আমি জাগরীতে কাটিয়েছি রাত।

হাসিঠাট্টা তর্কবিতর্কও হ'তো সেখানে। যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ছোট্ট শহর। তর্কাতর্কি, শোরগোল, হাসি, হৈ-হৈ ব্যাপার। মাঝে-মাঝে জেলার-ভাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আসতেন জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তাঁরা কথা বলতেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে. আমার বাগানে আসতেন। আমার পছন্দ গাছপালা ঝোপঝাড়। প্রতিটি গাছ। প্রতিটি ঝোপ আমি ভালোবাসি। আমি যে কী বলি, তা শুধু যে গাছপালা ঝোপঝাড়ই বুঝতে পারে, এও আমি অনুভব করেছি সময়-সময়। জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এরও সেই একই অনুভূতি হ'তো। আমরা কথা বলতুম গাছপালা উদ্ভিদ লতা এইসব বিষয়ে। কেমন ক'রে তদারক করতে হয় তাদের, কী সার দিতে হয়। এইসব আলোচনা করতে করতে আমরা পায়চারি করতুম। তাঁর কোয়ার্টারে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছ-টা মস্ত টবে গোলাপগাছ ফলিয়েছেন। আমিই তাঁকে সেগুলো উপহার দিয়েছিলুম। লালটুপিদের মধ্যে কেউ-কেউ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এর সঙ্গে আমার এই মাখামাখি ভালো চোখে ছাখেনি। ওঁর অনুগ্রহ ছাড়াই কি কেউ এখানে ভালোভাবে বাঁচতে পারে না? তবে কেন কেউ ওঁর সঙ্গে হেসে কথা বলবে, ভাব করবে? উনিই কি সংখ্যা বাড়িয়ে খুঁটিতে বেঁধে দু-ডজন চাবুক কষাতে বলেননি? জেলার ভাই ওঁর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো লোক!

দেখলেন তো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়? কোনো-না-কোনো দলে যোগ না-দিয়ে কোনো উপায় নেই। নিরপেক্ষ থাকা, মানুষের মতো সব্বাইকে ভালোবাসা, আদৌ সম্ভব নয়।

আমি সাধারণত বেশির ভাগ সময়টাই কাটাই আমার খাঁচার মধ্যে। কিংবা হয়তো কোথাও দাঁড়িয়ে আমার গাছপালা ঝোপঝাড়ের সঙ্গে গল্প করি। জেলার ভাই এসে আমায় একদিন বললে যে রাজনৈতিক বন্দীদের নাকি ছেড়ে-দেয়া হবে!

সব্বাই খুব খুশি। হাসি, শোরগোল, শিশের শব্দ। জেলার ভাই সকলের কাপড়-

চোপড় এনে দিলে। কাপড়চোপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করা হ'লো, আলাদা-আলাদা মোড়কে বেঁধে-ফেলা হ'লো। সকলের চুল ছাঁটা হ'লো, দাড়ি কামানো হ'লো নিখুঁত-মসৃণ ও সকলের সঙ্গে আমিও চুল ছাঁটলুম, অর্থাৎ যে-ক-গাছা চুল ছিলো, তাও।

সবাই যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে আছি।

আমি আমার জেলের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। বললুম যে আমি তাদের কাছে চিঠি লিখবো। সকলকে কথা দিলুম যে আমার বইগুলোও পাঠিয়ে দেবো।

যাবার জন্যে, তাই, আমরা অপেক্ষা করছিলুম।

মুক্তিনামাগুলো এলো।

আমাদের ছেড়ে দেয়া হবে!

সবাইকে, শুধু-একজন বাদে...এই দীন লেখকটির মুক্তির কোনো হুকুমনামা আসেনি। নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে কোথাও! জেলার ভাই ছুটে গেলো জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর কাছে। তাঁকে দিয়ে আমার জন্যই বিশেষভাবে টেলিফোন করানো হ'লো। না, কোনোই ভুল হয়নি। আমাকে ছাড়া হবে না। বেশ। হয়তো আমি যথোচিত দেশপ্রেমের বাই থেকে সেরে উঠিনি।

রাজনৈতিক নেতারা বিদায় নিলেন। ইনো'স ফ্রুট সল্ট, কার্লমার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল', দু'প্যাকেট তাশ, একটা ছোট্ট শিশি ভর্তি লেবুর আচার, কলাভাজার একটা মস্ত কৌটো, এক ঠোঙা কলার পিঠে, কাঁচা তামাকের গুঁড়ো, পান, সুপুরি, লেবু—এই সবকিছুরই একমাত্র অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী হ'য়ে উঠলুম আমি।

রাজনৈতিক নেতরা হাসিমুখে বিদায় নিলেন। সব কেমন চুপচাপ হ'য়ে গেলো। যেন সেই পরিত্যক্ত শহরটায় আমিই আছি, একা, একমাত্র। সব ভেড়াকে যখন চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়, সবচেয়ে নাদুশনুদুশটাকে আটকে রাখা হয়, দড়িতে বেঁধে। কেন? স্পষ্টই নিশ্চয়ই কশাইয়ের ছুরির জন্য। অনিবার্য সর্বনাশের একটা পূর্ববোধ হ'লো আমার। আমি হাসতে পারি না। প্রাণে কোনো সুখ নেই। কেমন নিঃসাড় আর মনমরা লাগে সারাক্ষণ। আলো, আঁধার—কিছুই যেন আমার মনকে আর ছোঁয় না। জেলার ভাইকে আমি কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল' গছিয়ে দিলুম। ব্যবস্থা করলুম, কলার পিঠেগুলো যাতে হাসপাতালে ইয়ারবন্ধুদের মধ্যে বিলি ক'রে দেয়া হয়। ঐ তাশের প্যাকেট দুটো বিশেষভাবে উপহার দিলুম আমার সহপাঠীটিকে। আমার যে-চেলাটি 'কাপ্তি' এনে দেয়, তাকে দিয়ে দিলুম পান-সুপুরি। সকলকে বিলিয়ে দিলুম কলাভাজা। তবুও আধকৌটো কলাভাজা র'য়ে গেলো লেবুর আচারের শিশি আর ইনো'স ফ্রুট সল্ট-এর সঙ্গে আমারই কাছে, হাজতে। দু'দিন পরে ইনো'স ফ্রুট সল্টের শিশিটা জেলখানার দেয়ালের ওপাশে ছুঁড়ে ফেললুম। আমি বেঁচেই রইলুম।

তবে, বলেছিই তো, হৃদয়টা যেন ম'রেই গিয়েছে ব'লে মনে হচ্ছিলো। কী হ'তে যাচ্ছে, আমার? অন্যদের আমরা দিব্যি পরামর্শ দিতে পারি। বলতে পারি: কোনোকিছুর মুখোমুখি হ'তে সাহস হারিও না। হাসি আর কান্না দুই ই'আছে যখন, অতএব সহাস্যেই মুখোমুখি হওয়া ভালো বাস্তবের!

হায় খোদা, আমি যে হাসতেও পারছি না। অতীব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য এক মানুষ আমি। অতি-বেচারি ছোট্ট প্রাণী। আমাকে বাঁচাও। কী করি আমি এখন?

পালাবো। আমি পালাবো ব'লেই ঠিক করলুম। বাইরের জগৎ আর আমার মধ্যে আছে শুধু দু'টি দেয়াল। একটার তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অন্যটা বেয়ে উঠে পালাতে হবে আমায়। রাত্তিরে তো ওয়ার্ডার ঘুমোবে।

আসুক না এক দুর্যোগের রাত, ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাত!

আমার পালাবার পরিকল্পনাটা ছিলো এইরকম: আমার হাজত ঘরের দেয়াল খুব পুরু নয়। তার তলা দিয়ে শুড়ঙ্গ খোঁড়ার সাজ-সরঞ্জাম আমার আছে। এইভাবে আমি হাজত থেকে বেরিয়ে যাবো। তারপর থাকবে শুধু জেলখানার উঁচু দেয়ালটা। সেটা ইটে গাঁথা। ইটের ফাঁকে-ফাঁকে আছে চুনশুরকির পলেস্তারা। চাই শুধু দশ-বারোটা বড়ো-বড়ো গজাল। গ্র্যানাইট পাথরের টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে গজালগুলো গুঁজতে হবে দেয়ালে। আর এই ভাবেই গিয়ে পৌঁছুবো দেয়ালের ওপরটায়। তারপরে আমার কম্বল, শুজনি, গামছা আর ধুতি পাকিয়ে-পাকিয়ে একটা দড়ি বানাবো, গজালের গায়ে শক্ত ক'রে বাঁধবো সে-দড়ি, তারপর বেয়ে বেয়ে নেমে যাবো নিচে—স্বাধীনতায়। পরিকল্পনাটা নিরেট। শুধু চাই গজাল। জেলখানার এক কোণায় পায়খানায় ব্যবহার করার জন্য অগুনতি বালতি আর মগ প'ড়ে আছে জং-ধরা, মরচে-পড়া। বালতির গোল হাতলগুলো প'ড়ে আছে স্তূপাকার, সবগুলোরই দশা বেশ ভালো। সেগুলো সব আমি কুড়িয়ে আনলুম, তারপর সোজা ক'রে নিলুম। এগুলোই আমার গজাল। সবশুদ্ধু গোটা তিরিশ হবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

আসুক ঐ দুর্যোগের রাত। ঐ ঝড়বৃষ্টিবজ্রপাত।

এলো একটা দিন।

কয়েকজন লালটুপি ইয়ারবক্সি আর চেলা এসে হাজির এক ওয়ার্ডারকে সঙ্গে নিয়ে। জেনানা ফাটকের দেয়ালের পাশে তারা একটা শবজি-বাগান করতে চায়। আমি কি যাবো?

না। আমার আর কোনোকিছুতে কোনো আগ্রহ নেই। জীবন থেকে সব তাপ উত্তাপ সব আলো উধাও হ'য়ে গেছে। তোমরা তোমাদের পথ ভাখো। আর তাছাড়া,

কেই বা চায় শাক-শবজি ? আমি শুধু অপেক্ষা ক'রে আছি ঝড়বৃষ্টির এক তুমুল দুর্যোগের রাতের জন্য। আমাকে বিরক্ত কোরো না।

কিন্তু তারা নাছোড়। কেন তুমি পীর-ফকিরের মতো দূরে-দূরে থাকবে, উদাসীন ?

গেলুম। সাহায্য করলুম তাদের। বাগান বসানো হ'লো। এক বন্ধু হঠাৎ আমাকে একটা জিনিশ দেখালে। লালচে রঙের দেয়ালটার তলায় পাঁপড়ের মতো দেখতে চুনশুরকির এক গোল পলেস্তারা, তাপ্পি।

অতীতে কখনো এটা বেশ-একটা সম্ভ্রমজাগানো গর্তই ছিলো। বহু, বহু প্রেমিক-হাতের কঠিন পরিশ্রমেরই ফল ছিলো এটা—অগুনতি ঘণ্টাপ্রহর দিন-মাসের খাটুনির ফল।

'আরে ব্বাস ! আর সেইভাবেই এটা থেকে গিয়েছে। কত-যে দিন, মাস, বৎসর —সে দাঁড়িয়ে আছে এইমতো ! জেলখানার মধ্যেই কিনা থেকে গিয়েছে ভদ্র, বাধ্য, বশম্বদ।

এই গর্ত দিয়ে জেনানা ফাটক আর মরদ হাজত পরস্পরের মুখ দেখাদেখি ইত্যাদি করতে পারে…

এরই মধ্য দিয়ে স্ত্রীলোকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরুষদের জেলখানায়। আর পুরুষদের গন্ধ গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জেনানা ফাটকে।

এটা খুব-একটা দারুণ-সুরক্ষিত কোনো গোপন কথাও নয়। কেউ গ্যাখেনি, কেউ শোনেও-নি। অতএব ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে গেছে। এই জায়গাতেই একটা উঁচু মঞ্চ বানিয়ে নৈতিকতা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিতে পারে কেউ।

কিন্তু, অহো, সব সদ্‌গুণে ভূষিত মহান আত্মা ! আমরা মানুষ। অনেক দুর্বলতা আছে আমাদের। আমাদের প্রতি একটু দয়া দেখান। কিঞ্চিত ঐশ্বরিক ক্ষমার চক্ষে আমাদের দেখুন !

তারা ক্ষমার চক্ষেই দেখলে এটাকে। সব্বাই।

কিন্তু ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার সেখানে তার ব্যবসার একটা সুবর্ণ-সুযোগ দেখতে পেলে। গর্তের মধ্য দিয়ে এককেবার তাকাবার জন্য সে ছোট্ট একটা মাশুল ধ'রে দিলে। জন প্রতি এক আনা ( ছ-পয়সা )।

এখানে তো ধনী-গরিব—দুইই আছে। গরিবরা তাহ'লে করবে কী ?

আমার সহপাঠী বললে : 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, ওয়ার্ডার।'

—'তাহ'লে আমি গর্তের মুখটা বুজিয়ে দেবো।'

ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার ভয় দেখালে। শুধু তাই নয়, সে কিনা সত্যি-সত্যি সিমেন্ট দিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে দিলে। স্ত্রী-পুরুষের রক্ত দিয়ে ও-সিমেন্ট মাখা হয়নি।

কিন্তু তবু আমি ঝুঁকে ঐ সিমেণ্টের গন্ধ শুঁকলুম। স্ত্রীলোকের গন্ধ ছড়াচ্ছে কি ওখান থেকে?

এইভাবেই আমার সহপাঠী পেলে সাড়ে চার বছর উপরি-মেয়াদ আর ছত্রিশ ঘা চাবুক। আমরা সোৎসাহে তৈরি করলুম শবজিবাগান, কিন্তু আমার দিকে জেলখানাটা ফাঁকাই থাকে। শুধু আমি আর এক ঢুলু-ঢুলু ওয়ার্ডার।

সকালবেলায় তিনজন আসে শবজিবাগানে জল দিতে। সঙ্গে থাকে এক বিশেষ পাহারা। আমি শুধু হেঁটে বেড়াই। যেন আমি কোনো বিশাল শহরের ধ্বংসস্তূপে ফাঁকা রাস্তাগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটছি। কোনো রং নেই কোথাও। সর্বত্র স্তব্ধতা। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ-হঠাৎ আমি নেমে পড়ি। স্তব্ধতা কি আরো ঘন হ'য়ে জমাট বাধবে, আরো ভারি হ'য়ে যাবে? আমি শিশ দিয়ে উঠি। আমি গাছপালা লতা-পাতার সঙ্গে কথা বলি। বেশ-কিছু কাঠবেড়ালি আছে সেখানে। একটাকে পাকড়াতে হবে ব'লে ঠিক করলুম। তাড়া ক'রে যাই কোনোটাকে, গাছ বেয়ে সে উঠে যায়। আমি তখন তাকে নামাবার জন্য ঢিল ছুঁড়তে থাকি।

আর এইভাবেই একদিন যখন শিশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি জেনানা ফাটকের দেয়ালের কাছে—বেহেস্তের সুর হঠাৎ! পৃথিবীর সবচেয়ে সুরেলা গলাটি! দেয়ালের ওপাশ থেকে প্রশ্ন এলো: 'কে শিশ দিচ্ছে ওখানে?'

পুরুষদের জেলখানা থেকে নয়। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। আমি ডানদিকে তাকালুম, বামদিকে তাকালুম, তারপর বললুম: 'আমি।'

একটু জোরে কথা বলতে হয়। মেয়েটি যে দেয়ালের অন্য পাশে। আমি এর মধ্যে আছি।

মেয়েটি জিগেশ করলে: 'তোমার নাম কী?'

আমি তাকে বললুম যে আমি মুসলমান, যে আমার নাম বশীর, যে আমি একজন লেখক। আমার অপরাধের প্রকৃতিটাও আমি বর্ণনা করলুম, মেয়াদ কতদিন সেটাও বললুম। সেও তার পালা এলে তার সম্বন্ধে সব খুঁটিনাটি বললে।

সে হিন্দু, আর ভারি সুন্দর নাম তার—নারায়ণী।

তার বয়েস সুবাঞ্ছিত বাইশ।

সে জানে পড়তে-লিখতে, একটু লেখাপড়া শিখেছিলো। চোদ্দ বৎসর মেয়াদ পেয়েছে সে। এখানে আছে এক বছর হ'লো।

আমি বললুম: 'নারায়ণী, দুজনেই আমরা একই সময়ে জেলে এসেছি!'

—'তাই বুঝি?' কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নারায়ণী জিগেশ করলে: 'তুমি আমাকে একটা গোলাপচারা দেবে?'

আমি জিগেশ করলুম : 'নারায়ণী, তুমি কেমন ক'রে জানলে এখানে গোলাপ গাছ আছে ?'

নারায়ণী বললে : 'বা, এটা বুঝি জেল নয় ? সব্বাই জানে। এখানে কোনো গোপন কথা নেই—তুমি আমাকে দেবে গোলাপ চারা ?'

শুনলেন কী বলছে এ-মেয়ে ? কোনো গোপন কথা নেই ! অথচ কী আমি জানি জেনানা ফাটক সম্বন্ধে ? কী আমি জানি সেখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে ?

নারায়ণী আবারও জিগেশ করলে : 'তুমি আমাকে একটা গোলাপ চারা দেবে না ?'

'নারায়ণী !' এত জোরে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম যে হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি উপড়ে বেরিয়ে এলো : 'পৃথিবী নামে যে-বাগানটা আছে, তাতে যতো গোলাপগাছ গজায়, তার সব ক-টাই আমি নারায়ণীকে দিয়ে দেবো।'

নারায়ণী হেসে উঠলো খিলখিল। যেন টুংটাং বেজে উঠলো হাজারটা সোনার ঘণ্টা। আমার হৃৎপিণ্ডটা হাজার টুকরো হ'য়ে ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো !

'একটাই যথেষ্ট। মাত্র একটা। পাবো তো ?'

শুনলেন কথাটা ? দেবো কি না একটা ? এ-নারায়ণীকে নিয়ে আমি করবো কী ? ওকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, আচ্ছন্ন ক'রে দিতে হয় চুমোয়-চুমোয়। তাছাড়া আর কী ?

'নারায়ণী !' আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : 'ওখানেই থাকো। আমি এক্ষুনি একটা নিয়ে আসছি। শুনতে পেয়েছো আমাকে ?'

নারায়ণী বললে : 'শুনেছি—তোমাকে।'

আমি ছুটলুম। কাঠবেড়ালিরা আমাকে দেখেই হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়লো গাছে।

আমি বললুম : 'ওরে হতচ্ছাড়ারা, গাছে গিয়ে উঠছিস কেন ? নেমে আয়, এখানে খেলা কর।'

আমি ছুটে গেলুম গোলাপবাগিচায়। আশ্চর্য ! ফুলগুলো রৌদ্রে স্নান ক'রে চমৎকার ফুটে আছে নতুন পাওয়া হাসি সমেত !

সবচেয়ে বড়ো যে-ঝাড়, সবচেয়ে সুন্দর যে-ঝাড়, সেটাকেই আমি তুলে নিলুম। এমনভাবে খুঁড়ে ওঠালুম যাতে শেকড়ের গায়ে মাটি থাকে, তারপর একটা চটের টুকরোয় মাটি আর শেকড় ভালো ক'রে বাঁধলুম। বেঁধে দিলুম পাতা আর ডালগুলোও। ছুটে ফিরে এলুম দেয়ালের কাছে।

'নারায়ণী !' আমি হাঁক দিলুম। কেউ কোনো সাড়া দিলে না। তবে কি ও চ'লে গেছে ?

'নারায়ণী!' আবারও হাঁক দিলুম আমি। অমনি আবার খিলখিল হাসি। তারপর: 'হ্যাঁ! বলো।'

আমি জিগেশ করলুম: 'কোথায় ছিলে তুমি, যখন তোমায় ডাকলুম।'

'এখানেই ছিলুম।'

'তবে?'

'আমি না-বলা কথার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলুম।'

'ওরে দুষ্ট মেয়ে!'

সে হেসে উঠলো, খিলখিল। সে জিগেশ করলে: 'এনেছো? গোলাপগাছ?'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। কারণ আমি তখন চুমো খেতে ব্যস্ত। প্রত্যেকটা গোলাপ আর কুঁড়ি আর পাতাকে আমি চুমো খাচ্ছিলুম।

নারায়ণী আমার নাম ধ'রে ডাকলে।

আমি চুপ।

শুধু চুমো খাচ্ছি। চুমো খাচ্ছি সব কটা ডাল, সব কাঁটাকে। নারায়ণী আবার আমাকে ডাক দিলে উৎকণ্ঠায়।

আমি সাড়া দিলুম।

তখন নারায়ণী একটু বিরক্ত সুরে বললে: 'অন্তত যদি তুমি এমন ভালোবেসে ভগবানকে ডাকতে!'

আমি বললুম: 'যদি আমি ভগবানকে ডাকতুম!'

তার গলার সুরে এবার অভিমান: 'আমি বলেছি, যদি ভগবানকে এমন ভালোবেসে ডাকতে!'

—'যদি আমি এমন ভালোবেসে ভগবানকে ডাকতুম?'

সে বললে: 'তাহ'লে ভগবানও আমার সামনে আবির্ভূত হতেন!'

আমি বললুম: 'আমি বুঝি তোমার কাছে দেখা দিইনি?'

—'কেন তুমি সাড়া দাওনি, যখন তোমাকে ডাকলুম?'

—'আমি চুমু খেতে ব্যস্ত ছিলুম।'

—'কাকে? দেয়ালকে?'

—'না?'

—'কাকে তবে?'

—'সব ফুল, সব ডাল, সব পাতাকে।'

—'হায় ভগবান, আমার কান্না পাচ্ছে!'

—'নারায়ণী!'

—'বলো !'

—'তলার গেরোটা খুলো না কিন্তু। জমিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ভগবানের নাম নিয়ে এটাকে রুয়ে দিয়ো। তারপর গর্তটা মাটি দিয়ে বুজিয়ে জল দিয়ো। বুঝলে ?'

—'বুঝেছি।'

আমি বললুম : 'তাহ'লে এই সে এলো !'

দড়ি-বাঁধা ডালপালা পাকড়ে, হাত ঘুরিয়ে, সেটাকে আমি ছুঁড়ে দিলুম দেয়ালের ওপর দিয়ে।

—'পেয়েছো ?'

—'ওঃ, ভগবান !' নারায়ণীর গলার স্বরে এত খুশি যেন সে একটা আস্ত রাজ্য জয় ক'রে ফেলেছে : 'পেয়েছি !'

—'যে-গেরোটা দিয়ে ডালগুলো বাঁধা, সেটা কিন্তু খুলে দিতে হবে।'

—'নিশ্চয়ই দেবো,' সে বললে। 'ফুলগুলো তুলে আমি রেখে দেবো আমার কাছে।'

—'কোথায় রাখবে ? খোপায় গুঁজবে বুঝি ?'

—'না।'

—'তাহ'লে কোথায় ?'

—'আমার বুকে…ব্লাউসের ভেতর !'

ফুলগুলো সব আমার চুমুতে ভরা। আমি দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। হাত বুলিয়ে আদর করলুম দেয়ালকে।

নারায়ণী বললে : 'রোসো, এটাকে রুয়ে জল দিয়ে নেই। তুমি কিন্তু সবসময় দেয়ালের ওপরে তাকাবে। যখনই আসবো, তখনই আমি একটা শুকনো ডাল তুলে ধরবো। ডালটা দেখলে তুমি আসবে তো ?'

আমি বললুম : 'আসবো।'

চাপা কান্নার একটা দমক যেন শুনতে পেলুম : 'ওঃ, ভগবান !'

—'কী হ'লো, নারায়ণী ?'

নারায়ণী বললে : 'আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে !'

আমি জিজ্ঞেস করলুম : 'কেন ?'

নারায়ণী ধরা গলায় বললে : 'আমি—আমি জানি না !'

আমি বললুম : 'নারায়ণী, যাও, গাছটা রুয়ে এসো।'

—'আমি একটা শুকনো ডাল তুলে ধরবো !'

আমি বললুম : 'আমি তার জন্য চোখ খোলা রাখবো !'

— 'আসবে তো, দেখবামাত্র?'

— 'ঠিক আসবো।'

আমার হাজতে ফিরে এলুম আমি। সব কী নোংরা, আর এলোমেলো। আমি তোষক ঝাড়লুম, অনেকদিন পর ঠিক ক'রে পাতলুম বিছানা। আমার খাঁচাটার মধ্যে শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনলুম খানিকটা। তারপর ব'সে-ব'সে তাকিয়ে রইলুম দেওয়ালের ওপরটায়, আকাশে। কই, কোনো শুকনো ডাল তো উঠে এলো না। আল্লাহ্, তবে কি নারায়ণী আমাকে ভুলে গেলো নাকি?

শুকনো ডাল তবে উঠে আসবে না আকাশে! তাই আমি ভেবেছিলুম — ওঃ, সে কী দৃশ্য!

একটা শুকনো ডাল আস্তে-আস্তে মাথা তুললো আকাশে! আমি নিথর ব'সে আছি। আবার উঠে এলো ডাল। আমি নড়লুম না। আবারও উঠে এলো ডালটা। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এলো যেন, আমি ছুটলুম, উর্ধ্বশ্বাসে, লাফিয়ে এসে দাঁড়ালুম দেয়ালের কাছে। প্রাণের ভয়ে কত-যে কাঠবেড়ালি হুড়োহুড়ি ক'রে উঠে গেলো গাছে আর প্রতিবাদের স্বরে কিচিরমিচির ক'রে উঠলো!

আমি ডাক দিলুম: 'নারায়ণী!'

দেয়ালের ওপাশে সব চুপচাপ? আমি আবারও ডাক দিলুম। শেষটায় সে রাগিস্বরে বললে: 'কী? কী চাও?'

— 'ও!'

নারায়ণী বললো: 'যাও! চ'লে যাও! ডালটা ধ'রে থেকে-থেকে হাত দুটো কাঁধ থেকে খ'শেই পড়বে বুঝি!'

— 'আমি ড'লে-ড'লে আবার সার ফিরিয়ে আনবো তাদের!'

— 'এই যে একটা হাত। দাও, ড'লে-ড'লে সাড় ফিরিয়ে দাও। আমি দেয়ালের গায়ে রেখেছি হাতটা!'

— 'আমি দেয়ালটা ড'লে দিচ্ছি। আমি তাকে চুমুও খাচ্ছি!'

— 'আমি আমার বুক দিয়ে ছুঁয়ে রেখেছি দেয়াল। আমি চুমু খাচ্ছি ইটগুলো।'

আমি জিগেশ করলুম: 'নারায়ণী, ওখানে তোমরা কতজন মেয়ে আছো?'

নারায়ণী হেসে উঠলো। বললে: 'শুধু আমি।'

— 'ওরে দুষ্টু মিথ্যেবাদী! বলো না, সত্যি ক'রে। কতজন তোমরা?'

— 'অনেক। সব্বাই বুড়ি, থুরথুরি!'

— 'কতজন?'

— সাতাশি জন।'

—'কতজন সুন্দরী আর যুবতী ? কতজন বুড়ি ?'

নারায়ণী বললে : 'ছিয়াশিজন থুরথুরি—একজনাই রূপসী।'

আমি হার মানলুম। জিগেশ করলুম : 'তোমাদের জেলে গোলাপগাছ নেই ?'

—'না !' নারায়ণী বললে : 'কিচ্ছু নেই এখানে···আমি···তুমি শুনছো তো ?'

আমি বললুম : 'শুনছি !'

—'কালকে···আমি কাল বাজরার গুঁড়ো ঝলশাবো। একটা ঠোঙায় পুরে দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেবো তোমাকে। গুড় দিয়ে তোমাকে তা খেতে হবে কিন্তু। খাবে তো তুমি ?'

—'খাবো।'

—'না !' নারায়ণী সব ঠিক জানে : 'তুমি নিশ্চয়ই তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

—'দেবো বুঝি ?' আমি বললুম : 'আমি একটা কণাও নষ্ট করবো না।'

নারায়ণী বললে : 'কেমন দেখতে তোমার মুখ ?'

—'ফরশা, একটু লম্বাটে, কদমছাঁট মাথায়, টাক প'ড়ে যাচ্ছে।'

—'চোখ দুটো ?'

আমি বললুম : 'খুদে-খুদে হাতির চোখের মতো।'

নারায়ণী বললে : 'আমারগুলো—আমারগুলো আয়ত-সব হাতির চোখের মতো। আর তোমার বুক ?'

—'চওড়া, সমতল !'

—'আমার স্তনগুলোও চওড়া। আর তোমার কোমর ?'

—'আমার কোমর সরু।'

—'তুমি জানো আমার কোমর দেখতে কেমন···না, তুমি বুঝতেই পারবে না !'

আমি বললুম : 'একটা পিপের মত চওড়া—'

নারায়ণী একটা আধচাপা চীৎকার ক'রে উঠলো। বললে : 'তোমাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে ?'

—'নারায়ণী ?'

—'উঁ ?'

—'রং কি তোমার ?'

—'কোথাকার ?'

—'তোমার সুন্দর মুখের রং !'

—'ফরশা ধবধবে।'

আমি ডেকে উঠলুম : 'নারায়ণী !'

—'উ ?'

—'মেয়েদের গন্ধ ! ...আমি সে-গন্ধ পেয়েছি !'

—'এখন ! ওঃ, ভগবান !'

আমি বললুম : 'এখন না। সেই প্রথম যখন জেলে ঢুকলুম আর এদিকে এলুম।'

—'কোত্থেকে এলো ঐ গন্ধ ? সে কি আমার ?'

—'জানি না তো।'

—'আর পুরুষের গায়ের গন্ধ...তোমার গায়ের গন্ধ কেমন ?'

আমি বললুম : 'জানি না তো। নারায়ণী...তোমার গায়ের গন্ধ !'

আমি নাকের বাঁশি ফুলিয়ে জোরে-জোরে শ্বাস নিলুম।

—'পেয়েছো ? গন্ধ ?'

আমি বললুম : 'না।'

নারায়ণী বললে : 'আমিও যে পাচ্ছি না ! এই বিকট দেয়ালটা !'

আমি বললুম : 'নারায়ণী ! দেয়ালটার গায়ে একসময়ে একটা গর্ত ছিলো। তুমি সেটা দেখেছো ?'

নারায়ণী বললে : 'সিমেন্ট দিয়ে কোথায় সেটা বুজিয়ে দেয়া হয়েছে দেখেছি, সেটাকে আমি ছুঁয়ে দেখেছি। আমি এখানে আসার আগেই ওটা বুজিয়ে দেয়।'

আমি বললুম : 'আমি সেখানটা শুঁকে দেখেছি।'

নারায়ণী বললে : 'যে ওয়ার্ডার ওটা বুজিয়ে দেয়, তাকে নাকি কোন কয়েদী মেরেছিলো। তাকে নাকি খুঁটিতে বেঁধে চাবকানো হয়। প্রতিটি চাবুকের ঘা সব মেয়েরা এখানে এক-এক ক'রে ব্যথা পেতে-পেতে গুনেছে।'

—'খুঁটিতে বেঁধে ওকে ছত্রিশ ঘা চাবুক মারে। পুরুষ কয়েদীরাও ব্যথা পেতে-পেতে সব ঘা গুনেছে।'

নারায়ণী বললে : 'কী করুণ !'

আমি বললুম : 'যাকে চাবকেছিলো, সে আমার সহপাঠী। আমরা একই জায়গা থেকে এসেছি।'

—'তাই বুঝি ?'

—'সত্যি।'

আর এইভাবেই এলো ঠোঙাটা, শাদা একটা গোল ঠোঙা—ভেতরে বাজরার গুঁড়ো। এলো নুন-মেশানো লঙ্কার গুঁড়োর ঠোঙাও। বিনিময়ে গেলো লেবুর আচার। আর আস্ত এক কৌটো কলা ভাজা।

নারায়ণী জিগেশ করলে : 'কলা ভাজা···আমি কি...আমি কি সবাইকে একটা ক রে দিতে পারি !'

আমি বললুম : 'সব্বাইকে দাও।'

নারায়ণী জিগেশ করলে : 'তুমি কি···তুমি কি···ভালোবাসবে আমাকে...শুধু আমাকে ?'

—'কেন তুমি সন্দেহ করছো, নারায়ণী ?'

—'এখানে,' নারায়ণী বললেন, 'আরো-সুন্দরী সব মেয়ে আছে। আমার তো রূপ নেই বিশেষ !'

আমি বললুম : 'আমিও রূপবান নই।'

সে বললে : 'আমি-যে তোমাকে দেখতে চাই।'

আমি বললুম : 'আমিও তোমাকে দেখতে চাই চোখে।'

সে বললে : 'ওঃ, ভগবান...সারা রাত আমি কেঁদে ভাসাবো।'

বিষম একটা দুর্যোগের রাত এলো, ঝোড়ো হাওয়ার, বৃষ্টির, বজ্রপাতের। আমি ব'সে রইলুম গরাদ-দেয়া খাঁচায়, আলোয় ছাওয়া। স্ফটিকের মুষলের মতো বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। জলের ফোঁটা পড়ছে রাশি-রাশি ঢিলের মতো। খোদার দোয়া। পড়ুক বৃষ্টি। হে ঝড়ের হাওয়া, ঘূর্ণিতুফানের মতো ব'য়ে যাও। কিন্তু শিকড় উপড়ে আছড়ে ফেলো না কোনো গাছ। হে মেঘ, গর্জন করো, তবে আস্তে, নরম স্বরে। তোমার কানে-তালা-ধরানো আওয়াজ বেচারি মেয়েদের যে ভয় পাইয়ে দেবে ! তাই নরম স্বরে, নরম হও।

ফুটে উঠলো দিন। আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। ধোয়া-মোছা এক পৃথিবী। তারপরেই আমি ভাবলুম জেল থেকে পালানো কোনো ভালো কাজ না। বেরিয়ে যাবার জন্য এত কষ্ট ক'রে, তারপর, বেরিয়ে গিয়ে কী করবে কেউ ?

আরো অনেক হাওয়ার রাত আসবে, বৃষ্টির রাত, বাজফাটা রাত। কিন্তু এ যে অনৈতিক ! আমি ইচ্ছে ক'রে ভুলে গেলুম কোথায় আমি রেখেছিলুম ঐসব বড়ো-বড়ো গজাল। সংক্ষেপে, আমি মনস্থির ক'রে ফেললুম যে জেল থেকে পালানো গর্হিত কাজ, অনৈতিক।

দেয়াল তো রক্তমাংসে বদলে যেতো না। কিন্তু তবু আমি ভাবতে লাগলুম তার কোনো আত্মা আছে কি না এখন। দেয়াল তো তাকিয়ে দেখেছে কতকিছু। কান পেতে শুনেছে কতকিছু।

ভাঁপানো মাছ, ভাজা মেটে, ডিম, রুটি, আরো কত-কী যে দেয়াল টপকে ওপাশে চ'লে গেলো।

একদিন ওপরে তাকাতেই দেখি বড়ো-এক কাঠবেড়ালি ব'সে আছে দেয়ালের ওপর। আমাকে সে নিরীক্ষণ করছে।

আমি বললুম : 'ভাগ, পাজির পাঝাড়া? লজ্জা করে না তোর?'

নারায়ণী জিগেশ করলে : 'কাকে গাল দিচ্ছো অমন?'

আমি বললুম : 'ঐ কাঠবেড়ালিটাকে। হতভাগা দেয়ালের ওপর ব'সে-বসে আমাদের কথায় আড়ি পাতছে।'

—'থাকুক না,' বললে নারায়ণী।

—'ও এসেছে আমাদের নিয়ে রগড় করতে। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি ওকে—ওকে আর ওর দলের সবকটাকে।'

ঢিল ছুঁড়লুম আমি। কাঠবেড়ালি ছুটে পালালো।

নারায়ণী প্রতিবাদ ক'রে বললে : 'গ্যাখো তো···আমার স্তনে এসে একটা ঢিল পড়লো।'

—'ব্যথা করছে?'

—'কেমন ক'রে দেখা হবে আমাদের?'

—'আমি তো কোনো উপায় দেখছি না।'

—'আমি তোমার কথা ভাববো আজ রাতে আর কাঁদবো!'

আমিও তার কথা ভাবলুম সে-রাতে, সারাক্ষণ।

এইভাবে কত-যে দিন-রাত্রি কেটে গেলো।

—'আমি চেষ্টা করবো হাসপাতালে আসতে,' নারায়ণী বললে একদিন, 'সম্ভব হবে ···তুমি কি পারবে হাসপাতালে আসতে? অন্তত দূর থেকেও তোমাকে যদি দেখতে পাই তো সে অনেক।'

আমি বললুম : 'আমি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবো তোমায়, চুমু খাবো। মুখে, ঘাড়ে, তোমার স্তনে, তোমার তলপেটে।'

সে জিগেশ করলে : 'তুমি আমায় চিনবে কেমন ক'রে?'

আমি বললুম : 'তোমার মুখ দেখলেই আমি চিনতে পারবো।'

নারায়ণী বললে : 'আমার ডান গালে একটা কালো তিল আছে। সেটা তুমি দেখবে তো খুঁজে?'

—'ঐ কালো তিলটায় আমি চুমু খেতে চাই।'

—'আসতে ভুলো না কিন্তু। আমার সঙ্গে অন্য মেয়েরাও থাকবে।'

আমি বললুম : 'আমি থাকবো একা। আমার মাথায় কোনো টুপি থাকবে না। টাক পড়তে শুরু করেছে আমার। আর আমার হাতে থাকবে একটা গোলাপ।'

—'আমি তোমার জন্য অধীর হ'য়ে থাকবো !'

—'হাসপাতালের চাপরাশি আমার এক পুরোনো দোস্ত ।'

—'ঠিক যা ভেবেছিলুম ।'

—'কী ক'রে জানলে তুমি ?'

—'অত ডিম মেটে···রুটি···আমি যখন মারা যাবো তুমি আমার কথা ভাববে তো ?'

—'তোমার আরো গোলাপচারা চাই ? এখানে প্রচুর আছে ।'

—'না । তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাই দিয়েই আমি গোলাপবাগান বানিয়েছি । আমি ম'রে গেলে আমার কথা তুমি ভাববে তো ?'

—'নারায়ণী, প্রেয়সী ! মৃত্যুর কথা কিছু বলাই সম্ভব নয় । কে কবে মারা যাবে, কেমন ক'রে—একমাত্র খোদাই তার উত্তর দিতে পারেন । হয়তো আমিই প্রথমে মারা যাবো ।'

—'না, আমি । তখন তুমি আমার কথা ভাববে তো ?'

—'ভাববো ।'

নারায়ণী বললে, 'কেমন ক'রে ? ওঃ, ভগবান—কেমন ক'রে তুমি ভাববে আমার কথা ? তুমি তো আমাকে চোখেই ছাখোনি । তুমি আমাকে স্পর্শও করোনি কোনো-দিন । কেমন ক'রে তবে তুমি ভাববে আমাকে ?'

—'আস্ত জগৎটার সবখানেই তোমার চিহ্ন ছড়ানো !'

নারায়ণী ধরা গলায় জিগেশ করলে : 'এই জগতের সবখানে ? কেন তুমি অমন চাটুকারিতা করো ?'

আমি বললুম : 'নারায়ণী, এ চাটুকারিতা নয় । এ যে নিরলংকার সত্য···দেয়াল ···কত দেয়াল !'

—'আমি ফুল তুলে রাখবো আমার নিজের কাছে !'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি । অন্য ধারে সব চুপচাপ ।

কিছুক্ষণ পরে নারায়ণী বললে : 'আমার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে ।'

আমি বললুম : 'না, সে তুমি রাতের বেলায় কেঁদো ।'

নারায়ণী বললে : 'কাল তোমাকে ব'লে দেবো কখন হাসপাতালে আমাদের দেখা হবে ।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম আমরা, উত্তেজনায় ভরপুর । রাত্রি এলো, আলো জ্বালিয়ে দেয়া হ'লো । ওয়ার্ডার এলো । আলো নিভে গেলো । দরজা খুলে গেলো । আমি বেরিয়ে এলুম । দাঁত মাজ', ব্যায়াম, স্নান—সব তাড়াতাড়ি সেরে

ফেললুম আমি। গোগ্রাসে গিললুম খাবার। 'চাক্কি' থেকে বিড়ি জ্বালিয়ে নিলুম। ব'সে-ব'সে সুখটান দিলুম। জেলারভাই আড্ডা দিতে এলো একটু। ঠিক তখন, দেয়ালের ওপর নীল আকাশের তলায় উঠে এলো এক শুকনো ডাল।

আমি থেমে গেলুম! যেন কাঁটার ওপর ব'সে আছি, ছুঁচের ডগায়! অবশেষে! জেলারভাই চ'লে গেলো। আমি ছুটলুম। ঊর্ধ্বশ্বাসে।

—'নারায়ণী।'

—'বলো।'

—'কখন?'

নারায়ণী বললে: 'আজ সোমবার। বিষ্যুৎবার বেলা এগারোটায় আমি হাসপাতালে থাকবো। ডান গালে কালো তিল। ভুলো না।'

—'আমার মনে থাকবে। আমার হাতে থাকবে এক গোলাপ।'

—'আমারও মনে থাকবে।'

সোম, মঙ্গল, বুধ—আমি দুপুরে খেয়ে নিয়ে ঢুলে পড়লুম ঘুমে। জেগে উঠে স্নান ক'রে নিলুম। ব'সে আছি, এমন সময় জেলারভাই হাসতে-হাসতে এসে ঢুকলো আমার গোলাপ বাগানে, তুলে নিলে কয়েকটি গোলাপ, তারপর ঘরের মধ্যে এসে আমার বিছানায় ব'সে পড়লো।

—'ফুল চাই আপনার?' জেলারভাই আমাকে জিগেশ করলে।

আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো; বললুম: 'আমিই বাগান, আর আমিই ফুল।'

—'ফল নয় তো?'

—'ফলও।'

তাকিয়ে দেখলুম, দেয়ালের ওপর দিয়ে একটা শুকনো ডাল আকাশে উঠে আসছে।

জেলারভাই বললে: 'আমি কিন্তু কোনোদিন আপনাকে আপনার সাধারণ পোশাকে দেখিনি।'

আমি বললুম: 'একটা জোব্বা আর ধুতি।'

জেলারভাই পুঁটুলিটা খুলে আমার কাচা আর ইস্ত্রি-করা জামাকাপড় বার ক'রে আনলে।

আমি বললুম: 'ও যে ময়লা হ'য়ে যাবে।'

—'পরুন তো! আমি শুধু দেখতে চাই এ-পোশাকে আপনাকে কেমন দেখায়!'

আমি বললুম: 'সব-যে ময়লা হ'য়ে যাবে।'

—'হ'লোইবা? আবার কেচে নেয়া যায় না?'

'বেশ।' আমি ধুতি প'রে নিলুম। গায়ে চাপালুম জোব্বাটা।

—'কেমন দেখাচ্ছে?' আমি জিগেশ করলুম।

—'চমৎকার।' জেলারভাই বললে। 'আপনি যেতে পারেন, মিস্টার বশীর। আপনি ছাড়া পেয়েছেন।'

আমি স্তম্ভিত। আমার চোখ দুটো যেন অন্ধ হ'য়ে গেছে। কান দুটো বধির। সারা গায়ে কেমন ঝনঝনে একটা অনুভূতি। মনে হ'লো, কিছুই যেন আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি জিগেশ করলুম: 'আমি ছাড়া পেতে যাবো কেন?…স্বাধীনতা কে চায়?'

জেলারভাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে: 'আপনাকে ছেড়ে দেবার হুকুম এসেছে। এই মুহূর্ত থেকে আপনি স্বাধীন। আপনি যেতে পারেন!'

স্বাধীন? স্বাধীন মানুষ? কে চায় স্বাধীনতা?

জেলারভাই বললে: 'বাড়ি ফিরে যাবার জন্য রাহা খরচ পাবেন আপনি—আপিস থেকে নিয়ে নেবেন। সঙ্গে নেবার কিছু আছে?'

জেলারভাই আমার পোশাকটা গুটিয়ে নিলে। তোষকের তলায় কতগুলো গল্প ছিলো, আমি লিখেছিলুম। সেগুলো সে ভাঁজ ক'রে আমার পকেটে গুঁজে দিলে। হাত ধ'রে সে আমাকে নিয়ে এলো গরাদখানার বাইরে। বাইরে এসে আমি দাঁড়ালুম আমার গোলাপবাগানে। একটা ফুল তুলে নিয়ে হাতে ধ'রে রইলুম, যেন কোনো একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছি।

দেয়ালের ওপর দিয়ে শুকনো একটা ডাল উঠে এলো আকাশে।

জেলার ভাই আমার গরাদখানার দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। নারায়ণী, তোমার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইলো।

বাড়ি ফেরার টাকা পকেটে নিয়ে, আমি জেলখানার বড়ো ফটকটা দিয়ে বেরিয়ে এলুম মস্ত বিশাল স্বাধীন জগতে।

বিশাল জেলফটকটা প্রচণ্ড একটা দড়াম আওয়াজ ক'রে আমার পেছনে বন্ধ হ'য়ে গেলো।

বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার হাতের গোলাপটার দিকে আমি অনেক, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম।

# আশ্চর্য বেড়াল

এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে সে আসলে এক চমৎকার মার্জারজাতকের কাহিনী। স্মরণাতীত কাল থেকেই জগতে কত কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। এটাকে অবশ্য অমনতর কোনো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলা যাবে না। কারণ আশ্চর্য বেড়াল জন্মেছিলো অতিসাধারণ এক বেড়াল হিশেবেই। তাহলে কেমন ক'রে সে আশ্চর্য বেড়াল হয়ে উঠলো? এই রূপবদলের মধ্যে রঙ্গকৌতুক আছে খানিকটা আর খেয়ালি কল্পনা আছে অনেকখানি। সে কি ছিলো এই জগতের প্রথমতম আশ্চর্য বেড়াল? আমার জানা নেই। যদি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা ওল্টাবার মতো ধৈর্য আর অধ্যাবসায় থাকে আমাদের, আমরা হয়তো ভূরি-ভূরি এ-রকম দৃষ্টান্ত পাবো। কিন্তু অত ঝামেলা পোহাচ্ছে কে? অতএব আশ্চর্য বেড়ালটির দর্শন পাবার এই হলো সুবর্ণসুযোগ। মন দিয়ে দেখুন: লাল-লাল চোখ, হাসি হাসি মুখ। কিন্তু কানে, পিঠে আর ল্যাজে ছোপ ছোপ খয়েরি। এছাড়া সে অবিশ্যি ধবধবে শাদাই। কাতরভাবে তাকিয়ে যখন সে মিহি স্বরে মিউ-মিউ করে, তখন তাই দেখে তাকে তুলে নিয়ে আদর না করে কোনো উপায় থাকে না।

আমার বাড়িতে এই মার্জার শাবকের আগমন সূচিত হয়েছিল শঙ্খধ্বনিতে—যে আওয়াজটা কি না হাজার শতাব্দীর পুরোনো। হয়তো স্বয়ং ঈশ্বর এই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম মুহূর্তটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনিতে। আর যে মানুষটি শঙ্খধ্বনি করতে-করতে এসে হাজির হয়েছিলো সাধারণ লোকের মনে সে ভগবানের মতোই বৃদ্ধ—লম্বা শাদা ধবধবে দাড়ি আর চুল উড়ছে হাওয়ায়।

'বাঁশি বাজাতে-বাজাতে আসে যে মুচকুনি',—আমার পাঁচ বছর বয়েসী মেয়ে তাকে তা-ই বলে। হিন্দু সন্ন্যাসীর বয়স হবে প্রায় সত্তর, অথচ তবু তাঁকে তার চাইতে অনেক কমবয়েসী দেখায়। শিশুর মতো সরল স্মিত হাসিতে ঝিকমিক করে তাঁর চোখ। এক হাতে লম্বা একটা লাঠি, আর অন্য হাতে একটা শাঁখ। কাঁধ থেকে ঝোলে একটা ঝোলা, যার মধ্যে এঁটে যায় তাঁর যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জল তাকে মেজে-ঘষে গেছে বলে রোদের মধ্যে ঝিলকে ওঠে ঐ শাঁখ।

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় আধমাইল দূরে উত্তাল সমুদ্র। তার ঢেউয়ের হাত থেকে আমাদের বাঁচবার জন্যে মজবুত একটা বাঁধ—না, না, দেয়ালই আছে। অথচ তবু বড়ো-বড়ো ঢেউয়ের বাজফাটা গর্জন শুনে ভয়-ভয়ই করে একটু।

একেকবার আমাদের বাড়িতে এলেই সন্নেসীকে আমরা ২৫ পয়সা দিই। অন্য যারা ভিক্ষে চাইতে আসে তাদের দেয়া হয় শুধু পাঁচ পয়সা ক'রে। এই হিন্দু সন্নেসীর প্রতি এমন সদয় হবার অবশ্যি বিশেষ কারণ ছিলো। কারণ আমি, নিজেও, একসময় ফকির হ'য়ে বেরিয়ে গিয়েছিলুম—সুফি ফকির। গোড়ায় আপনি আপনার মাথা আর মুখ কামিয়ে নেন, আর তারপরে একটা নেংটি প'রে ধ্যানে ব'সে যান। ধ্যান থেকে জেগে ওঠেন—বা উঠেই পড়েন—যখন ফের আপনার চুলদাড়ি গজিয়ে গেছে। তারপর খশখশে মোটা কাপড় প'রে আপনি জগতে ঘুরে বেড়াতে শুরু ক'রে দেন। আপনি তখন সবকিছুই, অথচ বিশেষ-কিছুর প্রতিই আপনার কোনো টান বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

এখন, আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে, ধ্রুপদী চিরায়ত সব সাহিত্য সৃষ্টি করবার অছিলায়, আমি একটা আরামকেদারায় ব'সে সেই স্বর্গসুখের স্মৃতিচারণ করি। কী পরিহাস! কী কৌতুক! মোটেই কোনো লেখক নই আমি, আমি যা লিখি তা মোটেই সাহিত্য হয় না। জগতের এই দূর কোণে ব'সে, আমি কাগজের গায়ে আমার সব এলোমেলো ভাবনাচিন্তা লিখে রাখি। যে-চেয়ারটায় আমি ব'সে আছি সেটা বিশ বছরের পুরোনো। কোথায় কোন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে একদিন সে ছিলো এক সুন্দর ছড়িয়ে-পড়া গাছের অংশ। সে যে কতদিনকার গাছ ছিলো—তা আমি জানি না। কালো রোজউড কাঠ। চৌকি আর টেবিলটাও রোজউডেই তৈরি। টেবিলের ওপর আছে কাগজকলম, গরম কফি ভরা একটা ফ্লাস্ক আর গেলাশ, এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স। টেবিলটাকে ঘিরে আছে দুটো চেয়ারও।

গোড়ার দিকে সন্নেসী কিছুতেই চেয়ারে বসতে চাইতেন না। পঁচিশ পয়সা পেয়েই তাড়াহুড়ো ক'রে চ'লে যেতেন। সপ্তাহে শুধু একবারই আসতেন তিনি। তারপর যতোদিন যেতে লাগলো, উনি হ'য়ে গেলেন রোজকার অতিথি, পয়সা নেবার জন্যে নয় কিন্তু—বেশি পয়সায় তাঁর কোনো দরকার বা আসক্তি ছিলো না। অনেককাল আগে তিনি গাঁজা টানতেন। আমিও গাঁজা খেতুম একসময়ে। এখন আমি বিড়ি ফুঁকি আর মাঝে-শাঝে এক-আধটা সিগারেট। তিনিও তাই। খাবার তাঁর কাছে কোনো সমস্যাই ছিলো না। পাতা, কন্দমূল, শুঁটি—সবই তিনি খেতেন।

সন্ন্যাসী থাকতেন একটা রেলওয়ে ব্রিজের তলায়। নদীর ধার ঘেঁষে যে-থামটা তারই লাগোয়া ফাঁকা জায়গাটায় তিনি তাঁর আস্তানা পেতেছিলেন। তাঁর শরীরের তিন ফুট ওপরে হবে কি না সন্দেহ—সব কাঁপিয়ে ভয়ংকর বেগে কানে-তালা-ধরানো

তীক্ষ্ণ চেরা সুরের বাঁশি বাজিয়ে ছুটে যেতো ট্রেন।

'লম্বা গাড়ি'—ট্রেনকে এই ব'লে বর্ণনা করতো আমার মেয়ে।

কোনো একটা কাগজে একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পড়বার পর আমার আর সন্ন্যাসীর মধ্যে একটা আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিলো।

স্মরণাতীত কাল থেকেই জীবন্ত প্রাণীরা এই জগতে বিচরণ করছে। তাদের কেউ-কেউ আবার পৃথিবীর বুক থেকে উধাও হ'য়ে গিয়েছে। জগতে প্রথমে জন্মেছিলো উদ্ভিদ, লতাপাতা, গাছপালা, মাছ, পাখি, অন্যসব জীবজন্তু। এইভাবেই কেটে গিয়েছিলো লক্ষ-লক্ষ বছর—তারপর, এই যেন গত পরশু, একদল বাঁদর গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো। তাদেরই কেউ-কেউ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো দু-পায়ে ভর দিয়ে : এখন তারা হাঁটতে পারে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে ছুটতেও পারে, তারপর দিনের পর দিন, ব্যবহার করে না ব'লে, তাদের সামনের পা-গুলো খাটো হ'য়ে গেলো। এবার তারা হাত ব্যবহার করতে পারে ; যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে ; এই আদি মানুষেরা গুহায় থাকতো, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পশুপ্রাণীর চামড়া দিয়ে গা ঢাকতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী চ'লে গেলো, তারপর তারা এ ওর কাছ থেকে দলছুট হ'য়ে নানা দেশে নানা তীরে এসে পৌছুলো। ঝগড়াঝাঁটি, এ ওর সঙ্গে মিলমিশ, নতুন-নতুন বিশ্বাস আর ধর্মের উৎপত্তি—এর মধ্যে দিয়ে মানবজাতি অগ্রসর হ'লো।

কাগজের মধ্যে এ-সব কথাই খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সন্ন্যাসী তা গভীর কৌতূহলের সঙ্গে পড়লেন। তারপর আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম। তিনি নিজের সম্বন্ধে সব কথা বললেন। চল্লিশ বছর হ'লো তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। অনেক ভারতীয় ভাষাই তিনি জানেন, ইংরেজিও জানেন। একটা লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিক হিশেবে কাজ করতেন তিনি, আর সেই সূত্রে অনেক বই পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর সভ্যতার বাইরের খোলশটা দেখে-দেখে শ্রান্ত হ'য়ে তিনি সন্নেসী হ'য়ে পড়েন—অনেক সাধু-ফকিরের সঙ্গে তিনি গুহায় আর মরুভূমিতে দিন কাটিয়েছেন।

কেরালার ঘন-সবুজ গ্রামগুলো যেমন হয়, তেমনি একটা গ্রামে আমার বাড়ি—লোকজন খুব একটা নেই। এখানে আমি আমার স্ত্রী আর আমার মেয়ে—কুল্লে এই তিনজন মানুষ। তারপর আছে অবোলা প্রাণী—চারটে গোরু, কিছু মুরগি, একটা কুকুরছানা আর অতিথি হিশেবে প্রায়ই গাছগুলোর ডালে ব'সে নিচে তাকিয়ে আশপাশ জরিপ করে চিল—যদি কোনো খুদে, একরত্তি, মুরগিছানা জোটে। মাঝে-মধ্যে ছোঁ-মেরে পড়ে মুরগিছানার ওপর, ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে যায়। তখন আমার স্ত্রী শাপশাপান্ত করেন কাকচিলের চোদ্দপুরুষদের এবং সাধারণত এদের পুরুষগুলোর উদ্দেশেই

গালমন্দ করেন। আমি যদ্দুর জানি, আমি আর শাদা ধবধবে লেগহর্ন মোরগটাই শুধু পুরুষ এখানে। মোরগটার সতেরোজন পরমাসুন্দরী বিবি আছে। তাকে ছানাগুলোর ওপর নজর রাখতে বলাটা মোটেই কাজের কথা নয়। আর অন্য যে পুরুষ এখানে হাজির, সে তো আমি – ধ্রুপদী সাহিত্য রচনা করার ছুতোয় আমি এখানে ব'সে থাকি।

আমাদের বাড়িতে সকলেরই অবারিত দ্বার, সকলেই স্বাগত। বিশেষত অতিথি এলে আমার মেয়ে ভারি খুশি হ'য়ে ওঠে। সন্ন্যাসী ছাড়া আরো সাতজন নিয়মিত ভিক্ষে নিতে আসে এ-বাড়িতে। তিনজন হিন্দু আর চারজন মুসলমান। সাধারণত হিন্দু ভিখিরিরা মুসলমান বাড়িতে যায় না, আর হিন্দু বাড়ি থেকে কোনো মুসলমান বাড়ি তারা অনায়াসেই চিনে নিতে পারে।

'বাড়িগুলোও "কেশধর্মেরই অংশ",' হিন্দু সন্ন্যাসী বলেছিলেন।

'কেশধর্ম!' – গোড়ায় আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। তারপর, একটু ভেবে নেবার পর, বুঝে ফেললুম। সব ধর্মেই চুলদাড়ির বেজায় কদর। কেমনভাবে কেউ চুলদাড়ি রাখে তাই থেকে তার ধর্মমতটা বোঝা যায়। কেউ-কেউ মাথা কামিয়ে ফ্যালে, কিন্তু দাড়ি রাখে। কেউ-কেউ গাল চেঁছে ফ্যালে, মাথায় রাখে টিকি…হ্যাঁ, মানুষের চুল সম্বন্ধে সব ধর্মেরই নিজস্ব কিছু কিছু বক্তব্য আছে। তবে এখন অবশ্য লোকে কেশধর্মের কব্জা থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসছে। পোশাক-আশাকেও এখন আর ধর্মরীতি অনুসরণ করছে না লোকে। হিন্দু বা খ্রিস্টান থেকে মুসলমানকে আলাদা করে চেনাই ভারি মুশকিল হ'য়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, উপাসনার জায়গাগুলো তাদের নিজেদের পরিচয় অবশ্য এখনও বজায় রেখেছে। তবে বাড়িঘরগুলো একনজর দেখে তফাৎ বোঝবার জো নেই। অবশ্য এদিককার বেশিরভাগ মুসলমান বাড়িতেই দরজা-জানলা গাঢ় সবুজ রঙে রাঙানো থাকে। কাজেই হিন্দু ভিখিরিরা সেখানে আর যায় না। তাদের কি সবুজ রং পছন্দ নয়? না, কারণ তারা জানে যে সে-সব বাড়ি থেকে তারা কিছু পাবে না।

কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ও অন্যান্য হিন্দু ভিখিরি কিন্তু আমাদের বাড়ি আসে। তার কতগুলো কারণ আছে।

আমরা যখন বাড়িটা কিনেছিলুম তার দরজাজানলা সবুজই ছিলো। আমি ঘ'ষে-ঘ'ষে চলটা সরিয়ে দেখি সেগুলো রোজউডে তৈরি। এমন নয় যে সবুজ রং আমি অপছন্দ করি। গাছপালা, লতাপাতা, উদ্ভিদ, সবুজ মাঠ – এদের মধ্যে সবুজ রংকে আমি প্রায় পুজোই করি। কিন্তু রোজউডকে রোজউডই থাকতে দেয়া হোক না কেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সব দরজা-জানলা থেকে সবুজ রং তুলে দিয়ে তাদের পালিশ ক'রে দিয়েছিলুম। সারা বাড়িটা সাফসুতরো ক'রে দেয়ালগুলোয় চুনকাম করিয়ে

নিয়েছিলুম। যে-কুয়োটা থেকে খাবার জল আনা হ'তো তার দশা ছিলো আরো শোচনীয়। এখানকার হিন্দু-মুসলমান সবাই কুয়োর ধারে ব'সে স্নান করে। জামাকাপড় ধোয়, গা মাজে, আর নোংরা জল ফের গড়িয়ে পড়ে কুয়োয়। মেয়েরা এখান থেকেই রান্নার জল তোলে। কুয়োটা থেকে একটু দূরে কোথাও গিয়ে স্নান করা যায় না কি ? নোংরা না ক'রে জল তুলতে পারলেই ভালো হয় না কি ?

জল নোংরা হবে কী ক'রে, জলে তো মাছ আছে – এই ছিলো লোকের মত : তারা আমার অজ্ঞতা দেখে হেসেই বাঁচে না।

আমাদের কুয়োর জল যখন সব বার ক'রে ফেলা হ'লো অনেক মাছও ধরা পড়লো। এক গামলা জলে সেগুলোকে জিইয়ে রাখা হ'লো। নোংরা আর কাদার তালের মধ্যে কুয়োর তলা তার বহুবিধ ইতিহাসও খুলে বললে। পুরনো বাসনকোশন, কাপড়ের টুকরো, বোতল – তার মধ্যে তালপাতায় কত-কী মন্ত্র লেখা – এবং আরো-সব হরেক রকম পুরাকীর্তি

কুয়োটা যারা সাফ করেছিলো তাদের আমি মাছগুলো দিয়ে দিলুম। ব্যাপারটা তারা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

'কুয়োয় আবার এগুলো ছেড়ে দেবেন না ?'

'না।'

'তাহ'লে জল পরিষ্কার আর টলটলে থাকবে কী ক'রে ?' তার কোনো জবাব আমার জানা ছিলো না। তারা হেসে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মাছগুলো নিয়ে চ'লে গেলো। আমি কুয়োর নিচে এক আস্তর শাদা মিহি বালি ছড়িয়ে দিলুম। একঘণ্টার মধ্যে জল উঠে এলো চার ফিট, স্বচ্ছ নীল টলটলে জল।

উঠোনে অনেক গাছ ছিলো। এ সব গাছে পাখিরা থাকে। জায়গাটার মধ্যে যেন অরণ্যের শান্তি মাখানো। এখানে ব'সে ধ্যান করতে পারে কেউ অথবা ব'সে-ব'সে লিখতে পারে – কেউ বিরক্ত করবে না। যেদিকেই তাকানো যাক না কেন ফুল ফুটে আছে, আছে সৌন্দর্য, বাহার। তবে জায়গাটা পুরোপুরি চুপ নয় মোটেই। পাখিরা কিচিরমিচির করে। আর ভাগ্যবতী সব মহিলারা অনর্গল কথা ব'লে স্বর্গের এই স্তব্ধতাকে ভেঙে দেন।

আশপাশের পুরুষরা সবাই কাকভোরে কাজে চ'লে যায়। ব'সে থাকে শুধু বেকার লোক ; পুরুষদের মধ্যে শুধু আমি একাই থাকি সারাক্ষণ। লেখাকে আশপাশে কেউ কোনো কাজ ব'লেই গণ্য করে না। আমিও তো কাজ করছি, আমায় বিরক্ত করবেন না। কিন্তু আমার এ-কথা বিশ্বাস করবে কে ? কেই বা তার তোয়াক্কা করে ?

যেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠি, কুঁকড়োটা লাফিয়ে উঠে পড়ে চেয়ারে। আমাকে

সে একফোঁটাও রেয়াৎ করে না, সম্মান তো দূরের কথা। সে হ'লো আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কাজেই তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অনুযোগ করার অবকাশ নেই। আর আমার চাইতে সে ঢের বেশি মান্যগণ্য, কারণ তার মুখ থেকে টুঁ শব্দ বেরুলেই তার সতেরোজন সুন্দরী বউ ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হয়। আর আমি, আমার তো কেবল আছেন আমার মেয়ের মা, কুল্লে একজন সবেধন, অতএব ব্যাপার চলেছে এই রকমই।

এবার যেই মনে-মনে প্রার্থনা ক'রে কাগজে কলম ছুঁইয়েছি, অমনি 'তাত্তো' আমার কন্যা আমায় ডাক দেয়। সে একটা যথার্থ নালিশ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। তার পাঁচ বছর বয়েসী দুঃখশোক জগতের গভীর এক সমস্যাকে বিপজ্জনকভাবে উঁচিয়ে রেখেছে—যেন কোনো আণবিক বোমা থেকে ধোঁয়া উঠছে—এই বুঝি ফেটে পড়ে: খেলার কোনো সাথী নেই যে তার!

কী তবে করা? বাঁশি, রবারের বল, পুতুল, ছবির বই, রান্নাবান্না খেলার সরঞ্জাম, একটা বাচ্চাদের সাইকেল—সবকিছুই তার আছে। এ-সবকিছু দিয়েই খেলতে পারে সে। কিন্তু সে এর কোনোটাই চায় না—এ-সব নিয়ে খেলে-খেলে সে ক্লান্ত হ'য়ে গিয়েছে। সে চায় তারই সমবয়সী ছেলেমেয়ে, যাদের সঙ্গে খেলতে পারবে; তাদের সঙ্গে চেঁচিয়েমেচিয়ে হুল্লোড় ক'রে বালির ওপর গড়াগড়ি খেতে চায়। হায় ভগবান! ইয়া ভগবান! এখন এর জন্যে আমি ছেলেমেয়ে পাই কোথায়?

যখনই একটু ফুরসৎ মেলে, আমি বা আমার স্ত্রী তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিই।

কিন্তু আমার স্ত্রীর হাতে অজস্র কাজ। বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই, তাই তাঁকে বাড়ি সাফ করতে হয়, বাসন মাজতে হয়, উঠোন থেকে কাঠকুটো জোগাড় করতে হয় উনুন ধরাবার জন্যে, রান্নাবান্না করে সকলকে পরিবেষণ করতে হয়, আর তার ওপর তাঁকে দেখাশুনো করতে হয় মুরগিগুলোর, গোরুগুলোর, কুকুরছানাটির। এদিকে আমি যখন মহৎ সাহিত্য রচনা করতে যাচ্ছি, আমাদের নয়নের মণি আদরের দুলালী কন্যা আমায় ডেকে বলে তার 'কোকনচট্টম' খেলার সঙ্গী হ'তে। উঠোনের বালিতে সে চৌকো-চৌকো খোপ কেটে রেখেছে, এখন আমাকে এক ঠ্যাঙে তাদের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে এপার-ওপার যেতে হবে। কখনও-কখনও লাইনের ওপর পা দিয়ে আমি এক্কাদোক্কা খেলার নিয়ম ভেঙে ফেলি—আর বেচারা আমার দিকে অনুযোগের চোখে তাকায়। আসলে খেলায় আমি মনই দিতে পারি না। আমিই কেন রান্নাঘরে গিয়ে রসুই পাকাই না? ওর মা আসুক বরং, এসে ওর সঙ্গে খেলুক।

'আম্মা কোথায়?' আমি ওকে জিগেশ করি।

'আম্মা কথা বলছেন,' ও জবাব দেয়।

হুম, আম্মা তখন বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে পাড়ার ভাগ্যবতীদের সঙ্গে গল্প করছেন। ঐ তো, সকলেই এসে হাজির—রাজালা, খাদিজা বিবি, সৌমিনী দেবী। প্রত্যেকেরই বাড়িতে শতগণ্ডা কাজ। কিন্তু মেয়েরা তো মেয়েই। তাদের হাজারগণ্ডা বিষয়ে কথা বলবার থাকে।

'সোনা,' আমি অনুনয় ক'রে বলি, 'তাত্তোকে তো একটু লিখতে হবে। যাও, মাকে গিয়ে বলো তোমায় একটু দোলনায় চড়িয়ে দোল দিতে।'

'তাত্তো,' আমার মেয়ে আমাকে মনে করিয়ে দেয়, 'তুমিই তো বলেছিলে উঠোনে সাপখোপ কেঁচোকেন্নো আছে—একা যেন না-যাই। আর এখন ?'

তাও তো বটে, এও তো মেয়েই। কিছু করা বা না-করার হাজারটা যুক্তি হাজারটা কৈফিয়ৎ এ খাড়া ক'রে দেবে।

আমি লেখা থামিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠে পড়লুম। ঠিক তক্ষুনি শাদা লেগহর্ন কুঁকড়োটি আমার জায়গায় বসবার জন্যে এগিয়ে এলো।

'ভাগ...' আমি তাকে তাড়া ক'রে গেলুম। 'হতচ্ছাড়া কুঁকড়ো, তোকে আর তোর সতেরো বউকে দিয়ে আমি একটা খাশা কালিয়া বানাবো।'

আমাকে এইভাবে ফেটে পড়তে দেখে আমার মেয়ে আমায় ভয় দেখালে, 'আম্মাকে আমি ব'লে দেবো।'

'যা, গিয়ে বল তোর আম্মাকে। আমি সবাইকে দেখে নেবো—মুরগিগুলো, গাইগোরু, ছাগল, কুকুরছানা, মা আর মেয়ে—কাউকে বাদ দেবো না।'

পাঁচ বছর বয়সী চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠলো। সে ঘ্যানঘ্যান শুরু ক'রে দিলে : 'সব বাড়িতেই কত ছোটো ছেলেমেয়ে আছে। এখানে আছে শুধু একজনই। অথচ তাত্তো বলছে কি না আমায় দেখে নেবে !'

ঘ্যানঘ্যানানিটা পরক্ষণেই ফেটে পড়লো হাপুশ নয়নে কান্নায়।

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ফের চেয়ারে ব'সে পড়লুম।

'সোনামণি, তাত্তো তো কেবল ঠাট্টা করছিলো।'

তারপর গলার স্বর চড়িয়ে আমি আমার স্ত্রীকে ডাক দিলুম।

কোনো সাড়া নেই। তিনি হয়তো ঠিকই শুনেছেন আমাকে, কিন্তু আদৌ কোনো পাত্তা দেননি। শাদা লেগহর্ন কুঁকড়োটি এসে আমাকে চার-পাঁচবার ঠোকর দিলে, গোরুটা আমাকে দু-বার তাড়া ক'রে এলো।

অপমানিত হয়ে আমি আরো জোরে ডাক দিলুম আমার স্ত্রীকে।

কোনো জবাব নেই। সেই দূর অতীতের চমৎকার দিনগুলোর জন্যে আমার ভারি আপিশোশ হ'তে লাগলো, কী চমৎকার ছিলো সেই দিনগুলো, স্বামীরা স্ত্রীর চুলের মুঠি

ধ'রে টেনে বেশ ক'রে হাতের সুখ ক'রে নিতে পারতো।

যত জোরে পারি গলা ফাটিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বারে-বারে ডাকতে লাগলুম।

'অ্যা ?' যেন সমুদ্রের পশ্চিম তীর থেকে তাঁর স্বর প্রতিধ্বনি সমেত ভেসে এলো নবম ডাকের পর। তারপর তিনি এসে হাজির হলেন, নিজের সুবিধে বা মর্জিমাফিক মধুর ভঙ্গিতে।

'মেয়েটার দিকে তোমার একটু মনোযোগ দেয়া উচিত,' আমি তাঁকে শাসিয়ে বললুম। 'কোনো খেলার সাথী নেই বেচারার। এ হচ্ছে সত্যাগ্রহের আমল। আমাদের জীবিত ও মৃত মহামান্য নেতারা কেবল এ-অস্ত্রটাই উত্তরাধিকার হিশেবে আমাদের দিয়ে গেছেন। যে-কোনো বিষয়ে যে-কারু বিরুদ্ধে একে কাজে লাগানো যায়। কাজেই একটু সাবধান থেকো। আমাদের মেয়ে আমাদের সদর দরজার সামনে ধরনা দিয়ে ব'সে সত্যাগ্রহ করবে, যদ্দিন-না তার বাবা-মার ধরনধারণ পালটাচ্ছে, আমৃত্যু অনশন ক'রে যাবে।'

'আমি ওর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবো—নির্ঘাৎ। লাই পেয়ে-পেয়ে মেয়েটা মাথায় চড়েছে।'

চমৎকার সমাধানই বটে! আণবিক বোমা আর স্পুটনিকের যুগে একটা বাচ্চা মেয়ের দেখাশুনো করবার কী খাশা রীতি!

'আম্মা আমাকে শাসাচ্ছে, তাত্তো। তুমি শুনতে পাওনি ?' মেয়ে আমায় জিগেশ করলে।

'এ নিয়ে আর মাথা ঘামাসনে', মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললুম: 'তুমি রাজনীতি কিছুই বোঝো না। এখানে রাজনীতি তো কুটিরশিল্পের মতো, ঘরে-ঘরে কত বেকার নেতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই তারা যেখানে খুশি ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়। আমাদের মেয়ের দাবি একবার শুনতে পেলে তারা কি আর চুপ ক'রে থাকবে ? আমাদের মেয়েকে সমর্থন ক'রে ওরা স্লোগান দিতে-দিতে ধেয়ে আসবে—আর মেয়ে তো দরজায় ধরনা দিয়ে পড়ে শুধু উপোশ করবে। চারপাশে তখন হৈ-হৈ হুলুস্থুল প'ড়ে যাবে। তুমি তখন করবেটা কী ?'

'তুমি কী করবে ?'

'আমি ? আমি প্রগতি আর বিপ্লবে বিশ্বাস করি, অতএব আমি গিয়ে মেয়ের দাবির সমর্থনে তাদের দলে যোগ দেবো।'

'শুনি, কী ওর আহ্লাদ ? কী দাবি ওর ?' স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে এবার একটু উৎকণ্ঠাই বুঝি শোনা গেলো।

'ও একজন খেলার সাথী চায়।'

স্ত্রী চারপাশে ঘুরে তাকালেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে বোবা প্রাণীগুলোই কেবল আমাদের কথা শুনছে। সে-বিষয়ে নিশ্চিত হ'য়ে যেন জগতের সবচেয়ে গোপন কথাটি ফাঁস ক'রে দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে আমার স্ত্রী বললেন : 'তুমি কি জানো না যে আমি পোয়াতি ? তিন মাস হ'লো গর্ভ হয়েছে ?'

আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম।

'সে-কথাই কি মেয়েকে বলবো ? আর তার সমর্থনে যে-রাজনৈতিক নেতারা আসবে, তাদের ?' আমি জিগেশ করলুম।

'তাহ'লে করবোটা কী ?'

'কোনো একজন পড়শির বাড়িতে ওকে নিয়ে যাও। গলিটায় কত হিংস্র জীবজন্তু আছে—গোরুমোষ, শেয়াল, ফেউ, সাপখোপ। কাজেই ওর সঙ্গে একটু যাও, ও গিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু খেলুক।'

স্ত্রী মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে আবার বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহিলাদের সঙ্গে তাঁর একটা অধিবেশন হ'লো। ঘণ্টাখানেক পরে মা ও মেয়ের পুনরাগমন, নতুন একটা পরিকল্পনায় তাদের মুখচোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।

'মেয়েটা তো একটা বেড়ালছানা নিয়েও খেলতে পারে।'

'কী সোনা, তাতে হবে তো ?' আমি মেয়েকে জিগেশ করলুম।

'হ্যাঁ, খেলা করবার জন্যে আমার একটা ধবধবে শাদা বেড়ালছানা চাই।'

'শাদা ধবধবে একটা বেড়ালছানা আমরা জোগাড় ক'রে নিতে পারবো,' স্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিলেন।

বেশ। এবার শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো আর আমাকে অমনভাবে বিরক্ত করবে না। আমি গিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা করবার জন্যে চেয়ারে বসতে যাচ্ছি এমন সময়...

'নিন, সরুন,' ইনি হলেন শ্রীমতী রাজালা, আমার স্ত্রীকে ডাকতে এসেছেন। একরত্তি একটা শাদা বেড়ালছানাকে বুকে জড়িয়ে তিনি এসে হাজির হয়েছেন, আমার পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মধুরভাবে একটুখানি হাসলেন।

আর ঠিক তখনই হিন্দু সন্ন্যাসী শঙ্খে ফুঁ দিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতির কথা ঘোষণা করলেন।

হিন্দু সন্ন্যাসী চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌমিনীদেবী আর খাদিজাবিবি এসে হাজির আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে দুজনেই তারপর অন্দরে চ'লে গেলেন।

এইভাবেই অবশেষে আমার মেয়ের একজন খেলার সাথী জুটলো। খাশা আছে

সব। এখন আমি মহৎ সাহিত্য রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি। কিন্তু সন্ন্যাসীর শঙ্খধ্বনি মিলিয়ে যাবার পরও চিন্তার রেশ থেকে গেলো। এ-শব্দ যেন হাজার বছরের দেয়াল ভেদ ক'রে আসছে···আসছে পাহাড় থেকে...গভীর অরণ্যের মর্মমূল থেকে...মন্দির-দেবালয়ের গোপন গর্ভগৃহ ঘুরে অবশেষে তা এসে পৌঁছেছে আমার এই দীন কুটিরে। এখানে এই-যে বাড়িটা এখন দাঁড়িয়ে, সেখানে এককালে নাকি টিপু সুলতানের শিবির ছিলো। তখন এখানে ছিলো একটা ময়দান, আর টিপু সুলতানের পদাতিক ও ঘোড়-সোয়ার বাহিনী নাকি এখানে তখন কুচকাওয়াজ করতো। মৈশুর শার্দূল টিপু সুলতান!

সব শার্দূলই এখন মারা গেছে; বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে—কিংবা গেছে ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নিতে। জমির টুকরোটার দলিল আছে অনেক, তাতে আছে রানী ভিক্টরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড আর পঞ্চম জর্জের নাম-ছাপা কত ইস্টাম্প কাগজ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নাকি এ-রকমই কথিত আছে, সূর্য কখনও অস্ত যায় না। কিন্তু এই জমির টুকরোর ওপর ব্রিটিশ সূর্য চিরকালের মতো ডুবে গিয়েছে। কেননা সূর্যকে তো ডুবতেই হয় একদিন, সবখানেই। এই পৃথিবীর সব জমিজিরেতেরই নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে তার বিবর্তনের নিজস্ব আখ্যান। গাছপালা গজায়, মানুষ থাকতে আসে···এ-সব তথ্য বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে খেলে গেলো। ইতিমধ্যেই আমি বেড়ালছানার কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। অবশ্য বেড়ালছানাটা মোটেই আমার সমস্যা নয়, অতএব আমি লিখেই চললুম। আমার কলম থেকে অনর্গল বেরিয়ে এলো কথা, ঝ'রে পড়লো কাগজের ওপর। তারপর আচমকা ভেতর থেকে ডাক আসতেই আমার চিন্তার স্রোতে বাধা প'ড়ে গেলো।

'একটু ভেতরে আসবে?'—আমার স্ত্রী।

'কী ব্যাপার?'

'বেড়ালছানার জন্যে নাম বেছে দেবে।'

কী আব্দার! কী দুঃসাহস! বিশ্বসাহিত্যের মহৎ রচনাগুলো সৃষ্টি করবার কাজে ব্রতী একজন লেখককে গিয়ে এখন একটা নোংরা বেড়ালের নাম দিতে হবে! মনের ভেতর উষ্মা আর রোষ পেচিয়ে উঠছে, আমি লেখা থামিয়ে সোজা টানটান হ'য়ে ব'সে রইলুম। তখনই আরো ঠিক করলুম যে আবারও গোঁফ রাখবো আমি, গোঁফ ছাড়া কোনো মুখ দেখে কখনোই খুব গম্ভীর ঠেকে না। আজকাল আর লোকে আমায় শ্রদ্ধাভক্তি করে না। অনেক বছর আগে আমার ছিলো ভগৎ সিং-মার্কা একজোড়া গোঁফ: সেই যে হাজার-হাজার নরনারী ভারতের স্বাধীনতার বেদিতে তাদের রক্ত আহুতি দিয়েছে—আমি তাদের আত্মার মঙ্গল ও শান্তি কামনা করি। আর তাদের স্মৃতিতে আবার আমি একজোড়া গোঁফ গজাবো।

'তোমরা মেয়েরা যদি বেড়ালছানার একটা নাম ঠিক ক'রে দাও, তাহ'লেই হবে। আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি হবে না।' ভেতরে যারা আছে তাদের শুনিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললুম।

'যেন আমরা তোমার অনুমতি চাচ্ছিলুম... ?' ভেতরে হুমকি উঠলো।

এটা কি নালিশ কোনো, না আপত্তি-অনুযোগ, না প্রতিবাদ? যা খুশি হোক। মেয়েরা সবাই বেড়ালছানাটার হবু নাম নিয়ে উত্তেজিতভাবে ব্যস্ত হ'য়ে আলোচনা করছে।

শ্রীমতী রাজালার গলা: 'মালু, সৌমু, মৃণালিনী, তিলোত্তমা, সরস্বতী, ইন্দিরা, পার্বতী, দময়ন্তী, ভার্গবী, সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী, শোভনা, শান্তা, দাক্ষায়ণী—কোন্‌টা তোমাদের পছন্দ?'

'রাজালাও নাম দেয়া যায়,' সৌমিনীদেবী হেসে বললেন।

অধিবেশন হঠাৎ এখন চুপচাপ হ'য়ে গেছে। শুকনো পাতার ফাঁকে পোকা খোঁজা থামিয়ে শাদা লেগহর্ন কুকড়ো হাঁক দিলে, 'কোকর-কোঁ'...তার সব কটা বউ—সতেরোজন—অমনি অনুগত বশম্বদভাবে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। মুহূর্তের মধ্যে তারা উই-পোকাগুলো ঠোকরাতে শুরু ক'রে দিলে—কুঁকড়ো তাদের আবিষ্কার করেছে। আমি কুঁকড়োর ঈর্ষায় সত্যি কাতর হ'য়ে পড়লুম।

'না, আমি এর জন্যে কোনো হিন্দু নাম চাইনে,' খাদিজা বিবি স্তব্ধতা ভেঙে ব'লে উঠলেন। 'এ আমার বাড়িতে জন্মেছে। চারটে বেড়ালছানার মধ্যে মাত্র এইটেই বেঁচে আছে—সবেধন। এর একটা মুসলমানি নাম চাই।'

খাদিজা বিবির অকাট্য যুক্তি শুনে কেউ আর কোনো আপত্তি করলে না। তবু তিনি ব'লে চললেন: 'আল্লাহ্‌ না-করুন, এখন যদি বেড়াল ছানাটা ম'রে যায়—কোথায় যাবে ওর আত্মা? দোজখেই তো: না, তাতে কোনো সন্দেহ আছে?'

উঁহু, কারুই কোনো সন্দেহ নেই এতে।

'কাজেই এর আত্মাকে যদি বেহেস্তে যেতে হয়, তবে এর একটা মুসলমানি নাম চাই।' খাদিজাবিবি দম নেবার জন্যে একটু থেমে তারপর বললেন, 'কাইসু, কাইসুম্মা কাইসুমোল! বেড়ালটাকে এই নামেই ডাকা উচিত।'

সবাই খুব খুশি। কারুই কোনো আপত্তি তোলবার সাহস হ'লো না। কিন্তু আমি যে-আমি আবার আমার গোঁফ গজাবো ব'লে ঠিক করেছি, আমি সাহস ক'রে আমার আপত্তি জানালুম।

'হুম! এ বাড়িতে মেয়েদের সংখ্যা বড্ড বেশি! সতেরোটা মুরগি, চারটে গাইগোরু, একটা কুকুরী, মেয়ে, মেয়ের মা। এখন আবার একটি মেনি বেড়াল।

মেয়েরা দেখছি হুড়মুড় ক'রে গুনতিতে বেড়ে যাচ্ছে !'

আমার প্রতিক্রিয়াটা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতোৎসারিত, কিন্তু তবু মেয়েদের মনের মধ্যে তা গিয়ে ঠিক-ঠিক লক্ষ্যভেদ করলে। আমার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তিন-তিনজন মহিলা আর আমাকে দেখে কোনো হাসি তো উপহার দিলেনই না, বরং প্রায় ভস্ম ক'রে ফেলবার মতো অগ্নিবর্ষী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হুড়মুড় ক'রে হেঁটে চ'লে গেলেন।

আমার কন্যা কাইসুকে কোলে ক'রে এসে হাজির হ'লো।

বেড়ালছানার গলায় শাদা পুঁতির একটা মালা জড়ানো, তাছাড়া গলায় লাল ফিতে দিয়ে একটা ফুল বাঁধা।

'কাইসুমোল, ছ্যাখো-ছ্যাখো আমার তাত্তো,' কন্যা আমার সঙ্গে বেড়ালছানার পরিচয় করিয়ে দিলে।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালুম একটু। তারপর আচমকা আমি একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো ডেকে উঠলুম : 'ভৌ।...ভৌ!'

'মিঞাও!···মিঞাও!' বেড়ালছানা জিগেশ করলে।

'ভয় পাসনে, কাইসু,' আমার কন্যা তাকে সান্ত্বনা দিলে, 'তাত্তো কেবল ঠাট্টা করছে একটু।'

পরক্ষণেই অকুস্থলে আমার স্ত্রীর আবির্ভাব। কোনো প্ররোচনা বিনাই তিনি তপ্তলাল একটি দৃষ্টি উপহার দিলেন আমায়। মারাত্মক এই দৃষ্টি মেয়েদের চোখ থেকে তীরের মতো ছুটে আসে, ফিনকি দিয়ে বেরোয়, ঝলসে ফ্যালে।

হিংস্র যে ভয়ংকর গোঁফজোড়া আমি গজাতে যাচ্ছি তার কথা মনে ক'রে আমি জিগেশ করলুম : 'এই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির মানে কী শুনি ?'

'মেয়েরা যদি হুড়মুড় ক'রেই সংখ্যায় বাড়ে- তবে পুরুষদের তাতে কীসের ক্ষতি ?' স্ত্রী বললেন একদমে, তাঁর রোষ একেবারে উপচে পড়ছে।

তাঁর মনের মধ্যে বেড়ালছানাটাই ব'সে আছে। এখন আমার দীনদুঃখী জীবনটাতেও বেড়ালছানাটা ঢুকে পড়েছে একগাদা ঝামেলা পাকিয়ে।

'মেয়েরা যদি ছ্যাথ-ছ্যাথ ক'রে সংখ্যায় বেড়ে যায় তাহলে পুরুষদের তাতে ক্ষতি কী ?'—জিগেশ করেন আমার স্ত্রী, 'এই-তো এখনই পুরুষদের চাইতে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি। তা এই বাড়তি মেয়েরা করবেটা কী, শুনি ?' কিন্তু আমি চুপ ক'রেই রইলুম। মেয়েদের সঙ্গে খামকা তর্ক ক'রে কী লাভ ?

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে উঠোনে বেরিয়ে এলুম। পরম সুখে একা-একা ঐ শান্ত পরিবেশে ঘুরতে-ঘুরতে আমি ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা গাছগুলোর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিই।

'ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি আপনারা, আপনাদের আদাব জানাই। বলা হয় যে গাছেরও প্রাণ আছে, গাছেরও নাকি আত্মা আছে। তা কি সত্যি?'

'কার সঙ্গে কথা বলছো?' স্ত্রী চুপচাপ আমার পেছনে-পেছনে অনুসরণ ক'রে এসেছিলেন আমার কথা শুনে জিগেশ করলেন।

'মেয়েরা যে কেন সবসময় পুরুষদের পেছনে ধাওয়া করে?' আমি জিগেশ করলুম।

'আমার খুশি।'

'না। আগে মেয়েরা পুরুষদের লেজুড় ছিলো বটে, তবে এখন আর না,' আমি তাঁকে বলি, 'এবার মন দিয়ে শোনো। মানুষের দৃষ্টি কী ক'রে হ'লো, সে-সম্বন্ধে বলছি শোনো। গোড়ায় ঈশ্বর একজন পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন।'

'কয়েকদিন আগে তুমিই না বলেছিলে ঈশ্বর সব আগে একজন মেয়ে সৃষ্টি করেছিলেন!'

'সে-কথা ঠিক ব'লে আমার মনে হয় না। গভীর চিন্তাভাবনা এবং ততোধিক গভীর গবেষণার পর এখন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। এখন দোহাই তোমার, কোনো বাধা না-দিয়ে শোনো।'

'এ যদি মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা হয় তবে আমি শুনতে চাই না।'

'তাহ'লে শুনো না। গাছ, পাখি, সিন্ধু, জল—আপনারা সবাই শুনুন। একেবারে গোড়ায় ইডেন উদ্যানে ছিলো শুধু আদম। স্বাধীন, মুক্তপ্রাণ, নিরুদ্বেগ—সে সেখানে পরম সুখে ছিলো, তোফা আরামে। কোনো চোখের জল নেই, কোনো ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান নেই, কোনো শাপশাপান্তও নেই, কোনো বাধাও নেই। সে ছিলো দারুণ সুখে, তোফা আরামে, চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। তবে তার সামান্য একটু অসুবিধে ছিলো, মেরুদণ্ডের তলার দিকটা কেমন যেন বেরিয়ে থাকতো। দৌড়ুবার সময় তার লম্বা ল্যাজটা বেজায় ঝামেলা পাকাতো। একদিন আদম ঈশ্বরকে ডেকে বললে: হে আমার স্রষ্টা, এ-রকম অদরকারি লেজুড়টা খামকা আমায় দিয়েছেন কেন? শুনে ঈশ্বর আমাদের ল্যাজটা কেটে ফেললেন।'

'তারপর?'

'দিনের পর দিন—অনেক দিন—ল্যাজটা ইডেন উদ্যানে প'ড়ে রইলো। সিংহ, ভালুক, ময়াল সাপ, কুমির—সবাই এসে সেটার গন্ধ শুঁকলো, কিন্তু সেটাকে খেতে আর তাদের সাহস হ'লো না। তো এই ল্যাজটাকে নিয়ে কী করা যায়। ঈশ্বর সেটাকে মন্ত্রপড়া পবিত্র জলে চোবালেন। তার গায় তিনি মাখিয়ে দিলেন গান, মালিশ ক'রে দিলেন মধু। কয়েক ফোঁটা বিষও ছিটিয়ে দিলেন তার ওপর, আর তারপর তাকে গোলাপের আতরে চুবিয়ে দিলেন। এইভাবে অবশেষে তাকে তিনি এক পরমা সুন্দরী তরুণী

বানিয়ে দিলেন, পৃথিবীর প্রথম নারী।'

'মিথ্যে কথা!' ভয়ংকর অগ্নিবর্ষী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে স্ত্রী বললেন, 'ডাহা মিথ্যে!'

আমি বাধা পেয়েও কোনো পাত্তা দিই না: 'সেজন্যেই মেয়েরা সবসময় পুরুষদের পেছন-পেছন ল্যাজের মতো লেপটে থাকে।'

গল্পটায় বিষম প্ররোচনা ছিলো, তাতিয়ে দেবার চেষ্টা ছিলো, আমার স্ত্রী কলকণ্ঠে প্রায় চাবুকের মতো শপাং ক'রে আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন। অনেক প্রস্তাব, তথ্য সমালোচনা ও দ্বৈরথের আহ্বান আমার দিকে ছোঁড়া হ'লো। কিন্তু আমি তার কোনো পরোয়াই করলুম না। কোনো মেয়ের সঙ্গে লড়াই করবার সেরা পদ্ধতি তার কথায় আদৌ কর্ণপাত না-করা।

শেষটায় যখন ঝড়-তুফান ও হুলুস্থুল কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লো, আমরা গিয়ে আম গাছের গায়ে বাঁধা দোলনাটার কাছে পৌছলুম। দোলনটায় কেউ ছিলো না তখন। আমি ভাবলুম একটু দোল খাওয়া যাক।

দোলনাটায় ব'সে আমার যাবতীয় পৌরুষসামর্থ দিয়ে মস্ত একটা ধাক্কা দিলুম আমি, আর অমনি—হায় কপাল!—আমি উপুড় হ'য়ে ধপাস পড়লুম মাটিতে। কেমন ক'রে যে এই পপাত ধরণীতলে হয়েছিলুম তা আমি আজও জানি না। দড়ি ছিঁড়ে যায়নি, যে-ডালে তা বাঁধা ছিলো সেটাও ভাঙেনি। আমার সেই করুণ দশা যা থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি জগতের সব স্ত্রীলোক আমায় নিয়ে হো-হো ক'রে পাগলের মতো হাসছে।

'এই হয়, মেয়েদের নামে বাজে কথা বললে অমনি হাতে-নাতে ফল পেতে হয়।' এই ব'লে, আমার স্ত্রী একটু উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'লেগেছে?'

কেন খামকা ওঁকে উত্তর দেবো? বেকুবি আর লজ্জায় আমার তখন বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ হাঁটতে-হাঁটতে ভাবলুম এ দোলনাটা থেকে হঠাৎ আমি এভাবে পড়লুম কেন? হয়তো কোনো ভূত আমায় ধাক্কা দিয়েছিলো, না-না ভূত নয়, পেত্নি কিংবা শাঁকচুন্নিই হবে বোধহয়।

চুপচাপ হেঁটে আমরা কুঁড়েঘরটায় এসে পৌছলুম; আমাদের মেয়ে সেখানে বেড়ালছানাটাকে নিয়ে খেলছে। এই কুঁড়েঘরটার উদ্ভব হয়েছে পাড়ার মেয়েদেরই মগজ থেকে। বাচ্চাটা খেলবার একটা জায়গা পাবে, এই ছুতোয় তাঁরা ঘরটা তুলে নিজেদের একটা আড্ডাখানা বানিয়ে নিয়েছেন—সেখানে ব'সে-ব'সে এ ওর চুল থেকে উকুন বাছতে-বাছতে তাঁয়া সারাক্ষণ বকবক ক'রেই যান, কী যে বলেন তা তাঁরাই জানেন।

এখন অবশ্য আমার মেয়ে আর কাইসু—অর্থাৎ বেড়াল ছানাটি—ঐ চালাটার

তলায় ব'সে খেলা করছে। ওপরে তাকিয়ে দেখি আমগাছটার ডাল বেয়ে যে-লম্বা লতা পেঁচিয়ে উঠেছিলো তা থেকে দুটো মস্ত ধূসর চালকুমড়ো ঝুলছে।

'কুঁড়েটা থেকে বেরিয়ে এসো, সোনা,' মেয়েকে ডেকে বললুম, 'ওখানে তোমায় থাকতে হবে না। ঐ চালকুমড়ো দুটো হয়তো তোমার আর কাইসুর মাথায় ছিঁড়ে পড়বে।'

বেড়ালছানাকে কোলে তুলে নিয়ে মেয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে। উঠোনে এসে দেখি শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো দিব্যি আমার চেয়ারে বসে ঘুম লাগাচ্ছে।

ইচ্ছে হ'লো, বেদম একটা লাথি কষাই কুঁকড়োটাকে। আমার মনের ভাব আন্দাজ ক'রে স্ত্রী বললেন : 'ওকে কিছু কোরো না। ওকে নিজের মতো থাকতে দাও। বেচারা —ও একা, আর ওর এতোগুলো।'

'ওর এতগুলো' মানে কুঁকড়োর সেই সতেরোজন বিবি। সত্যি, করুণাই হয় ওকে, আমি মানতে বাধ্য হলুম। যদি কোন মুরগি হ'তো তো এমন একটা লাথি কষাতাম যে এক লাথিতেই সে মণ্ড হ'য়ে যেতো। কিন্তু এতো পুরুষ ; আমার তো একে শ্রদ্ধা-ভক্তিই করা উচিত। ফলে আমি বাঁধানো দাওয়ায় বসে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করলুম। শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো মহোদয় তাঁর চোখ আধখানা খুললেন, তারপর ফের তাঁর দিবানিদ্রা লাগালেন।

সতেরোটা মুরগির ডিমগুলোর একটাও আমার বরাতে জোটে না। সব তা দিয়ে ছানা পাড়াবার জন্যে রেখে দেয়া হয়। শাদা লেগহর্নের বউয়েরা সবাই দিশি মুরগি, কাজেই এ ডিমগুলো থেকে যে-সব ছানা বেরুবে, তারা হবে দো-আঁশলা—দিশি আর লেগহর্নের মিশেল। শাদা লেগহর্ন ডিম পাড়ে বেশি, আর দিশিগুলোর মধ্যে রোগ ঠেকাবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে।

মাঝে-মাঝে অবশ্য চিলে-শকুনে এক-আধটা ছানা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তার দায় সব পড়ে আমারই ওপর। কিন্তু আমি তো মহৎ সাহিত্য রচনা করবার কাজে ব্যস্ত। মুরগির ছানাগুলোকে দেখাশুনো ক'রে আমি সামলাই কী ক'রে?

'ভালো খানা খায় এরা', স্ত্রী বললেন, 'আমি এদের ঘি-ভাত খেতে দিই।'

'ঘি-ভাত!' আমি তাজ্জব হ'য়ে বললুম, 'মুরগির ছানাগুলোর কপাল তো দারুণ!'

মুখের কথাটা শেষ করার আগেই, কিছু-একটা আছড়ে পড়ার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। নিশ্চয়ই ভারি-কিছু মাটিতে পড়েছে। শাদা লেগহর্ন চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে হুড়োহুড়ি ক'রে ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে ছুটে গেলো তার বিবিদের কোনো বিপদ হয়েছে কিনা দেখতে। মুরগিগুলো সব তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কিচিরমিচির শুরু ক'রে দিয়েছে। কুকুরটা ভৌ-ভৌ ক'রে উঠলো। আমরা সবাই ছুটে যেদিক থেকে

এল সেখানে গিয়ে খোঁজ করলুম : কী হ'লো ? হ'লো কী ?

ব্যাপার আর কিছু না ; ঐ মস্ত দুই ধূসর চালকুমড়ো আমগাছের ডাল থেকে খ'সে পড়ায় আমার মেয়ের চালাঘরটা একেবারে ধুলোয় গড়াচ্ছে।

মেয়ে বেড়ালছানাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। তার মা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন স্তম্ভিত।

'পড়লো কী ?' বেড়ার ওপাশ থেকে জিগেশ করলেন রাজালা।

'এসো,' স্ত্রী তাঁকে ডাকলেন।

'তাত্তো, কাইসু না ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে,' মেয়ে আমাকে বললে।

'তুমি ভয় পাওনি তো, সোনা ?'

'না। তবে আম্মা ভয় পেয়েছে।'

রাজালা, খাদিজাবিবি আর সৌমিনী দেবী ভয়াবহ দুর্বিপাকটার খবর নিতে বাড়ি এসে হাজির। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা আগুন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে গেলেন।

কাজেই আমার স্ত্রী এই ব'লে শুরু করলেন, 'মেয়েটা আর কাইসু ঐ চালাঘরটায় ব'সে খেলা করছিলো…' অমনি আমি বুঝতে পারলুম এবার ইনি আমার গুণপনার কথা ব্যাখ্যান ক'রে একহাত নেবেন।…'উনি এসে বললেন চালাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে, ঐ চালকুমড়োগুলো নাকি আছড়ে পড়বে !'

তিন সুন্দরী তাঁদের তিন সুন্দর আঙুল তুলে ধরলেন তাঁদের তিন-তিনটি নিজের নাকে।

'আচ্ছা, উনি কী ক'রে নিশ্চয় ক'রে জানলেন যে চালকুমড়োগুলো পড়তে চলেছে ?' স্ত্রী তাঁদের জিগেশ করলেন।

এক ডজন চোখ, তার মধ্যে বেড়ালছানাটার চোখজোড়াও আছে, আমার ওপর এসে পড়লো। খানিকটা লজ্জা পেয়ে, খানিকটা আত্মসচেতনভাবে, আমি তাঁদের সামনে থেকে পিঠটান দিলুম। আমার বিশৃঙ্খল চিত্ত কিঞ্চিৎ সংগীতের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠলো। আত্মায় শান্তির প্রলেপ বোলাবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে সংগীতের। আমি রেডিও-গ্রামটা চালিয়ে দিতেই রবিশংকরের সেতারের চমৎকার ঝমঝম আমার প্রাণের মধ্যে ঝ'রে-ঝ'রে পড়লো। চোখ মুদে আমি যেন আস্তে-আস্তে চ'লে গেলুম হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে। কিন্তু পরিবেশ তো এখনও তেমন শান্ত হয়নি। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি স্ত্রী আর তাঁর সখিরা সবাই মিলে আমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন।

'জানো ভাই ?' স্ত্রী তখন আরো-সব আশ্চর্য ও চমকের জট খুলছেন—'যে-বছর আমরা এ-জমি আর বাড়িটা কিনি, ঐ কাঁঠালগাছে সে-বছরই প্রথম কাঁঠাল হয়।'

লোকে সাধারণত আশ্চর্য ও অলৌকিক বিশ্বাস করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েই থাকে। বিশেষত স্ত্রীলোকে। এবার আমার স্ত্রী তাঁদের শোনালেন আমার আরো কী একটা ভবিষ্যৎবাণী কবে সফল হ'য়ে গিয়েছিলো। সবই কাকতাল—দৈবাতের প্রশ্ন। তবু আমার স্ত্রী রং চড়িয়ে তাদের ব্যাখ্যান করছেন। ব্যাপারটা হ'লো এই যে আমি ঐ নতুন কাঁঠালগাছটাকে চারটে কাঁঠাল ফলাতে অনুরোধ করেছিলুম। আর সে সেই হুকুম তালিম করেছিলো। কাঁঠালের রসালো কোয়াগুলো এই মহিলাদের কাছেও পাঠানো হয়েছিলো। কাজেই স্ত্রী তাঁদের জিগেশ করলেন: 'কেমন লেগেছিলো বলো সে কাঁঠাল খেতে ?'

'ঠিক মধুর মতো'—বললেন সৌমিনী দেবী।

'একেবারে হালুয়ার মতো,' বললেন খাদিজাবিবি।

'ঠিক যেন টশটশে পাকা খেজুর,' বললেন শ্রীমতী রাজালা।

'তারপর, এটাও শোনো'···একবার বাই চাপলে, আমার স্ত্রীকে সামলানো বেশ কঠিন। 'সেই-যে বাসে ক'রে যাচ্ছিলুম না, ঐ যে সেবার, তখন হ'লো কী...'

আমার স্ত্রী বাসে চাপলে ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দ ও নির্বিকারচিত্ত, যেমন তিনি বসে থাকেন বাড়িতে, চৌকিতে। ফলে বাস যেই হঠাৎ মোচড় মেরে মোড় ঘোরে, তিনি প্রায় আসন থেকে ছিটকেই পড়েন আর কি! কাজেই প্রতি মুহূর্তে, পই-পই ক'রে তাঁকে চেঁচিয়ে বলছিলুম জানালার শিকটাকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে থাকতে।

আমরা বাসে ক'রে যাচ্ছিলুম কোন এক দূর গাঁয়ে।—আমি, আমার স্ত্রী আর মেয়ে, আর আমাদের দুই বন্ধু। বাসটার একটা নদী পেরুবার কথা আর সেখানে কোনো ব্রিজ ছিলো না। কাজেই দুটো নৌকো জুড়ে ভেলা বানিয়ে তাতে ক'রে বাসটাকে খেয়া পার করা হ'তো।

মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছিলো সেদিন, নদীটা ফুলে-ফেঁপে উঠছিলো।

বাসটাকে খেয়ায় পার করার সময় যাত্রীদের নেমে পড়তে হয়, সেদিনও আমরা যথারীতি বাস থেকে নেমে পড়েছিলুম। আমার স্ত্রী যখন মেয়েকে নিয়ে নামতে যাবেন, তখন বাসড্রাইভার—সে আমার চেনা লোক—একটু বিশেষ খাতির ক'রে বলেছিলেন: 'আহা, মা আর মেয়ে বাসেই ব'সে থাকুন না।'

সব যাত্রীরাই ততক্ষণে নেমে গিয়েছে, বৃষ্টির মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ছাতা মাথায়। দুটি তক্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বাসটা খেয়ায় উঠবে। আমার স্ত্রী আর মেয়ে ব'সেই আছেন আসনে, একটু দেমাকের ভঙ্গিতে, তাঁদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে যে!

আমার একটু শঙ্কাই হচ্ছিলো কেন যেন। এ নয় যে বাসটা উলটে পড়বে, কারণ

কতবারই তো বাসটা এভাবে খেয়া পেরিয়েছে। কিন্তু এখন তো আর আমি বাসের মধ্যে নেই যে তাঁকে মনে করিয়ে দেবো শিকটাকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে থাকতে।

গল্পটা শুনে ভাগ্যমন্তী আমার দিকে জুলজুল ক'রে তাকালেন – সে চোখে ছিলো সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা, দয়া আর করুণা, আর – বিপুল ভক্তি। অতএব আমি ইতিমধ্যেই তিন-তিনটে অলৌকিক কীর্তি ক'রে ফেলেছি – আমি, এ-কালের এই পয়গম্বর, হাল আমলের এই প্রবক্তা।

আমার স্ত্রী তাঁদের সবাইকে চালকুমড়োর ফালি ভাগ ক'রে দিলেন। সেগুলো নিয়ে যেতে-যেতে খাদিজাবিবি আমার মেয়েকে নির্দেশ দিতে ফিরে দাঁড়ালেন :

'কাইসুর খুব যত্ন কোরো কিন্তু।'

গ্রহনক্ষত্রের সন্নিবেশ নিশ্চয়ই কাইসুর সৌভাগ্য এনে দিয়েছিলো, কেননা সে সবকিছুই পেলে প্রচুর পরিমাণে। খাবার জন্যে তার নিজের একটা রেকাবি আছে, আছে শোবার জন্যে একটা বিছানা। তার ভালোমন্দের তত্ত্বাবধান করবার জন্যে বিস্তর লোকও ছিলো আশপাশে।

সদ্য-জ্বাল-দেয়া দুধে ডিম মেশানো খেয়ে সে ছোটোহাজরি সারে। ( হায় মাননীয় ধবল লেগহর্ন, আপনি জানেন না যে আপনার আদরের ছানাদেরই কাইসু রোজ চেটেপুটে সাবাড় ক'রে দিচ্ছে। ) মধ্যাহ্নভোজ হয় মাংসের ঝোল আর মাছভাজার টুকরোয় – রাত্তিরে খায় মাংসের কিমা আর ঘি-ভাত। আর খায়—অত যে-মহিলারা আসেন আমার স্ত্রীর নতুন শেলাইকলটায় তাঁদের ব্লাউস আর শায়াশেমিজ শেলাই করতে, তাঁদের কাছ থেকে মিষ্টি-মিষ্টি চুমু। সব্বাই কাইসুকে আদর করে, লাই দেয়।

শান্তিতেই কেটে যায় দিন। এদিকে ক্রমেই আমি হিন্দু সন্ন্যাসীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি, আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেড়েছে খুব। আমরা দুধছাড়া চায়ে চুমুক দিই, বিড়ি ফুঁকি আর নানারকম ভারিক্কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি—বেদান্ত, ঈশ্বরের রূপ, বিভিন্ন ধর্মমত, বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ; ধর্মবিশ্বাস প্রগাঢ় করবার পেছনে সংগীতের অবদান কতখানি ; এ-সব ধর্মমত কি চিরকাল টিকে থাকবে ; অনেক ধর্মমতই কি এর মধ্যেই ম'রে যায়নি ; মানুষের কি আত্মা আছে ; ভূতপ্রেত অপদেবতা বা উপদেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কী বলা যায় ; স্বর্গ নরক বেহেস্ত দোজখ হেভেন হেল…অনেক জট-পাকানো হেঁয়ালির আমরা জট ছাড়াতে চেষ্টা করি, কিন্তু স্পষ্ট কোনো স্পর্শসহ সিদ্ধান্তে আর পৌঁছুনো হয় না।

'নরকের ভয় আর স্বর্গসুখের প্রত্যাশা, চারপাশে সবকিছুই আছে,' সন্ন্যাসী বলেন, 'অথচ তবু আমাদের চাই তালাচাবি, পুলিশ আর সেনাবাহিনী, জেলখানা আর ফাঁসিকাঠ—যাতে মানুষ কিছুতেই সিধে-সরল রাস্তা ছেড়ে না-যায়।'

'মানুষ হচ্ছে মলমূত্রের এক চলন্ত কারখানা', সন্ন্যাসী আরো বলেন, 'মানুষের মধ্যে আছে জীবাণু আর কৃমিকীট, তার মাথাটা উকুনে গিশগিশ করছে। তার মুখে দুর্গন্ধ, তার শরীরে বদবু। মানুষের মতো নোংরা কোনো প্রাণী আর নেই। আপনি এ সম্বন্ধে কী বলেন, স্বামীজি?'

ইনি আমায় 'স্বামীজি' ব'লে সম্বোধন করলেন, এর কোনোই মানে নেই। মানুষ এর আগে আমাকে কত নামেই তো ডেকেছে: কুত্তা, শুওর, গাধা, বাঁদর, মোষ। এদের প্রত্যেকেরই আত্মা আছে; মানুষেরও আত্মা আছে একটা। আমিই সব, আমি ছাড়া আর-কিছুই নেই। আমিই ব্রহ্মণ।

'মানুষ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী, স্বামীজি?' সন্ন্যাসী আবার আমায় জিগেশ করেন।

'সব দোষক্রটি সব ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও সে-ই সৃষ্টির মধ্যমণি।'

'হ্যাঁ, অথচ তবু সে সচল এক মলমূত্রের কারখানা। বলা হয়, ঈশ্বর নাকি নিজের মূর্তির মতো ক'রেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু পাখপাখালি, সাপখোপ, অন্য জীবজন্তু, মাছ, গাছপালা—তারাও সেই একই দাবি করতে পারে', আমি বলি, 'আমি যে-ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, তার কোনো রূপ নেই, আকার নেই।'

'ঈশ্বর এত সব বিচিত্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন কেন?' সন্ন্যাসী শুধোন, 'এ নিয়ে ভাবতে বসলে একথা বলতে লোভ হয় যে—'

'এ একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা,' আমিই তাঁর হ'য়ে বাক্যটা শেষ ক'রে দিই।

'তাত্তো, কাইসু না আয়নায় নিজেকে দেখতে পেয়েছে!'—বেড়ালছানাকে কোলে ক'রে আমার মেয়ে এসে হাজির হয়, এমনভাবে খবরটা চেঁচিয়ে জানায় যেন সেটা সৃষ্টির অষ্টম আশ্চর্য।

সন্ন্যাসী বেড়ালছানাটিকে নিজের কোলে নিয়ে একটু হেসে মেয়েকে জিগেশ করেন: 'তোমার বেড়ালছানার নাম কী?'

'কাইসু।'

'ও বুঝি মুসলমান বেড়াল?'

কাইসু সন্ন্যাসীর দীর্ঘ শাদা দাড়ি শোঁকে আর বলে: 'মিঞাও!'

'ব্রহ্মময়ম্!' ব'লে ওঠেন সন্ন্যাসী।

'আম্মা,' মেয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, 'বাঁশিওলা মুচকুন্দি ক্লাইস্টুর সঙ্গে কথা বলছেন।'

সন্ন্যাসী চ'লে যাবার পর আমি সেখানে একা ব'সে-ব'সে ভাবতে থাকি। তারপর আমি লিখতে শুরু করি। একটু পরেই কেমন যেন বাজে, একঘেয়ে লাগতে থাকে, আমি চারপাশে তাকাই। সেই শাদা লেগহর্ন কুঁকড়োটা আবার কোথায় গেলো? জিগেশ করি আমার স্ত্রীকে। তিনি তখন তাঁর সখি কোনো অন্য আরেকজন মহিলা অভ্যাগতার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করছিলেন। তাঁর উত্তর শুনে দুজন মহিলাই সশব্দে হেসে ওঠেন।

'এই তো, এখানেই আছে ও, ওর বউদের সঙ্গে।' আমার স্ত্রী ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জানান।

আমার চিন্তার সূত্র আচমকা একটা শোরগোলে ছিঁড়ে যায়। পাখিরা ঝাপট দিয়ে ওড়ে, উত্তেজিতভাবে কিচমিচ করে, কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠে······

'ঐ যে, একটা সাপ!' আমার স্ত্রী চেঁচিয়ে ব'লে ওঠেন।

আমি ধীরে সুস্থে উঠে অলস পায়ে দৃশ্যটার দিকে এগিয়ে যাই। শাদা লেগহর্নটির বিস্তর ছানা তাদের মায়েদের সঙ্গে গোয়ালঘরে ছিলো। এক আটফিট লম্বা সাপ ছানাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে, তার লকলকে জিভ বেরিয়ে আসছে অনবরত। আমার স্ত্রী, বেড়ালছানা কোলে আমার মেয়ে, মহিলা অভ্যাগতরা—সব্বাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছেন। তক্ষুনি, প্রায় যেন শূন্য থেকেই, শাদা লেগহর্ন এসে হাজির অকুস্থলে—সে সাপটার দিকে ছুটে যায় তাকে ঠোকরাবে ব'লে। দুটো ঠোক্কর খেয়ে সাপটা হার মেনে সরসর করে বেড়ার দিকে ফিরে চ'লে যায়।

'দ্যাখো-দ্যাখো, ওটা চ'লে যাচ্ছে, আর সব্বাই কি না দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।'

তাঁর 'সব্বাই' কথাটার অর্থ স্বয়ং আমি, একা, কেননা বাকি সবাই তো অবলা নারী। কী করা উচিত আমার? আমি তো একে মারতে পারবো না। কাজেই আমি চুপ ক'রেই থাকি।

'শাদা লেগহর্নটাই সত্যিকার মরদ,' স্ত্রী ব'লে চলেন, 'পুরুষের মতো পুরুষ। দেখলে কেমন ক'রে ও ঠুকরে-ঠুকরে সাপটাকে তাড়িয়ে দিলে।'

এবার আর আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারি না।

'যদি কোনো সাপ এসে আমার বউ-মেয়েকে আক্রমণ করে, তবে আমিও তার মুখোমুখি দাঁড়াবো। এবার এটা শাদা লেগহর্নের পালা ছিলো, নিজের বউ-ছানার রক্ষা করার দায়িত্ব তারই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর সে তো তাদের রক্ষাও করেছে। কুঁকড়োটাই কাজের লোক। যা, গিয়ে ওর জন্যে একটু গমের দানা নিয়ে আয়,' আমার স্ত্রী তাঁর বোনকে বলেন।

'তাত্তো, সাপটা না আমার কাইস্থকে খেতে এসেছিলো,' আমার মেয়ে ব'লে ওঠে।

'হুম। উঠোনে একা-একা ছুটোছুটি করে বেড়িও না যেন।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাঁকেও সতর্ক ক'রে দিয়ে বলি, 'দরজাটা খুলে রেখো না। ছানাগুলো বরং আরো কিছুদিন ঘরের মধ্যেই বড়ো হোক।'

আমি ফিরে এসে লিখতে ব'সে যাই। হঠাৎ একসময় এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। তার-তাড়ায় যখন বাড়ি থেকে বেরুতে যাবো, আমার স্ত্রী আর মেয়ে শহর থেকে কী কী কিনে আনতে হবে তার একটা ফর্দ আমার হাতে তুলে দিলেন। 'তাত্তো, কাইস্থর জন্যে একটা পুঁতির মালা এনো কিন্তু।' আমার মেয়ে আমায় বারে-বারে মনে করিয়ে দেয়।

তো আমি তো এইভাবে চারশো মাইল দূরে শহরে এলুম, আর এক সপ্তাহ পরেই ফের বাড়ির দিকে রওনা দিলুম। বাড়ি থেকে বারো মাইল দূরে একটা স্টেশনে যখন আমি ট্রেন থেকে নেমেছি, তখন রাত এগারোটা বাজে। সেখান থেকে না-পাওয়া গেলো কোনো গাড়িঘোড়া, না-বা রাত কাটাবার জন্যে কোনো হোটেল। কী করা হবে এখন? আমার মনে প'ড়ে গেলো রেললাইন ধ'রে একটা শর্টকাট গেছে, সেটা ধ'রে হাঁটলে মাত্র তিন মাইল গেলেই বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই একহাতে চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে আমি টর্চ জ্বালিয়ে রওনা হ'য়ে পড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রেললাইনগুলো যেন এই গভীর অন্ধকারে চিরন্তনতায় গিয়ে পৌঁছেছে—অন্তত টর্চের আলোয় যদ্দূর দেখা যায়। আশপাশের ধানখেত থেকে কানে ঝিমধরানো ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই চামড়ার ব্যাগটা যেন আমার হাতে আরো ভারি হ'য়ে উঠলো। আমার স্ত্রীর ফর্দ অনুযায়ী তাতে কত শত টুকিটাকি জিনিশ কিনে পোরা হয়েছে। বারোটা কাঁচকলা, কিছু কমলালেবু, মিষ্টি, দুই কিলো চিনি, চিনি আর চাল গাঁয়ে শুধু খুব দুর্মূল্যই নয়, খুব কম পরিমাণেই পাওয়া যায় র‍্যাশনে। অথচ শহরে যত চাই তত মেলে। কোনো পারমিট ছাড়াই গাঁয়ে চিনি নিয়ে আসছি ব'লে সরকার আমায় হাজতে পুরতে পারে। সরকার যতই অযোগ্য আর অকাজের হোক, তাকে ভয় না-পেয়ে লোকের উপায় কী। কারণ সরকারের হাতে আছে পুলিশ, সেনাবাহিনী, জেলহাজত আর ফাঁসির মঞ্চ। কাজেই চিনি পাচার করবার জন্যে সরকার আমায় সাজা দিতেই পারে। এক কিলো ভালো চা-পাতা আনবার জন্যেও আমাকে হাজতে পুরবে নাকি? সেটা আমার জানা ছিলো না। আমি এতক্ষণে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। রেলস্টেশনে রাতটা কাটালেই ভালো হ'তো। কিংবা যদি এমন ট্রেনে উঠতুম যাতে বেলাবেলি পৌঁছে যাওয়া যেতো এখানে।

এখন, এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে, একেবারে একা হাঁটতে-হাঁটতে আমার একটু মনস্তাপই-

হচ্ছিলো। আমার মনে প'ড়ে গেলো ডাকাতরা কত কত পথিককে এভাবে ঝিরিঝিরি পথে বাগে পেয়ে খুন করে কতকিছু লুটপাঠ ক'রে নিয়েছে। অনেক বছর আগে খুব ডাকাতি হ'তো এদিকে—তবে এখনও তো তা হ'তে পারে। একটু কিছুর সাড়া পেলেই চমকে আঁৎকে উঠি আমি, উদ্বেগে ভ'রে যাই, দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকি আর মাঝে-মাঝে টর্চটা জালিয়ে নিই। এভাবে হাঁটলে সাড়ে বারোটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাবো। বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে এবার আমায় টিলার গা বেয়ে পায়ে চলার পথ ধ'রে সিকি মাইলটাক হাঁটতে হবে। এ-তল্লাটে লোকজনের খুব-একটা বাস-বসতি নেই। অনেক দিনের মধ্যে কোনো গাড়ি বা বাস যে এ-রাস্তা ধ'রে যাবে, তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা শহরগুলোর জয়ন্তী উৎসব করি, অথচ সেগুলো দেশে গজিয়ে উঠেছে একেকটা বিষ-ফোঁড়ার মতো। এ-সব উৎসবে লাখ-লাখ টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু কাউকেই ধুলো-বালি, কাঁচা রাস্তা, খোলা নালানর্দমা বা সরকারি পায়খানা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখি না। আমাদের যত আদিম অভ্যাস সব অবিকল বজায় রেখেই আমরা পশ্চিমী নাগরিক সভ্যতায় এসে প্রবেশ করেছি। বাড়ি কিংবা পরিবেশ কি আসলে মনেরই প্রতিফলন নয়? যেসব শরীর ধুলোকাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাদের মধ্যে সুস্থ মন গজাবে কী ক'রে? যে-বাড়িটায় আমরা এখন আছি, সেটা যখন কেনা হয় তখন তার জরাজীর্ণ হতশ্রী দশা। আমাকে সব ধুয়েমুছে সাফ ক'রে মেরামত ক'রে নিতে হয়। বাড়িতে যারা থাকে তাদেরই এটা পরিষ্কার রাখার কথা, বিশেষত মেয়েদের। কী করছে এখন আমার স্ত্রী আর কন্যা? তারা নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। মশারির মধ্যে নিশ্চয়ই স্ত্রী কন্যা আর ঐ মার্জারশাবকটি শুয়ে আছে। গরমে মেয়ে আর কাইসুর পাখা দরকার হয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর আবার ফ্যানের আওয়াজ সহ্য হয় না। পাখার একটানা গুঞ্জনের জন্যে শোনাই যায় না শেয়াল এসে মুরগিগুলোকে পাকড়ালো কিনা।

পাখার প্রতি তাঁর যে এমন অনীহা, এটাই তার অদ্ভুত কারণ। আমি যেহেতু বাড়ি নেই যে পাখা চালিয়ে দিয়ে ঝগড়া পাকাবো, পাখাটা নিশ্চয়ই সেজন্যে এখন চলছে না। আমি বাড়ি পৌঁছুবামাত্র সবাই উঠে পড়বে। আলো জ্বালা হবে। সবাই এসে গুটিগুটি চামড়ার ব্যাগটার পাশে দাঁড়াবে। কিছু খেতে ভালো লাগবে নিশ্চয়ই সবার। বিশেষ ক'রে সেজন্যেই আমি মিষ্টিগুলো কিনেছি। কিন্তু বেড়ালছানাটা কি আর মিষ্টি খেতে চাইবে?…হঠাৎ টের পাই হাওয়ায় কিসের একটা অস্ফুট বদল। আমার উৎকণ্ঠায় ঘেমে যাওয়া কপালে যেন আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে আগের চাইতেও ঠাণ্ডা আর মৃদু এক হাওয়ার ঝাপটা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ তো নদীটা, আর তার ওপরকার রেলের পুল। ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে গিয়ে আমার হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা মনে প'ড়ে গেলো। তিনি তো এর তলাতেই থাকেন। এখন কি তিনি থাকবেন এখানে? আমি দাঁড়িয়ে একটু

ঘোমোমনা করে টর্চ জেলে দেখবার চেষ্টা করলুম। তলায় ঘন হ'য়ে সবুজ ঝোপঝাড় গজিয়েছে। ব্রিজ থেকে নেমে আমি নিচে চ'লে এলুম। প্রথম দুটো থামের মাঝখান-কার জমিটায় মিহি বালি বেছানো। এককোণায় একটা আগুনের কুণ্ড। কাছে গিয়ে দেখি ঝোপঝাড়ের মধ্যে লতাও আছে—যা থেকে শিমবরবটি ঝুলছে।

থামের গায়ে ঠেশ দিয়ে আমার বাক্সটা রেখে আমি একটা মোমবাতি জ্বাললুম। মোমের আলোয় দেখা গেল সন্ন্যাসী এককোণায় শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তিনি, কোনো দুর্ভাবনাহীন শিশুর ঘুমের মতো সারল্যে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত। তাঁর পাশে প'ড়ে আছে তাঁর ঝোলা, শঙ্খ আর লাঠিটা—তাঁর যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি।

এই-তো একজন মানুষ, অন্য মানুষ, সমাজসংসার, সরকার বা ভগবান সম্বন্ধে যাঁর কোনোই নালিশ নেই। সবকিছু নিয়েই তিনি সুখী, নিজেকে নিয়েও। 'লোকঃ সমস্তঃ সুখিনো ভবন্তু।'

'মহাত্মন', আমি তাঁকে ডাক দিলুম।

'স্বামিজি!…' সন্ন্যাসী তাঁর চোখ খুলেই আমাকে দেখতে পেলেন, আর এক মৃদু হাসিতে তাঁর সারা মুখটা ঝলমল ক'রে উঠলো।

'আসুন, স্বামীজি, বসুন', তিনি আমাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। নিজে তিনি সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন। তাঁর মাথা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ব্রিজের বিস্তার।

আমার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণটা তাঁকে আমি ব্যাখ্যা ক'রে বললুম। তিনি অমনি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। আমি বললুম, 'সকালবেলায় আমি নিজেই চ'লে যাবো।'

আমার চামড়ার বাক্সটা খুলে আমি কিছু কলা আর কমলা বার ক'রে নিলুম। ফল-মূলগুলো খেলুম আমরা, সন্ন্যাসী একটু চা বানালেন। চায়ের পর বিড়ি টেনে আমরা শুয়ে-শুয়ে কথা বলতে লাগলুম।

মাথার তলায় একটা হাত দিয়ে ড্যানার ওপর শুলেন তিনি, থামের পাশের বাঁধানো মেঝেটায়। আমি মাথা রাখলুম বাক্সটায়। মোমটা তখনও জ্বলছে। হাওয়ায় কেমন একটা সতেজ টাটকা সুঘ্রাণ, আমি বুক ভ'রে জোরে-জোরে শ্বাস নিলুম।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে তিনি বললেন, 'আমার শেষ ইচ্ছে হ'লো যাতে নিরিবিলি চূড়োর ওপর শুয়ে মরতে-মরতে শেষ নিশ্বাস দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে পারি।'

মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে-কাঁপতে নিভে গেলো; ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেই ঘুমিয়ে পড়তে যাবো অমনি শুনতে পেলুম বাজফাটানো শব্দ ক'রে পাহাড় থেকে সব যেন ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে। আসলে আমাদের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন চ'লে গেলো। পরে আমি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লুম। স্বপ্নের কোনো ভুবনের মধ্যে দিয়ে যেন পা ফেলে চলেছি।

…আমাদেরই একজনকে—সে কি সন্ন্যাসী, না কি আমি ?—বলির জন্যে যেন বেদির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। চোখগুলো উপড়ে নিয়ে মিশকালো এক আকাশে লাগিয়ে দেয়া হ'লো। উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলতে লাগলো তারা—দুটি তারা। যে-দুটি একদিন ছিলো তাঁর নয়তো আমার চোখ—তারা নয়নতারা। হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠলো সব, চিৎপাত শুয়ে-থাকা শরীরটার পায়ের পাতায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঝলমল ক'রে উজ্জ্বল সেলুলয়েডের মতো ফসফস জ্ব'লে উঠলো। তারপর আগুন উঠে এলো হাঁটু অব্দি. শোনা গেলো কে যেন জিগেশ করছে : 'তোমার শেষ কথা কী ?'

'ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।' জ্বলন্ত শরীর আরো ব'লে উঠলো : 'লোকঃ সমস্তঃ সুখিনো ভবন্তু।'

এখন সারা শরীরকেই ছেয়ে ফেলেছে আগুন, ঠিক একটা মানুষের শরীরের রূপ অনুযায়ী মাপে-মাপে প'ড়ে আছে ছাইয়ের স্তূপ। তারপরে হাওয়ার এক জোরালো ঝাপট সেই ছাইকেও উড়িয়ে দিলে। কিছুই আর প'ড়ে রইলো না, কিছুই না।

শুধু আকাশের দুই দিকে উজ্জ্বল হ'য়ে ঝলসাতে লাগলো দুটি নয়নতারা।

হঠাৎ কার গাঢ় গম্ভীর গলা গমগম ক'রে উঠলো : 'পরের জন !'

চমকে কেঁপে উঠে আমি চোখ মেললুম। তখনও ভালো ক'রে দিনের আলো ফুটে ওঠেনি। দেশলাই জেলে একটা বিড়ি ধরিয়ে আমি ঘড়ি দেখলুম।

ভোর পাঁচটা।

সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন ?

'জেগে গেছেন এর মধ্যেই ?' প্রশ্নটা ক'রে স্মিত মুখে তিনি এগিয়ে এলেন।

তিনি এর মধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছেন, শরীরে মেখেছেন ছাই, বিভূতি। গাছ থেকে একরাশ শিম-বরবটি তুলে আমার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দিলেন।

'এই-যে, কিছু বীজও নিন। গত চল্লিশ বছরে আমি যেখানে যেখানে আস্তানা গড়েছি, সব জায়গাতেই এই বীজ পুঁতে দিয়ে আমি শিম-বরবটি ফলিয়েছি।'

আমরা দুজনে একসঙ্গে চা খেলুম। তারপর, বাড়ি যাবো ব'লে, আমি উঠে পড়লুম। সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে এসে খানিকটা এগিয়ে দিলেন—যেখানে বাঁধানো রাস্তাটা এসে মিশেছে পায়েচলার পথে, কাঁচা রাস্তায়।

'ত্যাখো-ত্যাখো, কাইমু এর মধ্যেই বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে না ?'—এই প্রশ্নটা মারফৎ আমার স্ত্রী আমাকে সম্ভাষণ করলেন। মেয়ে তো তক্ষুনি তার বেড়ালছানার গলায় হারটা পরিয়ে দিলে। আমার স্ত্রী সন্ন্যাসীর দেয়া টাটকা শিম-বরবটি তক্ষুনি ভেজে দিলেন। আমি উঠোনে শিমের বীজ পুঁতে দিলুম।

স্নান ক'রে, ছোটোহাজরি সেরে, আমি লিখতে ব'সে গেলুম। প্রথমে আমি একবার

চোখ বুলিয়ে নিলুম এতকাল যা-যা লিখেছি তার ওপর। হুম, লেখাগুলো কেমন যেন, তেমন-কোনো ছাপ ফেলে যায় ব'লে মনে হ'লো না আমার। কাগজগুলো কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিলুম যাতে হাওয়া এসে এদের উড়িয়ে নিয়ে যায়। এতক্ষণে বেশ মুক্ত লাগলো আমার, নির্ভার যেন। আমি উঠে প'ড়ে খোলা হাওয়ায় পায়চারি করতে লাগলুম। তারপর মেয়ে এসে আমার কাছে নালিশ করলে :

'তাত্তো, ঐ ফুটফুটে ছোপওলা মুরগিটা না কাইয়ুকে ঠোক্কর মেরেছে !'

শাদা লেগহর্নটি কাছেই ছিলো, আমার পেছনে ঘুরঘুর করছিলো।

'কমরেড,' আমি তাকে জিগেশ করলুম, 'তোমার এক বিবি কাইয়ুকে ঠুকরে দিয়েছে। এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কী, শুনি !'

কুঁকড়ো ঘাড় কাৎ ক'রে আমার দিকে একবার তাকালে। কাল রাতে স্বপ্নের ঘোরে আকাশে যে-দুটি চোখ আটকানো দেখেছিলুম, ঠিক তার কথাই মনে করিয়ে দিলে তার চোখ।

ব্যড়ি ফিরে এসে সব দরজা-জানলা আমি হাট ক'রে খুলে রাখলুম। তবুও ভেতরে যথেষ্ট আলো আসছে ব'লে মনে হ'লো না। অনেক বছর আগে, কোনো-এক মুসলমান গেরস্থ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্যে বিশেষ-বিশেষ ঘর : নামাজ পড়বার জন্যে একটা, রসুই পাকাবার জন্যে একটা, ভাঁড়ার, অতিথ-বিতিথ এলে থাকতে দেবার জন্যে একটা, ইত্যাদি। কিন্তু এতগুলো ঘরের মধ্যে কোনো ঘরেই ততটা জায়গা নেই যে দুটি চৌকি পাতা যায়। কোনো ঘরেই যেহেতু হাওয়া খেলবার জন্যে মুখোমুখি দরজা-জানলা বসানো হয়নি, কোনো ঘরেই, অতএব, পবনদেব ভ্রম-ক্রমেও পদার্পণ করেননি। একটা অবশ্য বড়ো হলঘর আছে, সবগুলো ঘরকেই ছুঁয়ে। কেন যে এই মস্ত ঘরটা মাঝখানে, আর খুদে-খুদে ঘরগুলো তাকে ঘিরে রয়েছে, সেটা বোঝা দায়। কারণ জানবার জন্যে অবশ্য ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলোতে হয়। কবর দেবার আগে মৃতদেহকে শুইয়ে রাখবার জন্যে এই বড়ো ঘরটা তৈরি করা হয়েছিলো। ধরা যাক, আমি ম'রে গিয়েছি। আমার লাশটাকে ধুয়ে-মুছে আনকোরা নতুন কাপড় পরিয়ে ঠিক মাঝখানটায় শুইয়ে রাখা হবে। লোকে এসে শেষবারের মতো দেখে যাবে আমাকে। একবার ম'রে গেলে লোকে বিস্তর শ্রদ্ধাভক্তি পায়—পায় যথেষ্ট আলো। হাওয়াও। যদ্দিন বেঁচে আছে তদ্দিন কিন্তু তার বরাতে এ-সব জোটে না। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা যেন কোনো রাস্তার সরাইতে রাত কাটানো। কষ্ট অসুবিধে অস্বস্তি—কিছুতেই কিছু এসে যায় না। যেখানে লোকে গিয়ে চিরন্তনতাকে, শাশ্বতকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, সেটা অন্য জায়গা—বেহস্ত, কিংবা দোজখও হ'তে পারে। কিন্তু দোজখকে এড়াবার জন্যে বিস্তর কায়দা-কৌশল ফন্দিফিকির আছে—পাঁচ ওক্ত নামাজ

পড়া, ভালো কাজ করা। খাও, দাও, সন্তান উৎপাদন করো—এখানে জীবন মানে শুধু এইটুকুই। এইভাবেই কেটে গেছে লক্ষ-লক্ষ বছর। কত প্রজন্ম এসেছে, কত প্রজন্ম গিয়েছে। এই-ই বোধহয় মানুষের ভবিতব্য, তার নিয়তির নির্বন্ধ।

এখন অবশ্য আমাদের এই বড়ো হলঘরটা পাড়ার মেয়েদের আড্ডা দেবার জায়গা হ'য়ে উঠেছে। কখনও-সখনও সেখানে ব'সেই আমি ভোজ সেরে নিই। আমাদের এই চমকপ্রদ স্থাপত্যশিল্পে খাবার ঘরের আলাদা কোনো আয়োজন নেই।

আজকাল অবশ্য প্রধানত কাইসুই এই বড়ো ঘরটা জুড়ে থাকে। আমার মেয়ে তাকে নিয়ে সারাদিন এ-ঘরে ব'সেই খেলা করে।

মশাও আছে যথেষ্ট তবু আমার বিছানায় কোনো মশারি নেই। মশারির মধ্যে ঢুকলেই আমার হাঁসফাঁস লাগে, দম বন্ধ হ'য়ে যেতে চায়। মশা ছাড়া আরো আছে রাশি রাশি ছারপোকা। আমার স্ত্রীর পরিচালিত এক ধুরন্ধর রণকৌশলে ছারপোকা-গুলোর বিলকুল খতম হ'য়ে যাবার কথা ছিলো। তিনি বেশ আচ্ছা ক'রে সবখানে সব আশবাবে কেরোসিন তেল ঢেলেছিলেন। ছারপোকাদেরও তো আত্মা আছে। তাদের হত্যা করা কি পাপ নয়? জৈনরা তাদের নাকমুখ কাপড়ে ঢেকে ঘোরে—নাহ'লে দৈবাৎ যদি জীবাণুরা আটকে প'ড়ে টেঁশে যায়!

আমি এমনভাবে পাখাটা বসাই মশারা যাতে ধারে-কাছে ঘেঁষে না।

'বন্ধ করতে পারো না পাখাটা? আমাকে, দোহাই, একটু ঘুমুতে দাও।'

শাবেক আমলের পাখাটার গুঞ্জন ছাপিয়ে আমার স্ত্রী গাঁক-গাঁক ক'রে ওঠেন।

নিরীহ গোবেচারা স্বামীর মতো আমি তাঁর হুকুম তামিল করি। দিলখুশ হ'য়ে পালে-পালে মশা আমাকে ছেয়ে ফ্যালে। পরোপকারের নামে, পরার্থে আমি কিঞ্চিৎ রক্ত দান করি। মশারা না থাকলেও হাওয়া আমার দরকার হ'তো। যে-সব মাছ, বন্ধ জলে নয়, বহতা জলে ঘুরে বেড়ায়, আমি অনেকটা তাদেরই মতো। কাজেই আবার আমি পাখা চালিয়ে দিই একটু পরে। আমার স্ত্রী জেগে ওঠেন আর চ্যাচান। তিনি কি ভয়ংকরী ও প্রলয়ংকরী ভদ্রকালীরই স্বজাতি নন? (যদিও বিয়ের আগে তিনি কিন্তু হলফ ক'রে বলেছিলেন সারা জীবন তিনি আমার কথা মেনে চলবেন, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখবেন। পুরুষরা, যাঁরা সুখী দাম্পত্যজীবনের কথা ভাবছেন, অনুগ্রহ ক'রে তাঁরা অবহিত হোন!)

তবুও সব স্ত্রীলোকই, এমনকী ভদ্রকালী শুদ্ধ, একসময়-না-একসময় গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবেই। তখন আমার প্রধান কাজ হ'য়ে ওঠে, না-ঘুমিয়ে, যাবতীয় শেয়াল-টেয়ালের বেশে যে সব বিপদ মুরগিগুলোকে পাকড়াতে আসবে, তাদের সম্বন্ধে সজাগ ও কড়া পাহারাদারি করা। কাজেই কান খাড়া রেখে আমি আবার পাখা চালিয়ে দিই।

তারপর যখন দেখি আমার মেয়েটা ঘেমে নেয়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছে, মশারিটা একটু তুলে পাখাটা তার দিকে চালিয়ে দিই। বেড়ালছানাটা তার পাশে রেশমের বলের মতো গুটি পাকিয়ে শুয়েছিলো, সে এবার তার চোখ খোলে। মাঝরাত্তিরে আমার একটু খিদে পায়। একটা বিস্কুটের প্যাকেট খুলে আমি খেতে থাকি। বেড়ালছানাটা উঠে প'ড়ে আমার কাছে ঘনিয়ে এসে মিউ-মিউ ক'রে ডাকে। সেটা মেয়েটাকে জাগিয়ে দেয়। —'তুমি কি খাচ্ছো, তাত্তো?' সে শুধোয়। আমি বেড়ালছানা ও মেয়ের সঙ্গে বিস্কুটগুলো ভাগাভাগি ক'রে নিই। তখন আমার স্ত্রী উঠে প'ড়ে চেল্লাচিল্লি লাগিয়ে দেন।

'একে পাখাটার গর্জন, তায় মাঝরাতে খাওয়ার পালা। আমাকে শান্তিতে এক ফোঁটাও ঘুমুতে দেবে না দেখছি।'

তাঁকে শান্ত করার জন্যে তাঁকেও আমি কয়েকটা বিস্কুট দিই। বিস্কুটগুলো সাবাড় ক'রে চকচকে করে এক গেলাশ জল খেয়ে নিয়ে অবশেষে তিনি মুরগিদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন: 'কোনো শেয়ালের ডাক শুনেছো নাকি?'

আমি পাখাটা বন্ধ ক'রে চুপি-চুপি-আসা জানোয়ারগুলো আর চোর-ছ্যাঁচড়দের আগমনের প্রতীক্ষায় কান খাড়া ক'রে থাকি। দূর থেকে শুধু রেলগাড়ির ঝগঝগ ভেসে আসে। শয়ে-শয়ে লোককে পেটে পুরে তীক্ষ্ণবাঁশিতে রাতের স্তব্ধতাকে চিরে ফালা-ফালা ক'রে সে চ'লে যায়।

'তাত্তো, লম্বা গাড়ি!' আমার মেয়ে আমাকে জানায়।

ট্রেনটা ছুটে চ'লে যায় রেল পুলের ওপর দিয়ে যার তলায় শুয়ে গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকেন সন্ন্যাসী। তাঁর তো কোনো ভাবনা-চিন্তা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই, তাঁকে কোনো চাকরির জন্যে উমেদারি করতে হয় না বা মুরুব্বি পাকড়াতে হয় না, তিনি কোনো ঘরগেরস্থালি বা পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যেরও কামনা করেন না।

হিমশীতল গলাজলে দাঁড়িয়ে মানুষ তোমায় ধ্যান করে। তক্তার ওপর ছুঁচলো মুখটা ওপরে লাগানো পেরেকের বিছানায় মানুষ ঘুমোয়। মানুষ তার এক হাত তুলে রাখে বছরের পর বছর, হাত যায় শুকিয়ে, নখ গজায় এক ফুট লম্বা, হাওয়ায় দোলে যেন অক্ষয় বটেরই কোনো ডালপালা···আমি-যে এই রকম কত-কত ভগবানের মানুষ দেখেছি, আর যত দেখেছি তার চেয়েও শুনেছি বিস্তর!

বেড়ালছানা, আমার মেয়ে আর তার মা—সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে। হ্যাঁ, সত্যি, ঘুম হ'লো এক মস্ত আশীর্বাদ।

হায় খোদা·· ইলারাবুল আলামিন!

সকালটা ফুটে ওঠে সুন্দর হয়ে। গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল, পাখি-পাখালি—সবাই কী যে সুন্দর! কতকিছুই যে আছে যা নিয়ে অন্তহীন ভেবে চলতে পারি।

যেমন, সম্প্রতি আমার যে হিংস্রভীষণ গোঁফজোড়া গজিয়েছে, তা দেখে আমি মৃদু-মৃদু হাসি। তবে কালোর মধ্যে কিছু-কিছু শাদার ছোপ দেখে খানিকটা মন খারাপ হ'য়ে যায়। আমি একটু কলপ লাগাই, গোঁফজোড়া কুচকুচে কালো হ'য়ে ওঠে আর প্রবল প্রতাপান্বিত ব'লে দেখায়।

অথচ এই দেখে, সবাই হো-হো ক'রে হাসে। আমার মেয়েকে চুমু খেতে গেলে সে নালিশ করে: 'তাত্তো, তোমার গোঁফ কেমন কাঁটার মতো বিঁধে যাচ্ছে যে!'

ঠিক মেয়েলি স্বভাব। এদিকে যে বেড়ালছানার ধারালো নখের আঁচড়ে তার শরীরে কত জায়গায় কাটার দাগ সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। সে-বেলায় কোনোই নালিশ নেই! আর আমি যেই গোঁফ গজাই, সে নাকি তাকে কাঁটার মতো খোঁচা দেয়!

সেদিন আমাকে লেখকদের একটা সভায় যেতে হয়েছিলো. আলোচনায় যোগ দেবার জন্যে মোটেই নয়. আসলে আমার গোঁফজোড়াকে দেখাতেই আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু সে যে বিষম মুশকিল বাধাবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমার আনকোরা ছাতাটা সেখানে ফেলে রেখেই আমাকে চুপি চুপি সেখান থেকে চম্পট দিতে হয়েছিলো। আমি নিজে যদিও কোনোই লেখক নই, আমি লেখকদের সম্মান করি। কিন্তু লেখকদের স্বভাব তো অতীব আবেগময় ও কিঞ্চিৎ খ্যাপাটে, তাই তাঁরা নিজেদের নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামান। কাজেই সভাটা অনতিবিলম্বেই পরিণত হয়েছিলো চীৎকৃত তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি আর এঁর সঙ্গে ওঁর গলাবাজির প্রতিযোগিতায়। শাদা একটা লেগহর্ন মোরগের মতো দৃশ্যমান হ'য়ে আমি তাঁদের মধ্যে বসেছিলুম। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই সবাই চুপ ক'রে গেলেন। আমি এতক্ষণ ধ'রে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম কখন তাঁরা আমার এই আনকোরা গোঁফজোড়াটি নিয়ে মন্তব্য করেন। অচিরেই স্তব্ধতাটা ভেঙে দিলেন ছোটোগল্প লেখক কে. টি. মহম্মদ। তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আরেকজন গল্প লেখকের সঙ্গে—পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণন ওরফে 'উরুব' যাঁর নাম।

'ভৈকম মুহম্মদ বশীর। আমাদের আউলিয়া। এঁর এখন শুধু মরতে বাকি। তখন ইনি পেয়ে যাবেন জরম, বৈথ, চন্দনাকুট্টম, কোটিতুতু, বেত্তুম কুতুম, রথিব— আমরা উৎসবের জন্যে দু'হাতে টাকা তুলবো...'

আমার মনে হ'লো অন্ধকারে যেন একটা বিষম থাপ্পড় খেলুম। আমার মৃত্যুর পর এরা আমাকে সন্ত বানিয়ে দেবে! প্রাথমিক ধাক্কাটা কিঞ্চিৎ সামলে আমি জিগেশ করলুম: 'তা আমার স্ত্রী আর মেয়েকে চাঁদার বাক্সটার পাশে বসতে দেবেন তো?'

'হিন্দুরা এর বিরোধিতা করবে,' গর্জন করলেন উরুব, যিনি আবার পি সি. কুট্টিকৃষ্ণনও। 'শুধু হিন্দুদের লাশ ফেলে দেবার পরেই বশীরকে আউলিয়া বানানো যাবে।'

যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত এ যাত্রাটায় আমি বেঁচে গেলুম। কিন্তু—

'হিন্দুদের এতে নাক গলাতে কে বলেছে?' কে. টি. মহম্মদ জিগেশ করলেন। 'বশীর হচ্ছে আমাদের লেখক। আমরা মুসলমানরা তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করবো।'

হুঁ-হুঁ, এ-কথায় বেশ যুক্তি আছে। সহজে একে কাটাম দেয়া যাবে না। যে কোনো আদালতই এ-কথা মেনে নেবে। কিন্তু যে-লেখক উন্নব আর পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণনের দ্বৈতভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি একাই একশো লোকের গলায় হুংকার দিয়ে উঠলেন।

'ভৈকম মুহম্মদ বশীর হিন্দুদের দেবতা – অবতার!'

'আমার গোঁফজোড়াটা আপনার কেমন লাগছে?' দেবতা হওয়ার হাত থেকে আর কোনো রেহাই নেই দেখে মুষড়ে প'ড়ে আমি জিগেশ করলুম।

সবাই তাকিয়ে দেখলেন। কেউ বললেন না যে এটা পুরোপুরি নকল গোঁফ।

'গোঁফজোড়া তোফা মানিয়েছে,' পি. সি. বললেন, 'আমাদের দেবতা শিবেও দারুণ ভয়ংকর একজোড়া গোঁফ আছে।'

'বশীরের দেবতাকরণ ব্যাপারটায় প্রচণ্ড ঢাকঢোল পিটিয়ে দারুণ সব বিজ্ঞাপন দিতে হবে.' গুম্ফবান ঔপন্যাসিক এম টি বাসুদেবন নায়ার প্রস্তাব করলেন। 'বশীরদেবের স্তুতি ক'রে গদ্যে-পদ্যে আমাদের অনেক বই লেখা উচিত। তারপর তাঁর বাড়ি যাবার রাস্তাটা খুঁড়ে দু-পাশে টিলা বানিয়ে মাঝখানে সরু একটা সুড়ঙ্গ বানাতে হবে—যাতে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে তীর্থযাত্রীরা তাঁর দর্শনে যেতে চাইলে যথেষ্ট কায়ক্লেশ করতে পারে।

'সাধু প্রস্তাব.' পি. সি. তৎক্ষণাৎ সমর্থন করলেন।

'আমরা অন্তর্ঘাতের ব্যবস্থা করবো, কুয়োটা আমরা উড়িয়ে দেবো.' একটু ভেবে এম-টি বাসুদেবেন নায়ার বললেন।

'কোন্ কুয়ো?' পি-সি জিগেশ করলেন।

'বশীরদেবের বাড়িতে একটা মস্ত কুয়ো আছে। দেবতার স্ত্রীর মাত্র একটা গাইগোরু, অথচ আশপাশের অন্তত একশো বাড়িতে তিনি দুধ দেবেন। তাঁরা একটা দুর্দান্ত দুগ্ধ প্রকল্প তৈরি করেছেন – কুয়োর জলকে তাঁরা দুধ বানিয়ে ফেলেছেন।'

'হিংসে কোরো না, বাসু.' আমি বললুম, 'আমাদের গোরু আছে চারটে – আর এ যা বলছে সব ডাহা মিথ্যে কথা,' আমি পি-সিকে বললুম।

'আমি দেবতার স্বমুখনিঃসৃত বাণীতে বিশ্বাস করি,' পি-সি তক্ষুনি সায় দিলেন। 'দেবতার গোশালায়, চারটে নয়, চল্লিশ হাজার গোরু আছে।' তার পর এম-টির দিকে ফিরে বললেন, 'বাসু যাও না, গিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে পড়ো। দেবতার কুয়োর ধারে একটা

চালাঘর বানিয়ে নিয়ে সেখানে গায়ে ছাই মেখে ব'সে পড়ো। লোকদের বলো কুয়োর মধ্যে সাক্ষাৎ গঙ্গাজল আছে। আমরা টাকা-টাকা দরে একেকটা শিশি বিক্রি করতে পারবো। তার ছিটেয় সব অসুখ সেরে যাবে। তারপর আমরা তুল্লাল, অখণ্ড ভজন এ-সবের মতো জোর মহোৎসব লাগিয়ে দেবো। তারপর দেবতা সব অলৌকিক কাণ্ড করবেন। বশীরদেব যখন হেঁটে যাবেন, আমরা তাঁর পায়ের তলা থেকে ঠোঙাভর্তি ছাই, তাগা-তাবিজ, মাদুলি আর একশো টাকার নোট পেয়ে যাবো…'

'একটু বাথরুমে যাবো,' আমি বললুম, 'বসুন, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

আমি ছাতাটা সেখানে ফেলে রেখেই পেছনের দোর দিয়ে চম্পট দিলুম। ছাতাটা একে বেজায় দামি, তায় সদ্য কেনা। কিন্তু কী আর করা? এরা আমাকে জ্যান্ত ঝলসে মেরে দেবতা বানিয়ে দেবে ব'লেই পণ করেছে দেখছি।'

তবু, বাড়ি ফিরে এসে, আমার মধ্যে একটা নতুন ভাবনার উদয় হ'লো। যার মোটেই কোনো অত্যাশ্চর্য বা অসাধারণ ক্ষমতা নেই, লোকে কী তাকে অবতার বা ঋষি বানাবার চেষ্টা করতে পারে? কাজেই একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখানোই যাক না। উঠোনের দিকে তাকিয়ে আমার মাথায় একটা ফন্দি এলো।

'এই-যে, শুনছো', আমি আমার স্ত্রীকে ডাক দিলুম। 'ঐ খালি সিমেণ্টের বস্তাগুলো কোথায়? সব কি পোকায় কেটে ফেলেছে নাকি?'

'সেগুলোকে সব ধুয়ে ভাঁড়ার ঘরে দড়িতে মেলে দিয়েছি শুকোতে,' ভেতর থেকে আমার স্ত্রী জবাব দিলেন। 'এক্ষুনি আবার ওতে তোমার কি দরকার?'

'সবশুদ্ধ কতগুলো হবে?'

'গোটা কুড়ি।'

চমৎকার! আমি গিয়ে ফটকটা বন্ধ ক'রে দিলুম। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কেউ যেন আবার আচমকা এসে উদয় না-হয়। পাশেই তার বিবিদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো, তাড়া করে গিয়ে তাদেরও আমি বার ক'রে দিলুম। তারপর ফিরে এসে খুব গম্ভীরভাবে আমার চেয়ারে ব'সে পড়লুম। চোখ মুদে একটা ভারি গম্ভীর ভারিক্কি চালে আমি ঘোষণা করলুম:

'উঠোনের সব বালি এক্ষুনি ২২ ক্যারেট সোনা হ'য়ে যাক!' তারপর চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলুম। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্। কিছুই বদলায়নি। বালির দানাগুলি যেমনকে তেমন, শাদাই, থেকে গিয়েছে। আমি গিয়ে ফটকটা খুলে দিয়ে এলুম। ফিরে এসে চেয়ারে গা এলিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললুম:

'ঐ সেকেলে বস্তাগুলো তুমি কাবাড়িওয়ালার কাছে বেচে দিতে পারো না?'

ভেবে দেখলুম, বালিকে সোনায় বদলে ফেলার এই ইচ্ছেটার পেছনে আমার স্বার্থ-

পরতাই কাজ করেছিলো। অলৌকিক কাণ্ডগুলোর যতদূর সম্ভব নিঃস্বার্থই হওয়া উচিত। এবার দেখি শাদা লেগহর্ন আবার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি চোখ বুজে একমনে খুব খানিকটা প্রার্থনা করে নিলুম। তারপর কুঁকড়োর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি দৈববাণী করলুম :

'এখন, এই মুহূর্তে, শাদা লেগহর্ন একটা ডিম পাড়বে।'

আশ্চর্য ! সত্যি, ভারি তাজ্জব ব্যাপার ! কুঁকড়ো মোটেই কোনো ডিম পাড়লে না। তা যাক গে, আমাদের যথেষ্ট ডিম আছে, কাজেই তার ডিমের জন্যে খুব-একটা জরুরি চাহিদা নেই। কিন্তু এই বৃষ্টিবাদলার মরশুমে আমার ছাতাটা খুবই কাজে লাগবে—আর সেটা কিনা এখন ছ-মাইল দূরে কোন্ লেখকসভার ঘরে প'ড়ে আছে। কাজেই আমি গভীর খানিকটা ধ্যান ক'রে নিয়ে বললুম : 'ছাতাটা এক্ষুনি আমার কাছে চ'লে আসুক।'

আর, আমাকে বেজায় তাজ্জব ক'রে, ছাতাটার কোনো পুনরাবির্ভাবই ঘটলো না !

রেগে তিনটে হ'য়ে, দারুণ উত্তেজিত মনে, আমি যখন সেখানে ব'সে আছি, বেড়াল ছানাটা দৌড়ে এসে আমার কোলে লাফিয়ে উঠলো। আমার কোলে কোনো কুঁকড়ো বা বেড়াল উঠুক, এটা আমি আদপেই পছন্দ করি না। আমি বেড়ালটার ঘেঁটি ধরে সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেললুম। সে-সময় দরদের মূর্তিমতী প্রতিমা অতীব সদাশয়া শ্রীমতী রাজালা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন আমি বেড়ালটাকে ছুঁড়ে ফেলছি। তিনি বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর আমার দিকে আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে প্রায় বুকফাটা আর্তস্বরে, আমার স্ত্রীকে ডাক দিলেন।

'অ্যাঁ ? কী হয়েছে ?' স্ত্রী খুব উদ্বিগ্নভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, পেছন-পেছন আমার মেয়ে।

'কাইসুকে ছুঁড়ে ফেলেছেন।...' খুব চেষ্টা করে কান্না চেপে, কোনোমতে, ধরা গলায় শ্রীমতী রাজালা বললেন।

মা আর মেয়ে আগুনরাঙা চোখে আমার দিকে তাকালেন, তারপর তাকিয়ে দেখলেন আমি কোথায় ব'সে আছি আর কোথায়ই বা আদরের কাইসুকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এরা দূরত্বটা ফিতে দিয়ে মাপবে না কি ? না, সবাই আমার কাজটায় কেমন চ'টেম'টে অন্দরে চ'লে গেলেন।

ভেতর থেকে আমার স্ত্রী বিষেযে না যতটা তার চেয়েও বেশি রেগে টং হ'য়ে শুনিয়ে বললেন : 'অবোলা জীবদের কষ্ট দেওয়া মহা পাতক।'

তা মানি। কিছুক্ষণ পরে আমার মেয়ে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাগি চোখে আমার দিকে তাকালে।

'কাইস্থ তোমাকে ঠিক আঁচড়ে দেবে, তাভো দেখো !' রেগে আর কেঁদে সে আমায় সাবধান ক'রে দিলে।

৪

তা ঠিক, যে কোনো বেড়ালই আমাকে আঁচড়ে দিতে পারে। যে-কোনো মুরগিই আমাকে ঠুকরে দিতে পারে। যে-কোনো গোরুই আমাকে শিং বাগিয়ে গুঁতিয়ে দিতে পারে। পারবে না কেন। আমার তো আর অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই।

সব্বাই যখন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চলেছে, তখন এঁরা একদিন ঠিক করলেন এবার কাইস্থর কান বেঁধাতে হবে। কারা ঠিক করলেন? আমার স্ত্রী ও অন্যান্য ভাগ্যবন্তীরা। তাতে বুঝি বেড়াল ছানাটার ব্যথা লাগবে না? তাতে কি, সব মহিলাই এমনতর ছোটোখাটো ব্যথা সহ্য করেছেন। এখন প্রশ্ন হ'লো কাইস্থর কানের দুলগুলো কেমন হবে! মহিলাদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিলে, প্রত্যেকেরই ইচ্ছে গয়নাটা যেন তাঁরই পছন্দমাফিক হয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর একজোড়া বাড়তি স্টেনলেস স্টিলের দুল ছিলো, ফলে ঠিক হ'লো আপাতত তাতেই কাজ চলবে। আমার স্ত্রী বস্তা শেলাই করার একটা ছুঁচ আর দুলজোড়া বার ক'রে নিয়ে খাদিজা বিবির হাতে সব তুলে দিলেন। মহিলারা সবাই কাইস্থকে চেপে ধ'রে আছেন। যখন ছুঁচটা তার কানে বিঁধলো, বেড়াল ছানাটি আঁৎকে উঠে লাফিয়ে তাদের হাত ছাড়িয়ে তাঁদের আঁচড়ে-টাচড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপর সোজা গিয়ে বসলো উঠানের একটা গাছের মগডালে; নিচে কুঁকড়ো কোঁকরকো, কুকুরটা চ্যাচাচ্ছে ভৌ-ভৌ, আর আমার মেয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে—

: 'কাইস্থ···সোনা তো, নেমে এসো। ওরা তোমায় মারবে না। ওরা শুধু তোমার কান বেঁধাবে একটু!'

আমি তখন এই হুলুস্থুল থেকে অনেক দূরে ব'সে ব'সে কী যেন ভাবছি। গভীরভাবেই ভাবছি। আমার সামনে আমগাছটাকে পেঁচিয়ে উঠেছিলো বুগেনভিলিয়ার ঝাড়, এখন সেখানে যেন রঙের হাট ব'সে গিয়েছে। অনেক দূর থেকে একটা ছোটো চারা এনে বেশকিছুদিন আগে এই বুগেনভিলিয়াকে আমি এখানে লাগিয়েছিলাম। কোত্থেকে এলো এই ফুল? সে কার জন্যে তারা ফুটে উঠলো হঠাৎ? উঠোনে হরেক জাতের ফুলগাছের ঝাড়—নানা ধরনের গোলাপ, জুঁই। এই সুন্দর ফুলগুলোর এমন আশ্চর্য ঐশ্বর্য কেন আছে? কেন মাটিকে দেয়া হ'লো এই রংবাহারের সম্পদ?

ফলমূল, শাকসব্জি, নানা জাতের কন্দ—এদের সকলেরই কি জন্ম হয়েছে মানুষের জন্যে?…

'বেড়ালটাকে ধ'রে এনে ওর কানটা একটু বিঁধিয়ে দেবে?' অন্দর থেকে আমার স্ত্রীর গলা এলো।

আমি রেগে গেলুম। সাবেক কালের কোনো স্বামী হ'লে দিতো দুই লাথি কষিয়ে। যখন এক দার্শনিক বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের জটটা খোলবার চেষ্টায় এমনভাবে তন্ময় হ'য়ে আছে, তখন কি না তাকে বলা হ'লো কোথাকার কোন্ নোংরা এক বেড়ালছানাকে পাকড়ে ধ'রে তার কান বিঁধিয়ে দিতে। তবু আমি উঠে পড়লুম চেয়ার ছেড়ে, গাছে চ'ড়ে ছোট্ট বেড়ালটাকেও পাকড়ালুম। তাকে মেয়ের কোলে তুলে দিয়ে বললুম; 'কাল না-হয়ত ওর কান বেঁধানো যাবে। এখন আমি ব্যস্ত আছি।'

'হুম্ ওঁর শুধু সেই সবসময়ই "ব্যস্ত আছি"!' স্ত্রী অন্দরে বিড়বিড় ক'রে উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সবাইকে দেখা গেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে—'সবাই' মানে আমার স্ত্রী, পাড়ার মহিলারা, আমার মেয়ে ও বেড়ালছানা। জিগেশ ক'রে জানলুম তাঁরা কাইস্থকে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন।

এতক্ষণে—শাদা লেগহর্ন আর আমি—দুজনে নিরিবিলি পেলুম একটু। সে উঠোনে কী যেন খুঁটছিলো আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলো।

'কী, তোমার বিবিরাও বুঝি সমুদ্র দেখতে বেরিয়েছে?' আমি তাকে জিগেশ করলুম।

সে জবাবে বললে, 'কোঁকরকো'…। অমনি তার বউয়েরা হুট ক'রে উঠোনে ভিড় ক'রে এলো।

আমি তাদের জন্যে কিছু গমের দানা নিয়ে এলুম। ওরা যখন খাচ্ছে তখন আমি এক-এক ক'রে সব ক-টাকে গুনলুম। মাত্র পনেরোটি মুরগী। একটা আছে ঝুড়ির মধ্যে তার সদ্য-ফোটা ছানাগুলোকে নিয়ে। তাহলে হ'লো যোলো। আরো একটা তো চাই—সেই গায়ে ফুটফুট আঁকা মুরগিটা। 'আঃ…আঃ…আয়…' আমি তাকে ডাকলুম, উঠোনটার চারপাশে ঘুরে দেখলুম তার খোঁজে। না, কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ এমন সময় খুব করুণ স্বরে একটা ব্যাঙ ডেকে উঠলো বাঁশঝাড় থেকে। গিয়ে দেখি, আরে! মুরগিটা সেখানে ম'রে প'ড়ে আছে। কয়েক হাত দূরে একটা সাত ফুট লম্বা গোখরো পড়ে আছে, একটা কোলাব্যাঙকে গেলবার চেষ্টা করছে। ফুটফুট ঐ মুরগিটাকে খামকা সে তবে ছোবলালো কেন?

আমি একটা লম্বা বাঁশের ডগায় এক শক্ত সুতোর ফাঁস বানালুম। অন্য সময় হ'লে এই বদমেজাজি ভীষণ সাপটা ফণা মেলে তিন ফুট দাঁড়িয়ে উঠতো। এখন যখন

একটা মস্ত কোলা ব্যাঙ গিলেছে, তার নড়াচড়ায় কেমন একটা যেন আলস্য, সেই বিদ্যুৎচমক আর নেই। আমি বাঁশটা বাড়িয়ে ধরে ফাঁসটা তার গলায় পরিয়ে টান দিতেই ফাঁসটা তার গলায় আঁটো হ'য়ে আটকে গেলো। এবার সে ফাঁদে পড়েছে। আমি টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে এলুম। আমি মরা মুরগিটাকেও নিয়ে এসে সাপের পাশে শুইয়ে রাখলুম।

তারপরে ফিরে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলুম। শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো আর তার অন্য বিবিরা মরা সঙ্গিনীর চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো।

সাপটাকে থেঁৎলে মারতে দেখে আমার কেমন গা গুলিয়ে গিয়েছিলো, বেদম বমি পেয়েছিলো, রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে বিচ্ছিরি সব দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে-আঁৎকে উঠেছিলুম।

সেই আদিকাল থেকেই সাপ একটা বিজাতীয় আতঙ্কের উৎস। হিন্দু পুরাণের অনন্তনাগ আর বাসুকির বংশধর এরা—বাসুকি আবার শিবের গলার মালা। হিমালয়ে কৈলাসের চুড়োয় থাকেন শিব আর পার্বতী—পৃথিবীর যেটা সবচেয়ে উঁচু জায়গা। অনন্তনাগের ফণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী, আর অনন্ত—তার অযুত-নিযুত মাইল লম্বা শরীর নিয়ে—ছায়াপথে কুণ্ডলি প্যাকিয়ে শুয়ে আছে। জগতের রক্ষাকর্তা মহাবিষ্ণু আর তাঁর স্ত্রী মহালক্ষ্মী অনন্তনাগের শরীরের নরম-কোমল বিছানায় শুয়ে আছেন। বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়ে এসেছে এক পদ্মের মৃণাল, আর সেই বিশাল পদ্মের মাঝখানে থাকেন ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা…

…জগতের প্রাচীনতম ধর্মের এই চিত্রপ্রতিমা কী চমৎকার! সাপেদের যে ঐশী ক্ষমতার অধিকারী ব'লে ভাবা হয়, তাদের যে পুজো করা হয়, তাতে আর আশ্চর্য কী। অনেক মন্দির আছে, যেখানে এখনও নাগদেবতার পুজো করা হয়, তাছাড়া সাপেদের বিশাল সব সম্পদের প্রহরী ব'লেও ভাবা হয়। অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক আর কর্কটক—এঁরা দৈবী নাগদের মহত্তম প্রতিভূ।

ফাঁসের মধ্যে আটকানো সাপটার দিকে তাকিয়ে দেখি, ব্যাঙটা, তার শরীরের মধ্যে আস্তে-আস্তে নেমে যাচ্ছে। উল্লাসে সে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে আছে, ভেতরে তার শিকার টেরও পায়নি সত্যি কী ঘ'টে গিয়েছে। ব্যাঙটা যদি তার ভেতরে না-থাকতো, তবে এতক্ষণে সে ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ংকরভাবে হিশ-হিশ ক'রে উঠতো। যে-সাপ তার ফণা মেলে আচম্বিতে উঠে দাঁড়ায়, সে হ'লো সত্যিকার আতঙ্কের দৃশ্য।

প্রায় সব ধর্মেই সাপের একটা প্রধান স্থান আছে। হিন্দুধর্মে, জৈনধর্মে, বৌদ্ধধর্মে, তাছাড়া আছে য়িহুদিদের ধর্মে, খ্রীস্টানদের ভাবনায়, ইসলামেও… সাপই ছিল শয়তানের অনুচর, সে-ই আদম আর হবাকে নিষিদ্ধ ফল খেতে উশকে দিয়েছিলো। সাপ ছিলো

শয়তানেরই এক হাতিয়ার। তাকে যেখানেই দেখবে, মারো। সে বিষাক্ত, তার ছোবলে মৃত্যু !

কাজেই, দুটি পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস : সর্পদেবতা ও সর্পশয়তান।, এদের দুইয়ের মধ্যে মিল ঘটানো যায় কীভাবে ?

আর, আমিই বা এখন এই সাপটিকে নিয়ে কী করবো ?

কাইস্ আর অন্যরা যখন সমুদ্র দেখে ফিরে এলো, তখন এই সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া গেলো।

'মারো এটাকে' আমার স্ত্রী আর খাদিজাবিবি তাড়া দিলেন।

'কাউকে প্রাণে মেরে ফেলা ঠিক নয়,' রাজালা আর সৌমিনী দেবী শাস্ত্রবাক্য আওড়ালেন।

কী তবে করা ? অবশেষে, শ্রীমতী রাজালার পরামর্শ অনুযায়ী, শ্রীযুক্ত কুট্টিরমণকে ডেকে পাঠানো হ'লো। জটাজুটধারী, শ্মশ্রুমণ্ডিত, ছেঁড়া কানিতে সজ্জিত, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুট্টিরমণ তলব পেয়ে এলো। কোনো হিন্দু বাড়িতে কোনো সাপের খোঁজ পেলে কুট্টিরমণ একটা লাঠি আর মাটির হাঁড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির হয়। তারপর সে সাপকে খেলিয়ে, তার লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আস্তে-আস্তে ঢোকায় তার হাঁড়িতে আর তাকে নিয়ে যায় কয়েক মাইল দূরের সর্পকভূতে ছেড়ে দেবার জন্যে। লোকে বলে, তার লাঠির মধ্যেই নাকি ওষুধ আছে, তাই সাপেরা অমনভাবে তার হুকুম তামিল করে।

কুট্টিরমণ এসে তার লাঠি দিয়ে আস্তে-আস্তে ঠেলে সাপটাকে হাঁড়ির মধ্যে ঢোকালে, তারপর একটা নারকোলের মালা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা ঢেকে দিলে। আমি তাকে একটা টাকা দিলুম। সে মাথা নিচু করে সেলাম ঠুকে বেশ খুশি হয়ে সাপটাকে নিয়ে চ'লে গেলো।

আমি নারকোল গাছের তলায় একট গর্ত খুঁড়ে মুরগিটাকে গোর দিয়ে দিলুম। আমার স্ত্রী কী একটা অদ্ভুত অজ্ঞাত রীতির কথা ব'লে মুরগির দাম হিশেবে আমার কাছে চারটে টাকা চাইলেন। তার বদলে মহিলারা আমাকে দিলেন সমুদ্রতীর থেকে কুড়িয়ে-আনা একরাশ শঙ্খ আর ঝিনুক।

আমাদের বাড়ির সামনেকার পায়েচলার পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই আমি তাকে ওখানে সাপখোপ আছে ব'লে সাবধান ক'রে দিতুম। রাত্তিরে যখন লোকে হালে-দেখা কোনো ছায়াছবির গান গেয়ে গেয়ে ও-পথ দিয়ে ফিরতো, আমি তাদের ডেকে এনে তাদের হাতে জলন্ত মশাল গুঁজে দিতুম। তবে তারা বেশ একটু অবিশ্বাস-প্রবণই ছিলো কপালে যদি সাপের মরণ লেখা থাকে, তাহ'লে এতে কি আর তা ঠেকানো যাবে ? তারা জিগেশ করতো।

স্ত্রী, কন্যা এবং বেড়ালছানা প্রায়ই পাড়াপড়শিদের বাড়ি বেড়াতে যেতো। অনেক সময় আবার বেড়ালছানাটি একাই উধাও হ'য়ে যেতো। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যেতো না। তখন বাড়িতে হুলুস্থুল প'ড়ে যেতো। কাইস্যু হারিয়ে গেছে।

আমার মেয়ে সারা উঠোনময় কাইস্যুর খোঁজে ছুটে বেড়াতো। আমাকে জিগেশ করতো, শাদা লেগহর্নকে জিগেশ করতো, গোরুগুলো আর কুকুরটাকেও জিগেশ করতো। এবং আমার স্ত্রী চীৎকার করে সারা বিশ্বকেই করতেন। কাইস্যুকে কেউ দেখেছে ?

তখন পাড়ার কোনো মহিলা হয়ত জানাতেন :

'কাইস্যু এখানে আছে !'

বেড়ার ওপর দিয়ে বেড়ালকে তখন এ-পাশে চালান ক'রে দেয়া হ'তো।

'আজ তুমি কাইস্যুর কানটা বিঁধিয়ে দেবে ? আমাদের বিয়েবাড়ি যেতে হবে,' আমার স্ত্রী একদিন বললেন।

'কিন্তু কাইস্যুও কি বিয়েবাড়ি যাচ্ছে নাকি ?'

কী একখানা প্রশ্নের ছিরি ! স্ত্রী, কন্যা, কাইস্যু এবং স্বয়ং এই অধম—আমরা সকলেই নাকি যাচ্ছি। সত্যি-বলতে আমি কিন্তু মোটেই যেতে চাইনি। আমার স্ত্রীর কোনো এক আত্মীয়ের বিয়ে। কাজেই স্বভাবতই অশ্রুজল, রোষায়িত লোচন, আধো-আধো নাকিসুরের কথা ইত্যাদি মারফৎ আমাকে অবশেষে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজি ও বাধ্য করানো হ'লো। না-গিয়ে আমার উপায় কী ?

সব দেশের স্বামীরা শুনুন, স্বর্গরাজ্য আপনাদেরই জন্যে রচিত হয়েছে।

'বেড়ালছানাটাকে না-হয় সঙ্গে না-ই নিলে,' আমি বললুম। 'আমাদের বারো মাইল বাসে ক'রে যেতে হবে খেয়াল রেখো।'

'কিন্তু মেয়ে কি তাতে রাজি হবে ?'

হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি। লাঠিপেটা করলে মেয়ে কেন, তার মা-ও রাজি হবে।—আমি মনে-মনে বললুম।

কিন্তু প্রকাশ্যে বললুম, 'বেড়ালদের যে বাসে নিয়ে যেতে দেয় না।'

'ওরা আমাকে আর কাইস্যুকে নেবে।'—বললে মেয়ে।

'বেশ।' আমি বললুম, 'তবে কক্ষনো যেন এমন ভাব কোরো না যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা দুজনে তোমাদের বেড়াল নিয়ে আমার চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে বোসো। আমরা কেউ কাউকে চিনি না, কী রাজি তো ?'

'বেশ। আমরা তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলবো না', আমার স্ত্রী রাজি হলেন।

'বেশ। তবে বিয়ে কবে ?'

উত্তর শুনে বললুম, 'মাত্র তিনদিন বাকি? তাহ'লে এক্ষুনি তোমার সাজগোজ শুরু করো।'

তবু আমরা কিন্তু সময়মতো রওনা হ'তে পারবো না, কেননা, মহিলাদের কস্মিনকালেও সময় সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। তাঁরা মোটেই পুরুষদের মতো নন, তাঁরা সবাই চিন্তাভাবনাহীন। মেয়েরা হচ্ছে অনন্ত কালেরই নিখুঁত প্রতীক। পুরুষরা সূর্যের দিকে তাকায়, ঘড়ি দ্যাখে, অ্যালার্মঘড়ি বাজায়, সময় নিয়ে ভেবে মরে, সবসময়েই তাদের উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ। কিন্তু ভাগ্যমন্তী মহিলারা বাস করেন চিরকালের বিরাট পরিসরটায়।

'তাহ'লে বেড়ালটার কান বিঁধিয়ে দেবে তো তুমি?'

'কাল।'

বেড়ার ওপাশ থেকে খাদিজাবিবি জিগেশ করলেন: 'কাইসুর কি কান বেঁধানো হ'য়ে গেছে?'

না। উনি বললেন কালকে।'

'সত্যি, পুরুষরা যেন কী, কিছু-একটা অনুরোধ করলেই তারা হাম্বড়া ভাব দেখাতে থাকে, যেন কতই ব্যস্ত মানুষ। আমরা অ্যাদ্দিনে একশো বেড়ালের কান বিঁধিয়ে দিতে পারতুম।'

ঠিক সেই সময়েই শঙ্খ-নির্ঘোষ হিন্দু সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা ঘোষণা ক'রে দিলে।

আমরা চা খেয়ে বিড়ি ধরালুম।

'মানুষকে যে অবতার বা দেবতা বানিয়ে দেয়া হয়, সে-সম্বন্ধে আপনার মত কী?' আমি জিগেশ করলুম।

'এ কোনো নতুন ব্যাপার নয়। আগে রাজারাই তাঁদের প্রজাদের কাছে ভগবান ব'লে গণ্য হতেন। যদি মানুষকে, এই হাসিখুশি চলমান পায়খানাকে, ভগবান বানিয়ে দেয়া হয়, তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কোনো-কোনো আদিবাসীর কাছে মাকড়শাও দেবতা। তারপর গাছপালা, পাহাড়পর্বত, নদনদী, জীবজন্তু...'

'আপনি কি বাছুর-দেবতার কথা শুনেছেন, মহাত্মন? মিশরে প্রাচীন—সভ্যতার যেটা লীলাভূমি—ফারাওদের আমলে বাছুর দেবতা ছিলো! সিংহাসনে বসলে এ রাজাই সত্যিকার দেবতা ব'লে গণ্য হতেন। য়িহুদিরা যাঁকে মোশে বলে, খ্রীস্টানরা মোজেস, আর মুসলমানরা মুশা নবী—সেই পয়গম্বরের আমলে লোকে একটা সোনার বাছুরের পুজো করতো, তার চোখগুলো ছিলো হিরের।'

'কেনই বা নয়? মানুষ'...'দীর্ঘ নীরবতার পর সন্ন্যাসী আবার শুরু করলেন, 'সেও তো এক প্রাণী—তার বিস্তর ক্ষমতা, আশ্চর্য আর অগম্য। হে মহান শক্তি, যে-

তুমি মানুষ. অন্য-সব প্রাণী আর অসংখ্য বিশ্ব সৃষ্টি করেছো, তোমার আশীর্বাদের রশ্মিচ্ছটা আমাদের অখ্যাত আর নগণ্য আত্মার ওপর বর্ষিত হোক।'

অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো। আশপাশের বাড়ির আলোগুলো গাছপালার সবুজের মধ্যে ঝলমল ক'রে উঠলো। সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। রাত্রি। দিন ফুটে ওঠে। মধুর হাসিতে মঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে মুকুল। সকালবেলায় আলোয় চঞ্চল ছুটে বেড়ায় রঙিন প্রজাপতি। মৃদু হাওয়া এসে কানে-কানে ফিশফিশ ক'রে কত কী ব'লে যায় পাতাদের··· দাড়ি কামিয়ে, স্নান ক'রে, গোঁফে কলপ লাগিয়ে, আমি ব'সে ব'সে বিড়ি টানছিলুম। সত্যি, কী সুন্দর এই জগৎ, আমার মনে হ'লো। তাঁর এই মধুর সব আশীর্বাদের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এইভাবে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবার দিনটাও ভোর হ'লো একদিন। স্নান ক'রে সাজগোজ সেরে সারাক্ষণ আমার স্ত্রীকে তাড়া দিতে-দিতে আমায় বারান্দায় ব'সে-ব'সে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'লো। তাড়াহুড়ো ক'রে সাজগোজ সেরে আমরা সবাই বাসে গিয়ে চাপলুম।

আমি বসেছিলুম সামনের দিকে। ঠিক তার পেছনের আসনে বসেছিলেন আমার স্ত্রী—কন্যা তাদের বেড়ালছানাটিকে নিয়ে। আমার স্ত্রী আমায় মেয়ের জন্যে টিকিট কাটতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর মতে, মেয়ের বয়েস খুবই কচি। কিন্তু কণ্ডাক্টর তাতে সায় দেবে ব'লে মনে হলো না। ('যখন আমার সুউত্তমা পত্নী আর বদমায়েশ কণ্ডাক্টর বাস ভাড়া নিয়ে বচসা শুরু ক'রে দিলেন, তখন কি আমার নীরব দর্শক হয়ে ব'সে থাকা উচিত ছিলো।' স্বামীর কর্তব্যই হচ্ছে বদমায়েশটাকে ঘায়েল ক'রে ফেলা।

বাস ছেড়ে দিলে, বেশ জোরেই ছুটছে। কণ্ডাক্টর বাসের এক প্রান্ত থেকে ভাড়া নিতে শুরু করলে, পয়সা নিয়ে সে তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটায় রাখে। হঠাৎ আমায় সব নির্দেশ ভুলে গিয়ে, আমার মেয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'তাত্তো, কাইসু হিসি করতে চাইছে···'

কাউকে যেন কিছু বলছি না এমন ভান ক'রে আমি বললুম, 'বাস থামুক, সোনা।'

'বাস থামাও, তাত্তো।'

ইতিমধ্যে কণ্ডাক্টর কাছে এসে পড়েছে। তার গোঁফজোড়া শুধু পাকানো নয়, দস্তুরমতো হিংস্র, আমায় চেয়েও ভীষণ। সত্যিকার গোঁফ কিনা তা অবশ্য জানি না। আজকাল সবার গোঁফ আর চুলের দিকেই আমি গম্ভীর সন্দেহের চোখে তাকাই। ছাখেননি, কতরকম বিরাট-বিরাট কালো সুতোর পুঁটুলি মহিলারা কেমন ক'রে তাঁদের খোঁপার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন?

আমার স্ত্রীকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না-দিয়ে আমি তাকে জিগেশ করলুম:

'বেড়ালছানা, আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী আর আমি — কটা টিকিট কাটবো ?'

( বেড়ালছানাটাও মহিলার বাচ্চা নাকি ! খামোশ ! বেত্তমিজ ! )

ওপরের এই দ্বৈতালাপ অবশ্যি বাস্তবে ঘটেনি। তবে কণ্ডাক্টর কেমন বিচ্ছিরি তীক্ষ্ণ-চোখে কাইস্থুর দিকে তাকিয়েছিলো। কাইস্থুও তার দিকে তাকালো।) দুজনেই তারপরে মুচকি হাসলো।

'বেড়ালছানার জন্যে টিকিট লাগবে না। তিনটে টিকিট — কোথায় যাবেন ?'

'বাচ্চা মেয়ে, খুব ছোট্ট না ? দুটো টিকিট হ'লেই তো চলবে,' আমার স্ত্রী গলা নামিয়ে গর্জন ক'রে উঠলো।

'বাচ্চা হ'লো কাইস্থু, আমি নই।' — কন্যার বয়ান।

'তাহ'লে আড়াইখানা টিকিট। কোথায় যাবেন ?' — কণ্ডাক্টরের জিজ্ঞাসা।

স্ত্রী জায়গাটার নাম বললেন। আমি পয়সা দিলুম। কণ্ডাক্টর দুখানা পুরো ভাড়ার টিকিট আর একটা হাফ টিকিট আমার হাতে তুলে দিলে। আমার স্ত্রীর দিক থেকে দুটি অগ্নিবর্ষী ঝিলিক এলো। এক. কেন আমি বলেছিলুম যে বেড়ালছানাটাকে বাসে ক'রে নিয়ে যেতে দেবে না। দুই. কেন আমি বাচ্চা মেয়ের জন্যে একটা পুরো টিকিট চেয়েছি। আমার স্ত্রী তো সেটাকে কত সহজেই হাফ টিকিটে নামিয়ে এনেছেন। সমগ্র স্ত্রীজাতিই তাঁর এই দিগ্বিজয়ে যথার্থ গর্ব অনুভব করতে পারে।

অবশেষে আমরা বিয়েবাড়ি গিয়ে পৌছলুম। প্রথমে হেঁটে গিয়ে ঢুকলো আমাদের মেয়ে, কাঁধে বেড়ালের বাচ্চাটা। মুহূর্তের মধ্যে আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে জেনানা মহলে মিলিয়ে গেলেন। পরে শুনেছিলুম, তাঁদের দারুণ খাতির ক'রে আপ্যায়ন করা হয়েছিলো। সব্বাই একবার ক'রে বেড়ালবাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করলে, চুমু খেলে, বাহবা দিলে।

ফেরার পথে আবার বাসে ব'সে আছি। প্রতিমুহূর্তে আমি স্ত্রী-কন্যাকে বোঝাচ্ছিলুম, 'খুব শক্ত ক'রে হাতল ধ'রে থাকবে। নইলে ঝাঁকুনি লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়বে কিন্তু। বাস তখন জোরে একটা মোড় বেঁকেছিলো। টাল সামলাতে না-পেরে অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল — কে ? কে আবার ? পড়লুম আমিই !...

আমি এমনভাবে উঠে দাঁড়ালুম যেন কিছুই হয়নি। এভাবেই সাধারণত যেন আমি ভ্রমণ ক'রে থাকি। ধুলো ঝেড়ে সোজা গিয়ে নিজের আসনে ব'সে পড়লুম। এ যে সমগ্র 'পুরুষজাতিরই' লজ্জা, তা আমি স্বীকার করি।

'তোমার লেগেছে ?' হাসি চেপে আমার স্ত্রী জিগেশ করলেন।

আমার মুখ থেকে যেন সব রক্ত উধাও হ'য়ে গিয়েছে। কী লজ্জা ! এবার কি আস্ত গোঁফজোড়াটাই উপড়ে ফেলবো নাকি ?

বাস থেকে নেমে আমরা বাড়ি এলুম, খানিকটা পথ হেঁটে। পাড়ার মহিলারা অমনি সবাই কলরোল তুলে এসে হাজির। সব্বাই আমার 'মহাপতনের উপাখ্যান' সবিস্তারে জানতে চাইছেন। শুনে, সব্বাই খুশি, প্রচুর হাসাহাসি হ'লো—'মেয়েদের সম্বন্ধে আর-কখনো কোনো খারাপ কথা বলবেন? বললেই চিৎপটাং পড়বেন কিন্তু আবার।'

যাঃ, মানসম্মান সব জলাঞ্জলি গেলো? লজ্জায় আর মাথা তুলে তাকাতে পারি না। মহিলাদের মুখের দিকে তাকাবার সাহস জোটাতে না-পেরে যখন বেজায় মনমরাভাবে দিনগুলো কাটছে তখনই ঘটলো ব্যাপারটা—সব আশ্চর্যকে হার-মানানো দুর্দান্ত এক আশ্চর্য কাণ্ড।

এক আণবিক বোমাই বুঝি ফেটেছে এই মধুরাদের প্রাণের মধ্যে।

এবার থেকে 'পুরুষরা' আবার সগর্বে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারবে। সে আবার চাড়া দিতে পারবে গোঁফে, নির্ভয়ে আবার তাকাতে পারবে মহিলাদের মুখের দিকে। সেলাম, পুরুষজাতি। আর নিছক দয়াপরবশ হ'লে স্ত্রীজাতিকেও আপনি ইচ্ছামতো একখানা সেলাম ঠুকতে পারেন।

ব্যাপারটা কী?

মহিলারা, অর্থাৎ খাদিজাবিবি, শ্রীমতি রাজালা, সৌমিনীদেবী এবং আমার স্ত্রী কেমন হতভম্বভাবে জবুথবু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি? কিছুই বুঝতে না-পেরে আমার বেচারি মেয়েই সেখানে দাঁড়িয়ে হাপুশ নয়নে কাঁদছে।

কয়েক মিনিট আগেই আমি তিন মহিলাকে দেখেছি হন্তদন্তভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে—হয়তো আমার স্ত্রীর কাছ থেকেই কোনো জরুরি তলব পেয়ে এসেছেন, আমি তখন ভেবেছি। তাঁদের চোখগুলো সব মশালের মতো জ্বলেছে—আমি কিছুতেই ভেবে পাইনি কেন।

পরে অন্দর থেকে হাঁকডাক চ্যাঁচামেচি উঠেছে। তারপর মারধোরের শব্দ, গালাগালি, বকুনি, ফোঁসফোঁস রোষ।

কাঁদতে-কাঁদতে মেয়ে চ'লে এসেছে আমার কাছে, 'এসো না, তাত্তো, ওরা যে কাইসুকে মেরে ফেলছে', সে ধরা গলায় বলেছে আমায়।

আমি অবশ্য ছুটে যাইনি, বরং ধীরে-সুস্থেই কেমন একটা গদাইলস্করি চালে অকুস্থলে প্রবেশ করেছি। গিয়ে দেখেছি, মহিলাদের চামুণ্ডামূর্তি, চার-চারজন ভদ্রকালী একযোগে উপস্থিত, আর বেচারা কাইসু মাঝখানটায় কুঁকড়ে আছে, সব গয়নাগাটি খুলে ফেলা হয়েছে তার পা থেকে; এখন তার গলায় একটা দড়ির ফাঁস, দড়িটা জানলার শিকের সঙ্গে বেঁধে রাখা; বেচারা বেড়ালবাচ্চাটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, কেমন

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মহিলারা একেকজনে পালা ক'রে ক'রে পর পর ওকে মেরেছেন। এবার আমার স্ত্রীর হাতে ঝাঁটাটা, সেটা তুলে মারতে যাচ্ছেন বেড়ালটাকে, রাগে তাঁর মুখ রাঙা হ'য়ে উঠেছে, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। ঠিক এই মুহূর্তেই আমি গিয়ে অকুস্থলে ঢুকেছি। কাইসুমু কিছু চুরি করেছে নাকি?

'আরে? কী ব্যাপার? কাইসুমু কিছু চুরি করেছে নাকি', আমি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিগেশ করেছি।

কোনো জানান না-দিয়েই হঠাৎ একসঙ্গে চারজোড়া মহিলাচক্ষু আমার ওপর অগ্নিবর্ষণ শুরু ক রে দিয়েছে। মিনিটখানেক পরেই আগুন বদলে গিয়েছে ধারাজলে। মহিলারা আবার যথাযথভাবে মেয়ে হয়ে উঠেছেন। ধরাগলায় আমার স্ত্রী আমাকে জিগেশ করেছেন : 'কাইসুমুকে তুমি হুলোবেড়াল ক'রে দিলে কেন?'

তক্ষুনি ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয়নি আমার। কী করা উচিত আমার? হাসবো, না কাঁদবো?

'অ্যাঁ?' আমি জিগেশ করেছি, 'কাইসুমু বুঝি হুলো হ'য়ে গেছে?'

'হুলো হ'য়ে গেছে?' সৌমিনীদেবী বলেছেন তীব্র টিটকিরি দিয়ে। 'আমরা শুধু জানতে চাই, আপনি ওকে হুলো বানিয়ে দিয়েছেন কেন?'

৫

ওদের মতো অত বড়ো না-হোক ছোটখাটো বোমাই বুঝি তখন ফেটে পড়েছে আমার মগজে।

বেড়ালবাচ্চাটার ঘেঁটি ধ'রে তুলে তাকিয়ে দেখেছি : সত্যি সে মেনি নয়, হুলো।

কী ক'রে ঘটেছে ভুলটা?—আমি বেশ বিমূঢ়ই বোধ করেছি। বেড়ালবাচ্চাটা নিশ্চয়ই প্রথম থেকেই হুলো ছিলো, কিন্তু তখন তা কেউ খেয়াল করেনি। মহিলারা ধ'রেই নিয়েছিলেন সে মেনি আর সেই বিশ্বাসটাকেই সজোরে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তবু, ওঁরা সকলে মিলে এমনতর একটা ভুল করলেন কী ক'রে?

আমিও তো একে মেনি ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলুম। অন্য-কিছু যে হ'তে পারে, ঘুণাক্ষরেও সে রকম কিছু ভাববার কোনো অবকাশ ছিলো না আমার। গোরুর যে-বাছুর দুটো জন্মেছে, আমার স্ত্রী বলেছেন দুটোই গাইগোরু, আমিও তাই ধ'রে নিয়েছি। এমন কি সেগুলো হঠাৎ একদিন বলদ হ'য়ে যাবে নাকি? তারা জন্মেছে প্রায় বছর খানেক হ'লো, তবু আমি গোলঘরে ছুটে গিয়েছি স্বচক্ষে দেখে আসতে।—না, তারা গাইগোরুই বটে!

মহিলামহলে ফিরে গিয়েছি আমি, আবার একটা টেবিলে ব'সে চুপচাপ অপেক্ষা করেছি বিচারের শেষে আমার বিরুদ্ধে কী রায় দেয়া হয়।

চারটে বেড়ালবাচ্চা ছিলো—দুটো মেনি আর দুটো হুলো—হুলো দুটো আর একটা মেনিকে শেয়ালে খেয়ে ফেলেছিলো। বাকি যেটা র'য়ে গিয়েছিলো,সেটা ছিলো মেনি—অন্তত যখন আমি সেটা রাজালাকে দিই তখন।'—খাদিজাবিবি জবানবন্দী দিয়েছেন।

'আমি ওটাকে হুলো বানিয়ে দিইনি,' ব'লে চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে বেড়ালবাচ্চাটার গলায় ফাঁস খুলে দিতে গিয়েছি আমি। 'ও হুলো হ'য়েই জন্মেছিলো।'

'ও মেনি ছিলো।'—আমার স্ত্রী বলেছেন।

'হুলো ছিলো।'

'তুমি ওটাকে ভোজবাজি ক'রে হুলো বানিয়ে ফেলেছো, আমার স্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।

'আশ্চর্য বেড়াল!' বলেছেন শ্রীমতী রাজালা। 'ভোজবাজির বেড়াল!'

'হ্যাঁ, এটা একটা ভেলকি বেড়াল!' মহিলারা সবাই একসঙ্গে গেয়ে উঠেছেন।

'তোমাদের কি সত্যি মনে হয় আমিই ওটাকে হুলো বানিয়ে দিয়েছি?'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে তখন নীরবতা নেমে এসেছে ঘরে। তারপর গুলির মতো আমার দিকে পর-পর ছুটে এসেছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমি যতদূর-সম্ভব এ-পাশ-ও-পাশ ক'রে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করেছি।

'তাহ'লে কেন আপনি অ্যাদ্দিন ধ'রে এটার কান বিঁধোতে গড়িমসি করেছিলেন?'

'সে আমি লোকটা নেহাৎ কুঁড়ের বাদশা ব'লেই!'

'কে বলেছিলো মেয়েরা সব সংখ্যায় হু-হু-ক'রে বেড়ে যাচ্ছে?'

'আমি!'

'কে ঐ ভয়ানক সাপটাকে ধরেছিলো?'

ব্যাঙ খেয়ে সাপটার ঝিমুনি ধরেছিলো, ও-অবস্থায় যে-কেউ ওকে ধরতে পারতো। তবু আমি সায় দিয়ে বলেছি:

'আমিই ফাঁস বানিয়ে সাপটাকে ধরেছিলুম।'

'কে আগে থেকেই ব'লে দিয়েছিলো যে চালকুমড়োগুলো ধপাশ ক'রে পড়বে?'

'আমি।'

'বলবামাত্র কি কাঁঠালগাছটা চারটে কাঁঠাল ফলিয়ে দেয়নি?'

'দিয়েছিলো।'

'কে তাকে ফলাতে বলেছিলো?'

'আমি।'

'কে আমাদের খেয়া পেরুবার সময় বাস থেকে নেমে পড়তে বলেছিলো ?'

'আমি।'

'কে তবে মেনি বেড়ালটাকে হুলো বানিয়ে দিয়েছে ?'

'আমি না !'

'ভদ্রলোকে কি কখনো মিছে কথা বলে ?'

'মিছে কথা ঠিক কারুই সদ্‌গুণ হ'তে পারে না।'

'তাহ'লে ?'

ইয়া খোদা ! হায় ঈশ্বর ! হায় মান্ধাতা ! বিরক্ত হ'য়ে বেড়ালবাচ্চাটাকে নিয়ে আমি বারান্দায় বেরিয়ে এসেছি। শাদা লেগহর্ন তখন দিব্যি খোশমেজাজে চেয়ারটায় চেপে বসেছিলো। আমি তা দেখেও কোনো উচ্চবাচ্যও করিনি বা কিছুই করিনি। যার যখন খুশি এসে আমার চেয়ারে বসতে পারে। আমি ধপ ক'রে মেঝেয় ব'সে পড়েছি, দেয়ালে হেলান দিয়ে। বেড়ালবাচ্চাটা গুটি গুটি এসে আমার কোলে উঠে বসেছে। থাকুক ব'সে ; ও তো আমারই জাতের। এখন গুনতিতে আমরা সবশুদ্ধ তিনজন – আমি, বেড়ালটা আর কুঁকড়ো। আমি সেখানে ঐভাবেই বিরস বদনে মন খারাপ ক'রে ব'সে থেকেছি কতক্ষণ। তারপরে আমার স্ত্রী একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সদলবলে এসে হাজির হয়েছেন। কুঁকড়োকে চেয়ারে ব'সে থাকতে দেখে ঝাঁটা দিয়ে সপাটে এক ঘা লাগিয়ে দিয়েছেন। অমনভাবে অপমানিত হ'য়ে শাদা লেগহর্নকে কেমন হতভম্ব আর বোকা-বোকা দেখালো ; সে লাফিয়ে পালক ফুলিয়ে নেমে পড়লো আর ডেকে উঠলো : 'কোঁকরকো ?' যেন বলতে চাচ্ছে যে 'খেপে গিয়েছো নাকি, বুড়ি ? জানো না আমি কে ?' আমার স্ত্রী তারপর বেড়ালবাচ্চাটাকে তুলে ধ'রে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

আমি সেবার তাকে যতদূরে ছুঁড়ে ফেলেছিলুম, তার চেয়েও অন্তত আরো হাত চারেক দূরে। তবু কিন্তু আমি মুখ ফুটে কাউকেই বলতে পারিনি যে 'অবোলা জীবদের কষ্ট দিতে নেই'। অন্য মহিলারাও তাঁদের চর্মচক্ষুতেই দেখেছেন বেড়ালটাকে ওভাবে ছুঁড়ে ফেলতে, কিন্তু তবু কেউ টুঁ শব্দটিও করেননি, কিংবা আমার স্ত্রীর দিকে চোখ লাল ক'রে কটমট ক'রে তাকাননি।

বেচারা পুরুষজাত ! ভাগ্যমন্তীরা তাদের যখন খুশি যেমন খুশি লাথি-ঝাঁটা হাঁকাতে পারে। কেননা পুরুষরা একেকজনে তো আসলে জন্ম অসহায়, জন্ম অনাথ।

মহিলারা চ'লে গিয়েছেন তারপরে, সদলে, যেমন এসেছিলেন। তবে ঠিক যেমন ভঙ্গিতে এসেছিলেন, পুরোপুরি তেমন ভঙ্গিতে নয় যেন। বেশ দ'মে গিয়েছেন তাঁরা অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছে ; আমার দিকে সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে এমনভাবে তাকিয়েছেন

যেন আমি কোনো নতুন নবী, নয়া কোনো পয়গম্বর। কোনো আওয়াজ না-ক'রেই তাঁরা চ'লে গিয়েছেন।

আমার মেয়ে তখন কাঁদতে-কাঁদতে আমার কাছে এসেছে।

'তাত্তো, ওঁরা এখন কাইস্নুকে নীলন্দন ব'লে ডাকছে,' সে ধরা গলায় আমাকে জানিয়েছে।

নীলন্দন! হুম, এখন যখন বোঝাই গেছে যে সে পুরুষ, তখন ইন্তেকাল হ'লে যাক না কেন দোজখে। চক্ষের পলকে সে এখন হিন্দু হ'য়ে গিয়েছে বুঝি? তাঁরা কি ওকে হুসেন ব'লে ডাকতে পারতেন না, খাদিজাবিবির স্বামীর যে-নাম? অথবা বাসু, শ্রীমতী রাজালার যিনি বর। অথবা রামকৃষ্ণণ, সৌমিনীদেবীর যিনি পতি পরমগুরু? বশীর ব'লে ডাকলেই বা কী ক্ষতি, আমার মেয়ের মার অনুগত বরটির যে নাম? এত-সব ভালো-ভালো নাম থাকতে এঁরা কিনা একে এখন নীলন্দন ব'লে ডাকছেন!

'এ-নাম ওকে কে দিয়েছে?' স্ত্রীকে আমি জিগেশ করেছি।

'রাগে-ক্ষোভে ফেটে প'ড়েই ও ওকে এ-নামটা দিয়েছে!'

'কে?'

'রাজালা।'

'হুম, মেয়েদের এত হৃদয়হীনা হওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, নামটা তাহ'লে তা-ই থাক—নীলন্দন!'

'তাত্তো. আমি নীলন্দন চাইনে,' মেয়ে বায়না ধরেছে।

'কেন সোনা? ও তো ভারি সুন্দর একটা ভোজবাজির বেড়াল।'

'আমি কোনো হুলো বেড়াল চাইনে, তাত্তো!'

আমার স্ত্রী তখন ব্যগ্রভাবে জিগেশ করেছেন: 'আচ্ছা, আবার তুমি ওকে মেনি বেড়াল ক'রে দিতে পারো না?'

'ওরে বেকুব, ওরে আহাম্মুক,' আমি তাঁকে ভৎর্সনা ক'রে বলেছি, 'তোমাদের মিছিমিছি লেখাপড়া শিখিয়ে কী লাভ, বলো! তুমি তো শেষ অব্দি মেয়েই। তবে, দোহাই তোমার, বেড়ালটা হুলো হ'য়েই জন্মেছিলো।'

'কিন্তু কেউ তো সে-কথা মানে না বা বিশ্বাস করে না।'

আমার স্ত্রী হঠাৎ কেমন যেন বেশ একটু মোলায়েম হ'য়ে গেছেন। চোখ রাঙানো নেই আর. কোনো চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলিও নেই।

'কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো কিনা সেটা তো বলবে,' আমি জিগেশ করেছি।

এটা আমারই ভোজবাজির ফল, এটা যদি তিনি বিশ্বাস না-করেন, তো এ-যাত্রায় হয়তো আমি বেঁচে যাবো। পয়গম্বরদের যে ঐশী ক্ষমতা আছে, গোড়ায় তাঁদের বিবিদের

তো তা বিশ্বাস করতে হবে। তারপরে আসবে যত অন্ধ বিশ্বাসী, সত্যের খোঁজে। এক্ষেত্রে এঁকে অন্তত যা আমাকে বিশ্বাস করাতেই হবে, তা হ'লো এই মোদ্দা কথাটা : আমি মোটেই কোনো পয়গম্বর নই।

'তুমি বললে অবশ্য মানতে পারি,' অবশেষে আমার স্ত্রী রাজি হয়েছেন।

আমি তাঁকে জোর ক'রে কিছু মানতে বলিনি, শুধু বলেছি :

'বেশ। তাহ'লে, শোনো, আমি বলছি যে বেড়ালটা হুলো হ'য়েই জন্মেছিলো। তোমরা মেয়েরা সেটা খেয়াল করোনি, তোমরা ধ'রেই নিয়েছিলে যে ও মেনি হবে—ওকে মেনি বানিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু পুরুষ হ'লো পুরুষ, সে চিরকাল পুরুষই থেকে যাবে।'

'বিয়েবাড়িতে অন্তত ষাটজন মেয়ে ছিলো, তারা সবাই ওকে আদর ক'রে চুমু খেয়েছে। ওদেরও কি সকলের ভুল হয়েছিল?'

'হয়েছিলো। লোকে সদলবলে এ-রকম ভুল করে। একে বলে গণবিভ্রম।'

'বেশ। তোমার কথাই তবে মেনে নিচ্ছি,' আমার স্ত্রী তখন মেনে নিয়েছেন।

আমার ভাগ্যটা যে ভালো, তার প্রমাণ, লেখকদের সভায় যে-আনকোরা ছাতাটা ফেলে এসেছিলুম, সেটাও এমন সময় আমি ফিরে পেলুম। 'আপনাকে এখানে পৌঁছে দিতে বলেছেন,' যে-ছেলেটি ছাতাটা নিয়ে এসেছিলো, সে বললে।

রাত্তিরে আমার স্ত্রী-কন্যা কিছুতেই তাঁদের মশারির মধ্যে বেড়ালবাচ্চাকে ঘুমুতে দিতে রাজি হলেন না। তাকে ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেতর থেকে খিল তুলে দেয়া হ'লো। বেড়ালটা বাইরে-বাইরে করুণ সুরে কেঁদে বেড়ালে—শান্তির সন্ধানে যেমন অস্থিরভাবে ঘোরে কোনো অশান্ত আত্মা।

'মেয়েদের মন কি তাহ'লে এতই কঠিন?' আমি জিগেশ করলুম। কোনো সাড়া নেই, হয়তো পাখার গুঞ্জনের তলায় আমার প্রশ্নটা চাপা প'ড়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু কী করা উচিত এখন আমার? আমি উঠে বাইরে বেরিয়ে এলুম। হঠাৎ একটা বিকট ঘেউ ঘেউ আর করুণ ও কাতর ডুকরানি। আমি কেমন হকচকিয়ে গেলুম। টর্চ জ্বেলে দেখি, নীলনন্দন কোনোমতে জানলা থেকে ঝুলে আছে, আর নিচে থেকে তাকে দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে যাচ্ছে।

কুকুরটাকে ধমকে চুপ করতে ব'লে আমি নীলনন্দনকে কোলে নিয়ে উঠোনে পায়চারি করতে লাগলুম। আকাশে চুমকির মতো তারা বসানো। ঝিঁঝি পোকারা একটা অন্তহীন যৌথ সংগীত বাজিয়ে চলেছে ঝিমধরা সুরে। আমি লক্ষ কোটি তারা ও অনন্ত ওপারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম...

কিছুক্ষণ পরে আমি নীলনন্দনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঘুমোবার আয়োজন ক'রে শুয়ে

পড়লুম। চক্ষের পলকে নীলন্দন লাফিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে গেলো, কিন্তু অমনি ক্যাঁক ক'রে এক লাথি খেয়ে মেঝেয় ছিটকে পড়লো। এ-খেলাটা বেশ কিছুক্ষণ ধ'রেই চললো। শেষটায় ক্লান্ত হ'য়ে অগত্যা বেড়ালটা আমার কাছে চ'লে এলো। আমার পায়ের কাছে শুয়ে প'ড়ে সে কেমন অদ্ভুত চকচকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, মনে হ'লো, যেন শুধোচ্ছে: আচ্ছা, এ-সবকিছুর মানে কী, তুমি বুঝিয়ে বলতে পারো?

'শোনো, তুমি হচ্ছো এক ভেলকি, ভানুমতীর খেলা, আশ্চর্য এক ভোজবাজির বেড়াল,' আমি তাকে বললুম, 'তোমার নাম নীলন্দন। ভেবো না। আমিই তোমাকে আশ্রয় দেবো।'

নীলন্দন আশ্বস্ত হ'য়ে চোখ বুজলো এবং পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালবেলায় তাকে অবিশ্যি আবারও নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হ'লো। কোনো থালা নেই, কোনো খাবার নেই, নেই কোনো সুরভিত চুম্বন। বেচারা খিদেয় ভারি কষ্ট পাচ্ছিলো। আমার মনে হ'লো, আচ্ছা, কোনো ভেলকির বেড়ালকে কি তার নতুন দশায় পুরোনো গায়ের রঙে মানায়? আমার গোঁফের কলপ মাখিয়ে তাকে কুচকুচে কালো ক'রে দিলে কেমন হয়? না, মহিলারা হঠাৎ তাকে কালো বেড়াল হ'য়ে যেতে দেখলে একযোগে মূর্ছা যাবেন। সে বরং তাহ'লে ধবধবে শাদা রঙের আশ্চর্য বেড়াল হ'য়েই থাক।

দুপুরবেলা খাবার সময় আমি আমার ভাগ থেকে কিছু খাবার এনে নীলন্দনকে দিলুম। অমনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠলো: 'চাল পাই র‍্যাশানে। ওকে সে ভাত খাইয়ে লাভ কা? বরং যে-মুরগিরা ডিম পাড়ে তাদের গিয়ে ভাত দাও।'

কঠিন, সত্যি, নারীহৃদয় অত্যন্ত কঠিন!

সন্ন্যাসী যখন এলেন, আমি তাঁকে নীলন্দন ও তার রহস্যময় লিঙ্গ বদলের কথা খুলে বললুম। শুনে ভারি মজা পেলেন তিনি, হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

'এই নীলন্দন সব স্ত্রীলোকের বিষম দুঃস্বপ্ন হ'য়ে উঠবে,' তিনি সাবধান ক'রে দিলেন। 'কাইস্‌ নামটা শুনে আমিও ভেবেছিলুম ও বুঝি কোনো মেনি বেড়াল। এখন ও কিনা জাদুবেড়াল হ'য়ে উঠেছে, দৈবশক্তির প্রতীক, পবিত্র মার্জার অবতার। লোককে একবার জানতে দিন না ব্যাপারটা, তারা সবাই ভোগ আর নৈবেদ্য নিয়ে আসবে। দ্যাখেননি, মীন অবতারদের উদ্দেশ্যে কেমনভাবে খাবার ছুঁড়ে দেয়া হয়! আজমিরের কাছে পুষ্কর হ্রদে...পৃথিবীতে কত যে পবিত্র জিনিশ আছে! মীন অবতার, অনন্তনাগ, তীর্থক্ষেত্র, পুণ্যনদী, ধর্মের ষাঁড়, দৈবী গাই, পুণ্য পাহাড়, দৈবী গুহা, পবিত্র রং......'

'পবিত্র কুমির,' আমি জুড়ে দিলুম।

'সে কোথায় ?'

'করাচির মন্দিরের এক বড়ো দিঘিতে। আমি দেখেছি পুণ্যার্থীরা কুমিরকে বড়ো-বড়ো মাংসের টুকরো খাওয়াচ্ছেন।'

'এরা সব লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। তবে কুমিররা কোথাও কোনো অলৌকিক কাজ করেছে কিনা আমি জানিনে। অলৌকিক বা ভোজবাজি বা ভেলকি ছাড়া কোনো ধর্মই টিকে থাকতে পারে না।'

'এমন কোনো ধর্ম কি আছে যার চুল দাড়ি রাখার নিজস্ব কোনো রীতি নেই ?'

'না। সেই জন্যেই আমি তাদের "কেশভিত্তিক" ধর্ম বলি।'

'চুলই বিশেষত্বের চিহ্ন—মানে যেভাবে লোকে চুল রাখে। চুল দেখেই শত্রু মিত্র ব'লে দেয়া যায়।'

'অথচ সবই কিনা হচ্ছে ভগবানের নামে। সকলেই তো মুক্তি চায়—মোক্ষ চায়। তাহলে এই শত্রুতা কেন ? লোকে সব ভাই-ভাই, আর ভগবান ভগবানই, যে নামেই তাঁকে ডাকা যাক না কেন ভগবানই সমস্ত সৃষ্টির শাশ্বত রক্ষক। তিনি তো আর বিশেষ কোনো ধর্মের একচেটে সম্পত্তি নন।'

'তাহলে সত্যিকার ধর্ম কী ?'

'সেটাই একটা ধাঁধা। আসুন, আমরা বরং এখানেই আলোচনায় ইতি দিই। ভগবান আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন !'

বেড়ালটা ততক্ষণে সন্ন্যাসীর কোলে উঠে বসেছে : তিনি তাকে খানিকটা আদর করলেন, তারপর চুপচাপ ব'সে কী যেন ধ্যান করতে লাগলেন।

সমুদ্রতীরের ঢেউয়ের শব্দ যেন অনেকটাই এগিয়ে এসেছে ব'লে মনে হ'লো। জেলেরা যখন মাঝরাতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিলো, তখন কিছু জানতো না এখন যখন মাছভরা নৌকো নিয়ে ফিরে আসবে, তখন তারা দেখতে পাবে যে সমুদ্রও মাছের বিনিময়ে তাদের ঘরবাড়ি সব নিয়ে নিয়েছে।

আমি একটা ফ্লাস্ক থেকে দুটো গেলাশে চা ঢেলে সন্ন্যাসীর দিকে একটা গেলাশ এগিয়ে দিলুম। যেন কতই গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুনছে, এমনি ভঙ্গি করে শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে।

চায়ের পর আমরা দুজনে বিড়ি ধরালুম।

'কাকে আপনি ধাঁধা বলছেন ?' আগের কথার জের ধরে আমি তাঁকে জিগেশ করলুম।

আমার কথায় কোনো কান না-দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 'এই-যে, মহাবিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার রূপ, যাদের মধ্যে আছে মাছ, কচ্ছপ, শুয়োর, সিংহ, তারপর আছে যেমন

পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, কল্কি—এ-সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয় ?'

'আমি কোনো উত্তর চাচ্ছি না,' তিনি নিজেই বলে চললেন। 'গৌতম বুদ্ধের কথা ধরুন। তিনি একজন মহামানব। ভারত, চীন, জাপান, তিব্বত এবং আরো সব দেশে তাঁর কত-কত অনুগামী আছে। মানবজাতিকে তিনি যে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা ছিলো অমূল্য। অথচ তিনি কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় কোনো ভেলকি কোনো ভোজবাজি দেখাননি। ৮০ বছর বয়েসে তিনি হজমের গণ্ডগোলে মারা গিয়েছিলেন। এদিকে এখন তাঁর অনুগামীরা তাঁর নাম নিয়ে অলৌকিক সব কীর্তি ক'রে যায়। ওরাই তাঁকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। দু' হাজার বছরেরও বেশি হ'লো তিনি মারা গেছেন। এখনও বৌদ্ধদের কাছে তিনি একজন দেবতা বই আর-কিছু নন। আর তাঁরও নাকি কত-কত অবতাররূপ আছে। দলাই লামা নাকি তাঁরই অবতার রূপ। এ-সব বিশ্বাস সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয় ?'

'আমি তো তাই ভাবছি, মহাত্মন।'

'হ্যাঁ, কিছু বলতে হবে না, একটু ভাবুন। স্মরণাতীত কাল থেকে কতই তো প্রবক্তা পেয়েছি আমরা। মোজেস, ডেভিড, জিসাস ক্রাইস্ট, মহম্মদ নবী—তাঁদের বেলায়ই বা কী ? কাকে অনুসরণ করবে মানুষ ? তাঁদের মধ্যে কে ছিলেন সত্যিকার ভগবানের দূত, সত্যিকার প্রবক্তা।'

'উত্তরগুলো নিজের কাছেই রেখে দিন,' তিনি ব'লে চললেন। 'ধর্মগ্রন্থগুলোর সংখ্যাটাই ধরুন না-হয়। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, ত্রিপিটক, বাইবেল, নবসন্ধি, কুর-আন, হাদিস, জর্মন পুঁথি, ডাস কাপিটাল, সত্যার্থ পরকাশ, গ্রন্থসাহেব—কাকে অনুসরণ করবে মানুষ।'

'এবার খাবারের সমস্যাটা ধরুন। যদিও এটাকে আমি খুব গুরুতর কোনো সমস্যা ব'লে মনে করি না।

'কেন, মহাত্মন প্রায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বেগে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। লোকের কোনো খাদ্য নেই। এটা কি মস্ত কোনো সমস্যা নয় ?'

'ভগবান যখন মানুষকে উদর ও মুখ সমেত সৃষ্টি করেছেন, তখন তাকে তিনি নিশ্চয়ই আহার জোগাবেন।'

'কিন্তু লোকে তো আর ভগবানের দুয়ারে গিয়ে খাবার চেয়ে চ্যাচায় না।'

'মাছ, পাখি, জীবজন্তু, জীবাণুরাও—জীবন্ত প্রাণীর যে কত বিচিত্র রূপ—তারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। সুতরাং তাদেরও সকলের জন্যে খাদ্য চাই। সে-খাবার তারা কার কাছে চাইবে ? ভগবানই তাদের আহার জুগিয়েছেন। কাজেই শুধু মানুষই কেন আলাদা ক'রে একটা মস্ত ঝামেলা পাকাবে ?'

'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ আর খাদ্যদ্রব্যের সীমাবদ্ধতা।'

'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করুন তাহ'লে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়ান। ব্যাস, সমস্তার সমাধান হ'য়ে গেলো।

'উঁহু, না, তাতেও হ'লো না। বিভিন্ন ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করে, জন্মনিয়ন্ত্রণ তাদের কাছে মহাপাতক।'

'হুম, যা জীবন পেয়ে গেছে, জীবরূপ ধ'রে ফেলেছে, তাকে মারবেন না। তবে নতুন জন্ম যাতে না-হয় সেটা তো করা যায়—তাকে তো ঠেকানো যায়।'

'কিন্তু তা কি আমরা পারি, মহাত্মন? যেখানে আবেশ-অনুভূতির প্রশ্ন, মানুষ সেখানে ভারি দুর্বল। কখনও কখনও সে রাশ টানবার আগেই হ'য়ে যায়, তাছাড়া শিশুরাও তো ঈশ্বরেরই দান।'

'তাহ'লে আরেকটা সমাধান আছে। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সীমাও বাড়িয়ে দিন। তাহলে থাকারও জায়গা হবে, চাষেরও জমি হবে।'

'কেমন ক'রে?'

'প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর যাতে পৃথিবীর আয়তন বাড়িয়ে দেন, এ জন্যে তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে সব ধর্মের লোকদেরই ব'লে দিন।'

'চমৎকার। কারুই এ-কথায় কোনো আপত্তি হবে না।'

'আমার কাছে আহার কোনো সমস্যাই নয়,' সন্ন্যাসী বললেন। 'চাল বা গম—কোনোটাতেই আমার খুব-একটা আসক্তি নেই। দুধ তো বাছুরদের খাবার চুরি ক'রে পাওয়া, তাই আমি দুধ খাই না কখনও। সবুজ শাকপাতা, শুঁটি, বরবটি, কন্দমূল,—যা পাই তাই খাই। আমার বিশেষ কোনো রুচি বা খুঁতখুঁতও নেই, সব যে সেদ্ধ ক'রে খেতে হবে তাও নয়। রেললাইনের আশপাশে রাস্তার ধারে যথেষ্ট শাকপাতা গজায়। লোকে সে সব খায় না কেন, আমি মাঝেমাঝে ভাবি। শুধু চাল আর গম চাই ব'লে অত বায়নাক্কা কেন তার? সবাই যে যার খাবার ফলিয়ে নিক না। কেন পারে না লোকে?'

'পৃথিবীর জনসংখ্যাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—একদল আমিষ খায়, একদল তা খায় না,' সন্ন্যাসী আগেকার আলোচনার জের টেনে সূত্রপাত করলেন।

'যারা শাকসব্জি মাছ মাংস দুই-ই' খায়, তাদের বেলায় কী?

'আমিষাশী বলতে আমি এটা বলিনি যে তারা শুধু মাছ-মাংসই খায়।'

'তারপর ধরুন, কেউ আছে যে শুধু মাছ-মাংসই খায়।'

'কে?'

'মেরুতে যারা থাকে।'

'হ্যাঁ, এস্কিমোরা। তাদের কথাও আমাদের ধরতে হবে। তাছাড়া অনেক আদিবাসী বা গিরিজন আছে। আচ্ছা, মানুষের খাদ্য কী কী? সংক্ষেপে।'

'গম, চাল, জোয়ার, ভুট্টা—আরও সব শস্যদানা, কন্দ, ফলমূল, শাকসব্জি, দুধ, মাখন, মধু ইত্যাদি।'

'তারপর যা-কিছু উড়ে বেড়ায় অথবা হেঁটে চলে তারাও মানুষের খাদ্য।'

'যারা সাঁতার দেয়, তারাও। কারণ জল এমন-সব প্রাণী জোগায়, যারা মানুষের খাদ্য।'

'সাপ কেউ খায়?' সন্ন্যাসী জিগেশ করলেন।

'হ্যাঁ, মহাত্মন। গোখরো নাকি দারুণ সুস্বাদু ও বহুমূল্য খাদ্য।'

'কেমন ক'রে খায় গোখরোকে?'

'গিরিজনেরা যেমন সাপ খায়, তেমনি অতি সুসভ্য নাগরিকেরাও খায়। ধরুন, আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো একটা দেশে গিয়ে একটা মস্ত দামি হোটেলে উঠেছি। আমরা ঠিক করলুম গোড়ায় দু-এক পাত্র পানীয় নিয়ে শেষে ভোজনও সারবো। আমাদের একটা কাচের ঘরের পাশে নিয়ে যাওয়া হ'লো, যেখানে নানা জাতের সাপ রয়েছে। সিমেন্টের দেয়াল দিয়ে ছোটো-ছোটো খুপরি করা, মেঝেয় বালি ছড়ানো, সরীসৃপেরা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমরা যেতেই একটা গোখরো ফণা তুলে উঠে দাঁড়ালে। আমরা সেটাকেই বেছে নিলুম। এবার পানীয় এলো আমাদের। দস্তানা পরা হাতে সাপটাকে চেপে ধ'রে পরিচারক ছোরার এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডুটা দু-ফাঁক ক'রে দিলে। যে-রক্ত বেরিয়ে এলো, সেটা আমাদের কড়া পানীয়তে ঢেলে দেয়া হ'লো। মরা সাপটাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো রান্না করতে। আমরা পানীয়তে চুমুক দিতে-দিতে, সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে, ততক্ষণে বিশ্বরহস্যের নানাবিধ উচ্চমার্গের বিষয়ে তর্কাতর্কিতে মগ্ন হ'য়ে গেছি। এদিকে তখন গোখরোটার ছাল ছাড়িয়ে কুচি-কুচি ক'রে কেটে, মশলা মেখে, মাখনে ভাজা হচ্ছে। দুটো রেকাবিতে ক'রে খাবার নিয়ে আসা হ'লো—সঙ্গে কুচো টোম্যাটো আর সবুজ লঙ্কা। আমরা অলসভাবে পানীয়তে চুমুক দিই, একটা টুকরো তুলে মুখে দিই। তোফা লাগে খেতে। গোখরোটা খেয়ে যেই খিদে বেড়ে গেলো, আমরা তখন হয়তো ছোটখাটো একটা ময়াল খাবো কিনা ভাবছি।'

'বেড়ালদেরও খায় নাকি?'

'হ্যাঁ, কালো বেড়াল নাকি দারুণ মুখরোচক।'

'নীলন্দনের মতো শাদা বেড়াল কি খাওয়া যায় না?'

'ওঃ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

তার মানে মানুষ সব কিছুই খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে ?'

'শুধু হজম করা নয় সে-সব খেয়ে সে বরং পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যেরও অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।'

মানুষ যখন এত কিছু খেয়েই বাঁচতে পারে, গম বা চাল, বেড়াল বা কুমির, তখন তার সত্যিকার আহার কাকে বলব ?'

'মানুষ এককালে মানুষও খেতো। সে ছিল নরখাদক। এখনও কেউ কেউ হয়ত মানুষের মাংস খায়। তারপর বাঘ, সিংহ, অজগর, হাঙর – তারা সবাই আবার মানুষ খায়।

আমি কিছু বলবার আগেই, এদিকে উঠোনে একটা মস্ত হৈ-চৈ শুরু হয়ে গিয়েছে – ঘেউ-ঘেউ, সরু গলা, চীৎকার, কোঁকর কো। কুকুরটা বেড়ালটাকে তাড়া ক'রে ছুটেছে, কিন্তু নীলন্দন কুকুরটার গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে পলকে আম গাছের ডালে উঠে পড়েছে। গাছের তলা থেকে কুকুরটা বেদম চ্যাঁচাচ্ছে। আর যেন দুজনের ওপরই বেজায় চ'টে গিয়ে শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো 'কোঁকর কো' বলে ডাকছে।

আমি কুকুরটাকে পাকড়ে তার গলায় শেকল বেঁধে দিলুম। সন্ন্যাসী বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'ভয় পাসনে, নীলন্দন। কুকুরটা তো জানতো না যে তুই হচ্ছিস জাদু বেড়াল।' তিনি আমার হাতে বেড়ালটাকে তুলে দিয়ে বললেন :

'আমি এ-জায়গা থেকে চ'লে যাবো ব'লে ভাবছি।'

'কখন, মহাত্মন ?'

'যাবার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।'

মানবজাতির সত্যিকার খাদ্য কী সে-আলোচনাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চ'লে গেলেন।

পরদিন আমি শহরে গিয়ে সন্ন্যাসীদের জন্যে একটা শুজনি আর কম্বল কিনে আনলুম। রেলপুলের তলায় যেখানটায় তিনি শোন, সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি তখন সেখানে নেই। তিনি যেখানটায় শুতেন, সেখানে শুজনিটা বিছিয়ে দিয়ে আমি কম্বলটা তার ওপর রেখে দিলুম।

বাড়ি ফিরে গিয়ে দৃশ্যটা দেখে আমি ভারি হকচকিয়ে গেলুম। শ্রীমতী রাজালা আতঙ্কে থরথর ক'রে কাঁপছেন।

'নীলন্দন আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে, অথচ আমি সেখানে একেবারে একলা আছি,' মিনতির সুরে বললেন শ্রীমতী রাজালা, 'আমার ভেতরে যেতে ভয় করছে। ওটাকে গিয়ে নিয়ে আসুন না, দোহাই !'

আমার স্ত্রী আমার কানে-কানে গোপন কথাটি ফাঁস ক'রে দিলেন। 'রাজালা পোয়াতি।' আমি শ্রীমতী রাজালার বাড়ি গিয়ে বেড়ালটাকে নিয়ে এলুম।

সন্ধেবেলায় আলো জ্বালাবার পর সবে তখন বারান্দায় এসে বসেছি আমরা। শুনতে পেলুম সমুদ্রের গর্জন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

'রাতে যখন ঘুমিয়ে আছি, তখন যদি বান ডাকে, যদি সমুদ্র এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়...?' আমার স্ত্রী তাঁর ভয়টা ব্যক্ত করলেন।

তারপরেই সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা ঘোষণা করে দিলে তাঁর শঙ্খধ্বনি। আমার স্ত্রী অন্দরে চ'লে গেলেন। সুযোগ বুঝে নীলন্দন এসে আমার কোলে লাফিয়ে চ'ড়ে বসলো। সন্ন্যাসীর কাঁধে গুজনি আর কম্বলটা ভাঁজ ক'রে পুঁটুলি বানানো।

'পায়ের ছাপ দেখে-দেখে চ'লে এলুম', তিনি বললেন।

'আমার ধারণা ছিলো আপনি সবসময় তারা দেখে-দেখে চলেন!'

'জীবন বড্ড দুর্বহ হ'য়ে উঠেছে, বোঝা বেড়ে যাচ্ছে।'

'আপনি কি রাতটা এখানেই কাটাতে পছন্দ করবেন, মহাত্মন?'

'না। এখন আমার ধ্যানের পালা চলেছে।'

'এখানেই আপনি আপনার ভোজন তৈরি করুন না কাল।'

'নিশ্চয়ই, যদি ঈশ্বরের কৃপা হয়।'

সিন্ধুজল, তরঙ্গদল, আমরা তোমাদের প্রণাম করি!

## ৬

সমুদ্র গিলে খেলো আরো দুটো বাড়ি, একটা কাঁঠাল গাছ, গোটা চল্লিশ তাল ও নারকেল গাছ। তবুও তার রোষ প্রশমিত হয়নি, খিদে কমেনি, সে অনবরত জোরালো ঢেউ দিয়ে তীরে আঘাত হানছে।

হিন্দু সন্ন্যাসী এলেন। অনেকদিন আগে, আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলুম, আমার কিছু অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন আর রান্নার জন্য একটা কেরোসিন স্টোভ ছিলো। এ-সব যখন সন্ন্যাসীর জন্যে বার ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমার স্ত্রী একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন।

'যদি সকলের জন্যেই রান্না করা হয় তবে আমার সময় একটু বেঁচে যায়।'

'এ তো সন্ন্যাসীর খাবার। আপনার তা ভালো লাগবে না।'

'তাত্তো, আমারও কিন্তু মুচকুনির খাবার চাই'—কন্যার আব্দার।

'তাহ'লে তার মাও তা খেতে পারে,' মা বললেন মেয়েকে, আসলে আমাদেরই শুনিয়ে-শুনিয়ে।

'রাজালা, খাদিজাবিবি, সৌমিনীদেবী ?'

'বেশ, তাঁদেরও গিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে এসো। তারপর নীলনন্দন। শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো আর তার সতেরো – না-না, ষোলোজন বিবি আর এককিল্লি ছানাপোনা, চারটে গোরু - সবাই আজ সন্ন্যাসীর খাবার খাবে।'

সবচেয়ে নামজাদা অভ্যাগত হিসেবে, ছোট্ট একটা কলাপাতায় প্রথমে নীলনন্দনকে খেতে দেয়া হ'লো। তারপর খাওয়ানো হ'লো শাদা লেগহর্ন আর তার বউ-বাচ্চাদের। তাদের পর খেলে কুকুরটা আর গোরুরা। মানুষরাও সবাই কলাপাতা পেতেই তাদের খাবার খেলে।

মধ্যাহ্নভোজের পর, সন্ন্যাসী আর আমি যখন বসে বিড়ি টানছি :

সন্ন্যাসী জিগেশ করলেন, 'মহত্তম শিল্প কী ?'

'সন্দেহ নেই, রন্ধনশিল্প,' আমি বললুম।

এ নিয়ে আর-কোনো তর্ক শুরু হ'লো না।

'পৃথিবীতে কতজন লোক নিজেদের খাবার নিজেই রান্না ক'রে নিতে পারে ?'

'আমি শতকরা হিশেবটা জানিনে।'

'এ-বিষয়টা নিয়ে কারু মাথা-ঘামানো উচিত। জীবনধারণের জন্যে আহার চাই-ই চাই। কিন্তু হাজারে অন্তত দু-জনও কি নিজের খাদ্য নিজেই জোগাড়যন্তর ক'রে নিতে পারবে ? সকলেই চায় অন্য-কেউ রান্না-বান্না ক'রে তাদের এসে পরিবেশন ক'রে যাক। রাঁধুনি যদি নোংরা হয়, অথবা যদি কোনো ছোঁয়াচে রোগে ভোগে, তাতেও কিছু এসে যায় না। সে নিয়ে কেউ মোটেই মাথা ঘামায় না। ঠিক একইরকম হ'লো ভাবনাচিন্তা, ধর্ম, শাস্ত্র বা রাজনীতির বেলায় – সবকিছুই একেবারে রেঁধেবেড়ে তৈরি ক'রে পরিবেশন করা হয়। আর লোকে শুধু গবগব ক'রে সেগুলো গেলে।'

'কিন্তু মহাত্মন, সবাই কি আর নিজের খাবার নিজে রান্না করতে পারবে, অথবা নিজের মতো ক'রে ভাবতে পারবে ?'

হ্যাঁ, সবসময়েই পাশে ওত পেতে আছে মৃত্যু, দিনকে দিন সে আরো কাছে ঘেঁষে আসছে আমাদের।

সন্ন্যাসী নীলনন্দনকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলেন।

মহিলা তিনজন আমাদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ভোজের জন্যে আড়চোখে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানালেন।

একটু পরেই সন্ন্যাসীও চ'লে গেলেন ; যাবার আগে আবার একবার এসে দেখা ক'রে যাবেন।

আশ্চর্য বেড়াল এখন আমার সঙ্গেই দিন কাটায়। আমিই তাকে রোজ খাওয়াই,

রাতে আমার পাশেই সে শোয়।

মহিলাদের কিন্তু তার ওপর মোটেই কোনো সহানুভূতি নেই। তাকে চিরকালের মতো দূরে কোথাও পাচার ক'রে দেবার জন্যে একটা প্রস্তাব এসেছিলো মহিলাদের কাছ থেকে: দুটো কলাগাছ বেঁধে ভেলা বানিয়ে নীলন্দনকে তার ওপর বসিয়ে ভেলাটা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হোক।

'নীলন্দন এখানে স্বেচ্ছায় নিজে থেকে আসেনি। তাকে খুব খাতিরযত্ন ক'রে আনা হয়েছিলো, আদিখ্যেতা ক'রে যত্নআত্তি ক'রে তাকে দুধ মাখন খাওয়ানো হয়েছিলো। তোমরা মেয়েরা তারপর তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছো। তাই ব'লে এখন তাকে নদীতে ডুবিয়ে মারতে হবে? তোমাদের কি ধর্ম আর নীতি ব'লে কিছুই আর নেই?'

'তোমাকে তো বলেইছি যে রাজালার বাচ্চা হবে। আর ও একে দারুণ ভয় পায়,' আমরা স্ত্রী আমাকে বললেন।

কিন্তু রাজালার বাচ্চা হবে ব'লে তাকে অন্য কোথাও পাচার ক'রে দিতে হবে কেন? নীলন্দন তো আর রাজালার বাড়িতে থাকে না। তবে আমার স্ত্রীও এখন পোয়াতি। তা কি আর আমার মনে নেই? পুরুষের কি এ-ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই? আমার স্ত্রী একটা নালিশের বাণ্ডিল হ'য়ে উঠলেন।

'আমারও ভয়-ভয় করছে,' তিনি ঘোষণা করলেন। 'বালিশের তলায় একটা ছোরা নিয়ে আমি ঘুমুই।'

এই গোপন কথাটি অ্যাদ্দিন কে জানতো? শিগগিরই নীলন্দন বিছানার বাইরে অভ্যাগতদের হলঘরে চালান হ'য়ে গেলো।

এরই মধ্যে একদিন পাড়ার তিন মহিলার স্বামীরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—বাসুদেবন, হুসেন আর রামকৃষ্ণণ। তাঁরা এলেন আশ্চর্য বেড়াল সম্বন্ধে জিগেশ করতে, খবরাখবর নিতে—আসলে ব্যাপারটা সত্যি কী। দিনটা রোববার, তাঁদের ছিলো ছুটির মেজাজ। এই তিনজন তরুণ জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের পোকা, সিনেমাতেও যান প্রায়ই। তাঁদের কেমন একটা সন্দেহ হয়েছে যে আমি আর আশ্চর্য বেড়াল আসলে একজনই—আমি একটা দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় ক'রে চলেছি। সে যাক গে। আমি, তাঁদের সাদরে আপ্যায়ন ক'রে বসিয়ে চা খেতে দিলুম। তারই মধ্যে, তাঁদের রোমাঞ্চকর তত্ত্বটিকে চুরমার ক'রে দিয়ে, নীলন্দন আমার কাছে এসে হাজির। আমার দ্বৈত ভূমিকার তত্ত্বটা মাঠে মারা গেলো।

কাইস্থ কেমন ক'রে লিঙ্গ বদল ক'রে নীলন্দন হ'য়ে গেলো? আমি বললুম আদপেই ও কখনও কোনো মেনি বেড়াল ছিলো না। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন: সর্পকীর্তি, চালকুমড়োবিস্ময়, পনসভেলকি, বাস দুর্ঘটনার পরমাশ্চর্য...আমি বললুম, এগুলো

সবই নিছক কাকতাল বৈ আর-কিছু না, নেহাৎই সাধারণ কতগুলো কাকতালীয় যোগাযোগ।

'আজকাল কাগজে মাঝে মাঝে পড়ি বটে যে পুরুষ মহিলা হয়ে গেছে, অথবা মহিলা, পুরুষ।'

'হ্যাঁ, আমিও সে-খবর পড়ি,' আমি সায় দিয়ে বললুম, 'কিন্তু আমি তার জন্যে কোনোভাবেই দায়ী নই।'

'মানুষ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? মানে, সাধারণভাবে মানবজাতি সম্বন্ধে কী ভাবছেন?'

'মানুষ হ'লো এমন এক আমিষখোর প্রাণী যে মাংসের লোভে এবং খেলাচ্ছলে অন্য প্রাণীদের বধ ক'রে থাকে,' বিশেষ কিছু না-ভেবেই আমি ব'লে দিলুম।

'তার কোনো গুণ নেই?'

'অনেক আছে। প্রজ্ঞা, কল্পনাশক্তি, ভালোমন্দের বোধ—এইরকম অনেক কিছু।'

'তার কি অলৌকিক কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই?'

'আমার নেই।'

'পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ—সকলেই নররূপ ধারণ ক'রে মর্তধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'

তক্ষুনি হুসেন আপত্তি জানালেন:

'নবীদের কথা বাদ দেয়া হয়েছে। মোজেস, নোয়া, জিসাস, মহম্মদ?'

'কিছু মনে কোরো না, হুসেন,' বাসুদেবন বললেন, 'তুমি যদি জিসাস ক্রাইস্টকে সাধারণ একজন পয়গম্বর বলো, ক্যাথলিকরা কি তা মানবে?'

'কক্ষনো না,' রামকৃষ্ণণ বললেন। তিনি নিজে ক্যাথলিক।

'তাহ'লে এ নিয়ে আর কথা নয়।' বাসুদেবন আমার দিকে ফিরলেন। 'আপনি কি জানেন তাঁরা কত-কত অলৌকিক কীর্তি করেছেন?'

'সে-সবের কথা আমি শুনেছি,' আমি বললুম। 'অনেকদিন আগে চীন দেশের এক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, একটা বৌদ্ধ মঠে গিয়ে তিনি দেখেছেন, বুদ্ধ যাতে চ'ড়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন, সেই সোনার সিঁড়িটা নাকি এখনও আছে।'

'ভগবান বুদ্ধ যে একজন অবতার ছিলেন, তা কি আপনি জানেন না?' বাসুদেবন আমায় জিগেশ করলেন।

বিস্তর তর্কাতর্কি হ'লো। প্রায় একটা হাতাহাতিই হয় বুঝি। শেষটায় রামকৃষ্ণণ তাঁদের শান্ত করলেন।

'হুসেন, আমাদের রাজা বিক্রমাদিত্যও বিস্তর অলৌকিক কাজ করেছেন। তেমনি আশ্চর্য সব কাজ করেছেন ওমর, ভট্টি, বেতাল। তাঁদের কথা তো ভুলে গেলে চলবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে,' বাসুদেবন সায় দিলেন। 'কিন্তু বুদ্ধ তো বড়ো-বড়ো সব অলৌকিক কাজ করেছেন। আর কে-কে?'

'কে একজন সমুদ্র থেকে তীরটা সরিয়ে নিয়ে এসেছিল।'

'তার মহাকুঠারটা ছুঁড়ে?'

'তারপর···একজন গ্যালন-গ্যালন গরল অর্থাৎ সাপের বিষ খেয়েছিলো। আরেকজন মুখ খুলে হাঁ ক'রে দেখিয়েছিলো তার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে। আরেকজন একটা হাওয়াই জাহাজে ক'রে যেতো, নাম পুষ্পক। কারা-কারা যেন একটা তিমির পেটে অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছিলো। একজন সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চ'লে গিয়েছিলো। আরেকজন তার অনুচরদের নিয়ে নদী পেরিয়ে গিয়েছিলো—নদী দু-ভাগ হ'য়ে গিয়ে তার যাবার রাস্তা ক'রে দেয়। অজস্র, অজস্র দৃষ্টান্ত দেয়া যায়।'

'এ-সব অলৌকিক কাজ নয়? আশ্চর্য কাজ নয়?'

'এইসব অলৌকিক সাধকদের উপদেশ কিছু শুনতে আপনাদের কোনো ইচ্ছা করে না?'

'না-না। আমরা যা শুনতে চাই, তা শুধু এই অলৌকিক রহস্যের কথা। শবরী আয়াপ্পান আর বাবর মানুষ হিসেবেই পৃথিবীর মাটিতে হেঁটে বেড়িয়েছিলেন। আধুনিক গুরুরাও এখন মনুষ্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ। আহা, কী-সব ভেলকি তাঁরা দেখান! হাওয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন ঠোঙাভর্তি ছাই, ফুল, রিস্টওয়াচ, আর পুণ্যবানদের সে সব দিয়ে দেন। সেটা কী বলুন!'

'তিনি এবং আর যে সব ধর্মপ্রাণদের কথা আপনি বললেন, তাঁদের হয়তো কোনো অতিমানবিক শক্তি আছে।'

'আর আপনার?'

'আমার কিছুই নেই। আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, অতি সাধারণ, দীনাতিদীন। আমার চোখের দৃষ্টি খুব দুর্বল—প্রায়ই আমাকে চশমা পালটাতে হয়। যদি আমার অত ক্ষমতাই থাকতো, তবে কি প্রথমেই আমি আমার দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে আনতুম না? এই দেখুন আমার গোঁফজোড়া, মাথার চকচকে টাক। উঠোনের ঐ নারকেল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। কলপ মাখিয়ে আমার গোঁফজোড়া কালো ক'রে রেখেছি। আমার যদি অলৌকিক কাজ করার কোনো ক্ষমতাই থাকতো, আমি যদি একটা বেড়ালের লিঙ্গই বদল ক'রে দিতে পারতুম, তাহলে গোড়ায় আমি আমার গোঁফের রঙটা

পালটাতে চাইতুম। তারপর চাইতুম আমার ইন্দ্রলুপ্তির ওপর একমাথা চকচকে কালো চুল গজিয়ে উঠুক।'

'টগবগ ক'রে ফুটছে, এমন একটা ঘি-এর কড়াইয়ে হাত চুবিয়ে আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

আমি যে নেহাতই একজন সাধারণ মানুষ সেটা প্রমাণ করবার জন্যে গরম ঘিয়ে যদি হাত চোবাই, সে হাত তো পুড়ে যাবে! উঃফ্, কী ক'রে যে এই অন্ধবিশ্বাসীদের বোঝানো যায়! এ-রকম অন্ধবিশ্বাস যে একেবারেই অবিশ্বাস্য।

প্রশ্নটা যেন কানেই যায়নি, এমন ভান ক'রে আমি জিগেশ করলুম: 'আচ্ছা, সাধারণ লোকে যে-সব আশ্চর্য কাজ করেছে, সে-সব আপনারা শুনতে চান?'

'সাধারণ লোকে আবার আশ্চর্য কাজ করবে কী ক'রে?'

'পারে। লোকে পারে। ছোটোখাটো সব আশ্চর্য যদিও।'

'বলুন। শুনি।'

'বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের এই পৃথিবী গ'ড়ে উঠেছিলো কোটি কোটি বছর আগে। এত কোটি বছরের অন্ধকার নিমেষে হ'ঠে গিয়েছিলো যখন বোতাম টিপলেই হাজার হাজার বিজলি বাতি জ্বলে উঠেছিলো, দিনের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। ছোট্ট একটা নলের মধ্যে দিয়ে এখন আমরা পাঁচ হাজার মাইল দূরের লোকের সঙ্গেও কথা বলতে পারি। একটা হাতল ঘোরালেই হাজার মাইল দূরে গাওয়া একটা গান তক্ষুনি ভেসে আসে আমাদের কাছে। মোষ, ঘোড়া বা উটের সাহায্য ছাড়াই ভুউশ ক'রে চ'লে যায় গাড়ি। জাহাজ ভেসে যায় সাগরজলে—ওপরেও, তলা দিয়েও। হাওয়াই জাহাজ উড়ে যায় পাখির মতো। মহাকাশ যান চ'লে যায় চাঁদে বা অন্য গ্রহে। ওষুধবিষুধ বাড়িয়ে দেয় পরমায়ু। যাদের চোখ গেছে, তাদের জন্যে নতুন চোখ...'

'ওহো! আরে, এ-সব তো অতি তুচ্ছ সাধারণ জিনিশ। আমরা ভেবেছিলুম আপনি আমাদের তাকলাগানো সব অলৌকিক কাণ্ডকীর্তির কথা বলবেন। এ-সবের মধ্যে আবার অলৌকিক কোথায়?'

তাঁরা উঠে পড়ে নীলনন্দনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে খুব গভীরভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলেন।

'সাবধান!' বিদায় দেবার সময় তাঁদের আমি বললুম, 'এই আশ্চর্য বেড়ালের কথা কিন্তু কাউকে বলবেন না।'

পরের দিন, আমার মেয়ে এসে একটা সত্যিকার আশ্চর্যের কথা ঘোষণা করলে! 'তাত্তো, নীলনন্দন উধাও হ'য়ে গেছে, ওকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

আমি আমার স্ত্রীকে ডাকলুম, তিনি তক্ষুনি সাড়া দিলেন। গত কিছুদিন মেয়েরা

আমায় বেদম ভয় পাচ্ছিলো। —যদি তাঁদের কাউকে আমি লিঙ্গ বদল ক'রে পুরুষ বানিয়ে দি!

নীলন্দন কোথায়?' আমি জিগেশ করলুম।

'ওকে তো বাড়িতেও দেখছি না—পাড়াতেও আর কোথাও দেখছি না।'

'ওকে কেউ মেরে ফেলেছে?'

তা যদি হয়, তবে খুনী নিশ্চয়ই মহিলারা—খাদিজাবিবি, শ্রীমতী রাজালা, সৌমিনী দেবী এবং তাঁদের স্বামীরা—হুসেন, বাসুদেবন, রামকৃষ্ণণ। আমার স্ত্রীরও তাতে একটা ভূমিকা থাকতে পারে, তবে আমার মেয়ের নয়।

'না,' আমার স্ত্রী জোরগলায় বললেন, 'ওকে মারতে কারু সাহস হবে না। সবাই ওর ভয়ে যেন জুজু দেখে কাঁপে।'

আমি যখন এরকম উদ্বেগের মধ্যে দিনরাত্রি কাটাচ্ছি, একজন বয়স্ক চশমাধারী ভদ্রলোক আশ্চর্য বেড়ালের খোঁজে এসে হাজির হলেন। পুরু কাচের ফাঁক দিয়ে তাঁর খুদে চোখগুলো চকচক করছে। ভদ্রলোক প্রজ্ঞাবান, জীবনে সন্তোষ ও শান্তি পেয়েছেন, অন্তত মুখচোখ দেখে তা-ই মনে হয়। সব সময়েই জ্ঞানের খোঁজে হন্যে হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, সারা দুনিয়া চ'ষে বেড়িয়েছেন, কত কত বিচিত্র ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, চেষ্টা করেছেন সব দেশেরই প্রজ্ঞা ও চিন্তাকে আত্মস্থ করে নিতে। সঙ্গে যে প্রকাণ্ড বইটা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা টেবিলের ওপর রেখে এমনভাবে গ্যাঁট হ'য়ে বসলেন যে, মনে হ'লো তাঁর হাতে যেন অনন্ত সময় প'ড়ে আছে। বইটা হ'লো অজস্র চিত্র শোভিত এক ভ্রমণবৃত্তান্ত।

আমরা চা খেলুম। তিনি ধূমপান করেন না। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বইটার পাতা ওলটালুম। কতগুলো স্তবক দাগ দেয়া, আমি সেগুলো থেমে-থেমে পড়লুম। পড়লুম পিরামিডের কথা। ধূ-ধূ বালির মধ্যে মাইলের পর মাইল জুড়ে একের পর এক পিরামিড। পিরামিডগুলোর কাছে আছে কতগুলো গুহা, তাতে আছে প্রাচীন কতগুলো কবর, হয়তো রাজাদের। একটা কফিনের ডালা খুলতেই দেখা গেলো রেশমে জড়ানো দেহটা এখনও পুরোপুরি অটুট আছে। বালির ওপর স্পষ্ট ফুটে আছে কার পায়ের ছাপ, চার হাজার বছরের পুরোনো কার পায়ের ছাপ—হয়তো কোনো পুরোহিত অথবা অনুচরের।

চার হাজার বছরের পুরোনো পায়ের ছাপ! আমি বিষয়টা নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে দেখলুম। সে-ই যেদিন বালির ওপর এই পায়ের ছাপ পড়েছিলো, তারপর থেকে আজ অব্দি পৃথিবীর বুকে কত-শত পরিবর্তন হয়েছে। জুপিটার আর রা-এর স্থান নিয়েছে নতুন কত দেবতা: নতুন ধর্ম, নতুন বিশ্বাস…

বইটার মধ্যে বিশাল সব গাছপালার ছবি।

'পণ্ডিতেরা হিশেব ক'রে দেখেছেন এ-সব গাছ ১৪০০ বছরেরও পুরোনো,' তিনি আমায় বললেন।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়, অভিভূত হ'য়ে যেতে হয়।

'আশ্চর্য বেড়াল আসলে মেয়েদের খেয়ালি কল্পনার সৃষ্টি,' আমি তাঁকে বললুম। 'যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করবার জন্যে আর মোক্ষ লাভের জন্যে মুখিয়ে আছেন, তাই তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে আছেন, যদিও যাবতীয় প্রমাণ তার বিরুদ্ধে। ঈশ্বর বিশ্বাসিনীদের আশীর্বাদ করুন!'

'ঈশ্বর!'

'হ্যাঁ।'

'ঈশ্বর আছেন নাকি তাহ'লে? বিশ্বাস করা তো মোটেই আধুনিকতা নয়, কারণ ঈশ্বর হলেন আদিম মানুষের ধারণা।'

'ঈশ্বর মানুষের প্রচণ্ডতম ও ও উজ্জ্বলতম ধারণা। নিখুঁত একটি সজ্ঘটক, নিখুঁত এবং আদিম! মানুষ যেদিন প্রথম চিন্তা করতে শিখেছিলো, সেই দিন থেকেই এই ভাবটা তার মনে জেগে উঠেছিলো। তারপর থেকে যে কত হাজার বছর টি'কে আছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই কিছু লোক ভগবানে বিশ্বাস করতো, কিছু লোক করতো না। আজও এই অবস্থা পালটায়নি। তাহ'লে আর প্রগতি হলো কোথায়? হয়তো লক্ষ বছর পরেকার মানুষ আমাদেরও আদিম ব'লে বর্ণনা করবে। আপনি কী বলেন?'

'কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কি একান্তই জরুরি?'

'জরুরি না, জরুরি কি না, আমি জানিনে। আপনি যদি বিশ্বাস না-করেন তবে তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। সূর্য উঠবে, অস্ত যাবে। মৌশুমি ঋতুতে বৃষ্টি হবে, বীজ থেকে অঙ্কুর পাখা মেলে দেবে, মুকুলিত হবে কুঁড়ি আর সৌরভ ছড়িয়ে দেবে। অবশ্য এতসবকিছু আশপাশে থাকতে ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই এ-কথাটা বলতে দুর্জয় সাহস লাগে। আমার সে-সাহস নেই। আমি খুব শাদাসিধে লোক। কাজেই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।'

'ঈশ্বর কেন পৃথিবীতে শান্তি ও প্রাচুর্য দেন না?'

'মানুষ কি তারই জন্যে চেষ্টা করছে না—এই শান্তি আর সমৃদ্ধির জন্যে? তারপর দেখুন প্রতি মুহূর্তে হাজার-হাজার লোক ম'রে যাচ্ছে, আবার হাজার হাজার মানুষ জন্ম নিচ্ছে। একজন আরেকজনের শিকার। সেই অর্থে পৃথিবী হ'লো এক স্বয়ংসম্পূর্ণ চিড়িয়াখানা।'

'চিড়িয়াখানা? কার দেখার জন্যে?'

'আমাদেরই দেখার জন্যে, সকলেরই দেখার জন্যে। মানুষের চাইতেও হয়তো অনেকগুণ বেশি পরিচ্ছন্ন, জ্ঞানী-গুণী, শক্তিশালী ও রূপবান জীব আছে। রাতে আকাশে তাকিয়ে আমরা লক্ষ-কোটি তারা দেখতে পাই—অগুনতি সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদ। অনেকে ভাবেন, তাদের কোনো-কোনোটায় হয়তো আমাদের চাইতেও উৎকৃষ্ট কোনো জীব বাস করে। কে জানে একদিন তারা আমাদের দেখতে আসবে কি না?'

চুপচাপ ব'সে ব'সে আমরা এ-সম্ভাবনাটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলুম। বিদায় দেবার সময় তাঁকে আমি আশ্চর্য বেড়ালের কথা মনে করিয়ে দিলুম।

'আমি ওর খোঁজ করবো,' যেতে-যেতে ভদ্রলোক ব'লে গেলেন।

এবার এ-কাহিনী স্বপ্ন নিয়ে। মধ্য রাত। নিদ্‌'ম শুয়ে-শুয়ে আমি একটা বই পড়ছি। মৃত্যু খুব কাছাকাছি চ'লে এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে। পাখাটা সমানে ঘুরে চলেছে অলসমন্থর। শিয়রের কাছের টেবিল বাতিটা অন্যদের মোটেই বিরক্ত করছে না। তবু এই এক চিলতে আলোতেই আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মেয়েকে নিয়ে আমার স্ত্রী গভীর ঘুমে তলিয়ে আছেন। বাইরে অন্ধকার জগতে যেন কোনো কবরখানার গা-ছমছম স্তব্ধতা। কিন্তু সমুদ্র তো কখনও ঘুমোয় না। সে অবিশ্রান্ত গরগর ক'রে প্রকাণ্ড সব ঢেউ তুলে আছড়ে মারছে তীরকে। তারপর এলো ট্রেনের ঝগঝগ। সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই রেলপুলের তলাতেই শুয়ে আছেন। আমি আমার ঘড়ি দেখলুম। মানুষের এ এক বিস্ময়কর চমকপ্রদ উদ্ভাবন। লাল সেকেণ্ডের কাঁটা হুড়মুড় ক'রে ছুটে চলেছে শাদা ডায়ালের ওপর দিয়ে। ছুটন্ত কাঁটার সঙ্গে-সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডও ধকধক ছুটছে। কবে এর শেষ?

ছোরাটা তাঁর হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো।

হঠাৎ ঝকঝকে এক ধারালো ছোরা হাতে, আমার স্ত্রী ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন। তাঁর চোখ দুটো মশালের মতো জ্বলছিলো।

'যদি আমাকে খুন করার সময় এসে থাকে,' আমি তাঁকে বললুম, 'তবে আমি তৈরি।...বিদায়, আত্মার ছোট্রজগৎ, বিদায়!'

ছোরাটা তাঁর হাত থেকে খ'সে গেলো।

আসলে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে তিনি হঠাৎ জেগে উঠেছেন: হাজার-হাজার ঢেউয়ের ফণা মেলে এগিয়ে আসছে কালো সমুদ্র। প্রত্যেক ঢেউয়ের চূড়ায় একটি ক'রে আশ্চর্য বেড়াল ব'সে আছে। হাজার-হাজার আশ্চর্য বেড়াল লাফিয়ে পড়ছে বাড়িটায়...

'স্ত্রীদের উচিত তাদের স্বামীদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা, বেড়ালদের নিয়ে নয়।' তাঁকে এই পরামর্শ দিয়ে ছোরাটা তুলে আমি আমার বালিশের তলায় রেখে দিলুম।

শ্রীমতী রাজালার স্বপ্ন আরো ভয়াবহ। দরজা খুলে বাড়িতে পা দিয়েই তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি আছেন নীলন্দনের পেটের মধ্যে। তিনি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন। প্রায় রোজ রাতেই তিনি এ-স্বপ্নটা দ্যাখেন।

এদিকে শ্রীমতী রাজালার মামলাটা ক্রমেই খুব গুরুতর হ'য়ে উঠছে, তারও আশু প্রতিবিধান চাই। কেননা তিনি পোয়াতি।

মহিলারা এ নিয়ে অনেক ভাবলেন। এ কী নীলন্দনের ভূত, যা তাঁকে রোজ হানা দিচ্ছে?

'এখন কেমন আছো, রাজালা?'

'আমার বমি পাচ্ছে। খাবার কোনো রুচি নেই। চোখে কোনো ঘুম নেই। নীলন্দন আমাকে পাকড়ে ধ রে শূন্যে ছুঁড়ে মারে!'

'ওর হাত ফসকে প'ড়ে যাবে না তো? তাহ'লে তো পেটের বাচ্চা ···

'—হায় ভগবান! নীলন্দন আমাকে ফসকাবে না তো··· ?'

শ্রীমতী রাজালা মন খারাপ ক'রে অসুখ বাধিয়ে বসেন।

ওঝাকে ডেকে পাঠানো হ'লো। সে অনেক রকম মন্তরতন্তর জানে। একটা সোনার মাদুলি বানিয়ে তাতে তার মন্ত্র পুরে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে বললে। অন্তত একশো টাকা তো লাগবেই ওতে। সে একশো টাকা জোটে কোথায়?

অপেক্ষাকৃত কমদামি ধাতুর মাদুলি বানিয়ে তাতে নিজের মন্ত্র পুরে দিয়ে দেবো ব'লে আমি নিজেই আগ বাড়িয়ে নিজে থেকেই প্রস্তাব করলুম। মাদুলিটা তিনি কোমরে পরলেন! এর পর থেকে নীলন্দনের ভূত তাঁকে আর জ্বালাতন করেনি। খাদ্যে তাঁর রুচি ফিরে এলো, ঘুমও হয় গভীর প্রশান্ত।

(শ্রীমতী রাজালা, নিরাপদ প্রসবের চল্লিশ দিন পর, যখন আপনি এবং আপনার বাচ্চা বহাল তবিয়তে সুস্থ ও হাসিখুশি বোধ করবেন, আমার মাদুলিটা খুলে ভেতরের টাকায় মেঠাই কিনে বাচ্চাদের খেতে দেবেন। আমি দুটো আধুলি পুরে দিয়েছি ওতে। আমার অশেষ শুভেচ্ছা।)

এখন মহিলারা সবাই খুব খুশি। একটা মস্ত ফাঁড়া কাটানো গেল। আমার সম্মান এখন তুঙ্গে। যখন সবাই খুব হাসিখুশি ও নিরুদ্বেগ, হঠাৎ একদিন নীলন্দন ফিরে এলো, জলজ্যান্তই শুধু নয়, দিব্যি বহালতবিয়ত! তাকে দেখে একটু ভাবুক ভাবুক ঠেকলো, অভিজ্ঞতা তাকে নিশ্চয়ই বেশ দমিয়ে দিয়েছে। মহিলারা এমন ভাব করলেন যেন তাঁরা তাকে চোখেই দ্যাখেননি। কিন্তু তার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে প্রণয়কটাক্ষ না-ক'রে তাঁদের কোনো উপায় আছে?

আমি তাকে খাবার দিলুম। সে আবার আমার সঙ্গেই থাকতে শুরু ক'রে দিলে।

তারপর একদিন, পশ্চিম থেকে সমুদ্রের গর্জন যেন এগিয়ে এলো কাছে। অ্যাঁ কী হতে চলেছে? জল আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না তো?

আমি গিয়ে সমুদ্র দেখে এলুম—সরেজমিন একটা তদন্ত। সমুদ্রে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে। একটা তুফান ঘনিয়ে আসছে এখানে। বাঁধের গায়ে জল আছড়াচ্ছে অবিশ্রাম। বাঁধের চোয়ালের মস্ত সব খোঁদল, প্রকাণ্ড সব গহ্বর। সমুদ্রের চেহারা রীতিমতো ভয়ংকর। মানুষের মন তাকে ধরতেই পারবে না কিছুতেই। ছোট্ট মন, মস্ত সমুদ্র, স্তব্ধ আকাশ!

বিশাল, ভয়ংকর, অপরূপ, গভীর, প্রকাণ্ড সমুদ্র! আমার প্রণাম নাও!

সমুদ্রের ধার থেকে আমি ফিরে এলুম। পাখিরা কিচিরমিচির করছে, গুঞ্জন করছে মৌমাছি, প্রজাপতি উড়ছে ব্যস্তসমস্ত। তাদের রঙের তুলকালাম বাহার দেখিয়ে ফুলেরা নেচে উঠছে মুকুলিত। গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে সটান, আকাশে মাথা তুলে কী দেখছে ওরা? তারপর বাড়িঘর, মানুষজন। মেরুর তুষারগিরিগুলো গ'লে গিয়ে মেরুতীরগুলো কি তবে ভেসে যাচ্ছে এখন?

হ'তে পারে। আমাদের অস্তিত্বটাই তো এক পরমাশ্চর্য।

হঠাৎ সন্ন্যাসীর শঙ্খ শোনা গেলো, আর আমার মেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে বললে, 'তাত্তো! বাঁশিওয়ালা মুচকুনি!'

জানি সন্ন্যাসী এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে। আমি খিড়কির দুয়োর দিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকলুম। অল্প কিছু টাকা একটা খামে ভ'রে মেয়েকে বললুম তার মুচকুনিকে সেটা দিয়ে আসতে। পথে রাহাখরচ হিশেবে এ-টাকা তাঁর কাজে লাগবে। বাইরে বারান্দায় এসে দেখি শাদা লেগহর্ন কুঁকড়ো তার লাল মোরগঝুঁটি ফুলিয়ে আমার চেয়ারে ব'সে আছে। সন্ন্যাসী ব'সে আছেন মেঝেয়, তাঁর কোলে নীলন্দন, এক কাঁধে ভাঁজ ক'রে রাখা গুজনি আর কম্বল। আমার মেয়ে তাঁকে যে-খামটা এনে দিয়েছে সেটাকে দেখা গেলো তাঁর অন্য কাঁধের ঝোলাটায়। আমরা চা খেয়ে বিড়ি টানছিলুম।

রেলপুলের তলায় তাঁর আস্তানা এখন ফাঁকা প'ড়ে আছে।

আমাদের আর দেখা হবে না। তিনি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন, আর আমি···
আমরা উঠে পড়লুম, তিনি শঙ্খটা তাঁর ঝোলায় ভ'রে ফেললেন।

আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নীলন্দন।

সন্ন্যাসী চোখ মুদে কী যেন ধ্যান ক'রে নিলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন:

'পাহাড়ের চুড়োয় একেবারেই একা ম'রে প'ড়ে আছি···এইভাবেই আমাকে মনে রাখবেন। এবার আমায় যেতে দিন। আমায় আশীর্বাদ করুন।'

'আমি যে আপনার আশীর্বাদ চাই, মহাত্মন !'

দুটি নয়নতারা জলজ্বল ক'রে ফুটে আছে আকাশের দুই পাশে !

'হে শাশ্বত সত্তা, যে তুমি সমস্ত ভুবন, সমস্ত প্রাণী, সব সিন্ধুজল ও গিরিচূড়ার স্রষ্টা—

'যাঁর শক্তিতে এই গ্রহতারকা, ভুবন সকল আর আমরা সকল জীবন্ত প্রাণী কোনো এক অন্তহীন শূন্যে ঝুলে আছি—

'সেই তোমার আশীর্বাদ আমাদের ওপর ঝ'রে পড়ুক !'

'ওঁম্ শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !

'লোকসমস্ত সুখিনো ভবন্তু !'

## পুরন পরাম

আজ যে এ-গল্পটা লিখছি তার কারণ এটা নয় যে আমি এটা লিখতে চাচ্ছিলুম, তার কারণ আবদুল কাদের সাহেব আমাকে বড্ড জ্বালাচ্ছেন। তাঁর ধারণা এর মধ্যে নাকি দারুণ একটা নীতিকথা আছে। গল্পটা সত্যি-বলতে কী তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ জামিলা বিবিকে নিয়ে।

জামিলা বিবি গ্র্যাজুয়েট। আবদুল কাদের সাহেব মাত্র স্কুল ফাইনাল অব্দি পড়েছেন। আমাদের যা রীতি-প্রচল, তাতে কোনো 'স্কুল ফাইনাল'-পুরুষের কি কোনো বি-এ ডিগ্রিধারিণীকে বিয়ে-করা উচিত? কিন্তু আবদুল কাদের সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন তিনি লড়াই ক'রে জিতেছেন। সাবেক আমলে পুরুষেরা নারীহরণ ক'রে আনতো। দড়ি দিয়ে বেঁধে মেয়েদের টেনে নিয়ে আসতো। জোর ক'রে মেয়েদের দখল ক'রে নেবার আরো নানান সব পদ্ধতি ছিলো। পুরুষরা তাতে দুর্দান্ত ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছিলো। কিন্তু আবদুল কাদের যেহেতু সভ্য-ভব্য মানুষ, তিনি এ-সব কিছুই করেননি। তিনি ছিলেন শহরের মস্তান, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সচিব আর দুর্ধর্ষ ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি বলেন, ক্লাস ফোর থেকে স্কুল ফাইনাল অব্দি জামিলা বিবির সঙ্গে এক ক্লাসে তিনি পড়েছিলেন, সেই ক্লাস ফোর থেকেই নাকি উনি জামিলা বিবির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন. জামিলা বিবি অবিশ্যি ডাহা মিথ্যে কথা বলে এটাকে উড়িয়ে দেন।

তা, সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক না-কেন, জামিলা বিবি তো বি-এ পাশ করলেন। বাবার বিড়ির কারখানা থেকে বিস্তর টাকা পেতেন ব'লে তিনি হালফ্যাশানে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতেন। সে সময় দেশের যাবতীয় যুবক তাঁর প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিলো। যাদের ছন্দ মেলাবার ক্ষমতা আছে, তারা প্রেমের কবিতা লিখতে লাগলো আর প্রেমের গান ডুকরে উঠতে লাগলো। জামিলা বিবির হৃদয়ে প্রবেশ করবার জন্য সব যুবক কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আবদুল কাদের সাহেব ঐ কিউতে ছিলেন না। তিনি পদ্য লেখারও চেষ্টা করেননি. ওস্তাদি গানে তালিমও নেননি। তিনি বলেন, ও-সব তাঁর আসে-টাসে না। কিন্তু জামিলা বিবি বলেন যে তিনি নাকি ওঁর জন্ত

অন্তত একটা 'প্রেমের গান' রচনা করেছিলেন। আবদুল কাদের সাহেব অবিশ্যি ডাহা মিথ্যে কথা ব'লে কথাটা উড়িয়ে দেন।

আবদুল কাদের সাহেব সত্যি-সত্যি যা করেছিলেন, তা এই : একদিন রাস্তায় তিনি তরুণীটির পথরোধ করেছিলেন, জিগেশ করেছিলেন, 'তুমি জামিলা বিবি না?'

প্রশ্নটা জামিলার মোটেই মনে ধরেনি দেশে কি এমন কোনো যুবক থাকতে পারে, যে তাঁকে চেনে না? তাঁর তো দেমাক খুব, প্যাখম-তোলা ফ্যাশান-জানা তরুণী, তিনি গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, 'তো কী?'

আবদুল কাদেরের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছিলো। ভারি সুন্দর হাসি, কেমন যেন মনমাতানো। এ-হাসি জামিলা আগেও দেখেছেন। তাঁর এ-হাসি মনেও ধরেছিলো। কিন্তু পছন্দটা বুঝি খুলে বলা যায় এভাবে? তবে লোকটার ধৃষ্টতা ছাখো! তাঁকে কি না মেপেজুকে নিতে চাচ্ছে! জামিলা বিবির এটা ভালো লাগলো না। 'কী চাই তোমার?' তিনি জিগেশ করেছিলেন।

'বিশেষ কিছু না।' বলেছিলেন আবদুল কাদের। 'জামিলা বিবির বাবার বিড়ির ব্যবসায় ১২০ জন শ্রমিক আছে। আমি তাদের সেক্রেটারি। আমার নাম আবদুল কাদের।'

'শুনে আহ্লাদিত হলুম; আমি শুনেছি তুমি নাকি মস্তানি ক'রে বেড়াও?'

'বিড়ি শ্রমিকরা ধর্মঘট করার কথা ভাবছে। তোমাদের কারখানায় যাতে তালা প'ড়ে যায়, সে ব্যবস্থা আমরা করছি।'

জামিলা বিবি জিগেশ করেছিলেন, 'এ-কথা আমায় ব'লে লাভ? যাও, বাবাকে গিয়ে বলো।'

'তোমাকে এ কথা বলবার একটা উদ্দেশ্য আছে, জামিলা।'

'কী সেটা, শুনি?'

'আমি জামিলা বিবিকে ভালোবাসি।'

জামিলার হৃদয়টা যেন জুড়িয়ে গিয়েছিলো। বেশ খুশি-খুশি লেগেছিলো। কিন্তু একে একটু সজুত করা উচিত, অপমান করা উচিত। তিনি খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিলেন, তাচ্ছিল্যের হাসি সেটা, টিটকিরিতে ভরা, 'শুনে আহ্লাদ হচ্ছে,' জামিলা বলেছিলেন, 'তা আর কী খবর আছে, শুনি।'

এ-প্রশ্ন শুনে কিউ-দিয়ে-দাঁড়ানো যে-কোনো সাধারণ যুবক পুরোপুরি ফ্যাকাশে হ'য়ে যেতো। কিন্তু আবদুল কাদের প্রায় যুদ্ধের স্বরে বলেছিলেন, 'জামিলা, তুমি যদি আমায় বিয়ে না-করো তো—'

'যদি না-করি তবে তুমি কী করবে, শুনি?'

'আবদুল কাদের বলেননি যে, 'গিয়ে গলায় দড়ি দেবো!' বরং বলেছিলেন, 'তোমার হাড়ি ভেঙে চুর ক'রে দেবো।'

উত্তরে জামিলা আর-কিছু বলেননি।

আবদুল কাদের আরো জুড়ে দিয়েছিলেন, 'জামিলা, তুমি আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না! আমি তোমাকে ভালোবাসি! আমি তোমার সাজ ভালোবাসি! তুমি যেখান দিয়ে হেঁটে যাও সেই জমিটা অব্দি ভালোবাসি!'

আর কী বলার আছে? জামিলা বিবি তো পছন্দই করতেন আবদুল কাদেরকে। কিন্তু এটা বুঝি মুখ ফুটে বলা যায় বা খুলে দেখানো যায়?

তিনি শুধু তাঁকে বলেছিলেন, 'সব অল্পবয়েসী মেয়েকেই বুঝি রাস্তায় থামিয়ে দিয়ে এ-কথা বলো তুমি?'

'না, জামিলা, আমার জামিলা! তুমি ছাড়া অন্য-কোনো মেয়ের সঙ্গেই আমি কথা বলিনি! কারু দিকে তাকিয়ে অব্দি দেখিনি! আমি তাদের দিকে তাকাবোও না, তাদের সঙ্গে কথাও বলবো না। তুমিই আমার নয়নের মণি!'

একটু ভারিক্কি চাল দেখিয়ে জামিলা বলেছিলেন, 'এবং অতঃপর?'

আবদুল কাদের বলেছিলেন, 'তুমি আর আমি—আমরা পরস্পরের জন্যই জন্মেছি!'

'ও, তাই বুঝি, শুনে খুশি হলুম,' এই ব'লে জামিলা বিবি চ'লে গিয়েছিলেন।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল লড়াইটা। দুই বাড়ির লোকেরাই এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল। সমাজের মাতব্বরেরা এর বিরুদ্ধে ছিল। ঝগড়া-বচসা চলেছিলো তুলকালাম। ধর্মঘটটাও চলেছিলো অনেকদিন। কাহিনীকে আর টেনে বাড়িয়ে কী লাভ · আবদুল কাদের অবশেষে জামিলা বিবিকে বিয়ে করেছিলেন। সুখেই ছিলেন দুজনে; তারপরেই এলো এই পুবন পঞ্চম, এই মিষ্টি রসালো ছোটো পুবন কলার কাহিনী।

সময়: কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-পাঁচটা।

বর্ষাকাল। এই একটু আগে রোদ ছিলো, তারপরেই ঝমঝম বৃষ্টি। এই মরশুমে দুই-ই আসে আগে থেকে কোনো জানান না-দিয়ে। কাছেই নদীতে জল ফুলে ফেঁপে উঠছে, বান ডাকবে হয়তো। সেটা দেখবার জন্যে এবং স্নান করবার জন্যেও বটে—আবদুল কাদের সাহেব গায়ে কোনো জামা না-চড়িয়েই এবং কোমরে শুধু একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে উঠোনে নেমে পড়লে। জামিলা বিবি দরজার কাছে এসে ডাক দিলে: 'শোনো।'

আবদুল কাদের ভাবলে, 'ও নিশ্চয়ই বাইরে বেরুবার আগে গায়ে একটা জামা চড়াতে বলবে।' কারণ, বিয়ের পরে দুজনে একসঙ্গে থাকতে শুরু করবামাত্র, জামিলা বিবি কতগুলো জরুরি বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিতে শুরু করেছিলো। আবদুল কাদেরকে

ভদ্রলোক বনতে হবে। বাইরে বেরুবার আগে তাকে ভালো পোশাক প'রে নিতে হবে। তার হাবভাব আচারব্যবহার এমন হ'তে হবে, যাতে মানসম্মান যেন কিছুতেই খোয়া না যায়। অকম্মার ঢেঁকি তার সব পুরোনো ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া চলবে না। বিড়ি শ্রমিক, কবি সাহিত্যিক, কুলিকামিন, রাজনৈতিক কর্মী, মোটর-ড্রাইভার, রিকশোওলা—এবং এদের মতোই অন্য যারা—তাদের সঙ্গে সমানে-সমানে ব্যবহার করা চলবে না। তাছাড়া, বাড়িতে একজন ঝি রাখতে হবে। আবদুল কাদের নিজে রসুই পাকাতে পারবে না; তাকে সম্ভ্রান্ত লোকের মতো থাকতে হবে। এককথায়, তার জীবনযাপনের ভঙ্গিটা পালটে ফেলে 'উন্নত' করতে হবে। কোনো মেয়ে যে কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, তার বড়ো কারণ তো এটাই যে সে পুরুষের জীবনযাত্রাটাকেই বদলে ফেলতে চায়। সেইজন্যেই জামিলা বিবির সুদৃঢ় ধারণা ছিলো যে স্ত্রীদের অপ্রতিরোধ্য দাবিই হ'লো স্বামীদের সোজাসরল পথে চালাতে হবে, সব ব্যাপারে নাক গলাতে হবে, ছুঁচ হয়ে ঢুকে যেতে হবে সব আধ্যাত্মিক ও তামসিক ব্যাপারে, এবং মোটামুটিভাবে জীবনটার মধ্যে একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে বসতে হবে। অন্তত এটাই যে স্ত্রীদের কর্তব্য, এটাই ছিলো জামিলা বিবির বিশ্বাস। এই চমৎকার রমণীয় দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে আবদুল কাদের খুব-একটা উচ্চবাচ্য করেনি। বলতে পারতোই বা কী? বিয়ের পরে তো আর খুব বেশিদিন কেটে যায়নি। সে শুধু বললে: 'জামিলা, আমি কেবল নদীতে স্নান করতে যাচ্ছি। এখনও কি আমায় গায়ে জামা চড়াতে হবে?'

'ওঃ!' জামিলা বিবি এমন স্বরে কথাটা বললে যেন তার হৃদয়ে মস্ত একটা ঘা লেগেছে। 'তুমি যেন কখনো আমার কোনো কথায় কান দাও?'

'জামিলা! তোমার কথা মানিনি, এমন একটা দৃষ্টান্ত তুমি দিতে পারবে?'

এই ব'লে, আবদুল কাদের ভেতরে গিয়ে, গায়ে একটা জামা চড়িয়ে, বেরিয়ে এলো। কিন্তু জামায় একটাও বোতাম নেই।

পুরুষগুলোর যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না! কী বেয়াক্কেলে, ছাখো! জামিলা বিবি তার জামার বোতাম লাগিয়ে দিলে—তিনটে বোতামই।

আবদুল কাদের পা বাড়ালে উঠোনে।

জামিলা আবারও তাকে ডাক দিলে: 'শুনছো?'

আবদুল কাদের ঘুরে দাঁড়ালে। ভাবলে, ইয়ারাবুল আল আমিন! ঠিক জানি এটা ঐ রাঁধুনির ব্যাপারটা। আচ্ছা, কী করা যায় এ-সম্বন্ধে, শুনি? একটা রাঁধুনি ছাড়া কি বাঁচা যায় না? নিজেদের কাজকর্ম সব নিজেদেরই তো করা উচিত। যেহেতু কোনো বিদূষী তরুণী বি-এ পাশ করেছে, সেইজন্যে সে কি রাঁধতেও পারবে না? এম-এ পাশই করুক, কি পি-এইচ-ডিই পাক, মেয়েদের তবু রান্না করা উচিত! জামিলা

বিবি যদি রাঁধতে না-জানে, বেশ, আবদুল কাদের নিজেই তাকে না-হয় শিখিয়ে দেবে। সে তো এর মধ্যেই তাকে একটু-একটু ক'রে শেখাতে শুরু করেছে। আবদুল কাদের সব বানাতে পারে, বিরিয়ানি থেকে চা-জলখাবার, সব।

'কী হ'লো, জামিলা?' আবদুল কাদের জিগেশ করলে, 'তুমি কি রান্নার লোকের কথা বলছো?'

'না,' জামিলা বিবি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'আমি তো বি-এ পাশ করেছি শুধু রান্নাবান্না করবার জন্যেই! তাই না?'

'সোনা আমার!' আবদুল কাদের বললে, 'আমার মুক্তোকে আর কখনো রসুইঘরে ঢুকতেই হবে না। আমিই সব করবো। ঠিক আছে?'

'ওঃ, কত ঠিক? তুমি রোজই এই কথা বলো!'

'শুধু আজকের দিনটা, বেগম সাহেবা, আরেকটা দিন শুধু! কাল থেকে তোমার এই অধম নফরই —'

'বাজে কথা বোলো না! ও তোমার রোজকার ছুতো।'

'তা, এখন আমাকে ডাকলে কেন, বলো?'

তার মনে হ'লো এখন বুঝি জামিলা তাকে বলবে ভালো ক'রে সাজগোজ করতে, চুল আঁচড়াতে, মুখে-ঘাড়ে-গর্দানে পাউডার মাখতে। কিন্তু জামিলা বিবি একটু ইতস্তত করে, খুব লাজুকভাবে, খানিকটা বায়নার সুরে, বললে, 'পুবন পঝম'।

'কী পুবন পঝম?' মেয়েরা যদি কোনোদিনও কিছু সোজাসুজি স্পষ্ট ক'রে বলে! সে আবারও জিগেশ করলে, 'কী চাই তোমার?'

'পুবন পঝম! তুমি আমার জন্য একজোড়া কলা কিনে আনবে?'

'ফুঃ, তো তোমার পুবন পঝম চাই? মাত্র এইটুকু? কলা ভালো লাগে তোমার, হুঁ? নিশ্চয়ই কয়েকটা নিয়ে আসবো। নদীর ধারে দোকানগুলোয় কত পাওয়া যাবে পুবন পঝম। না-পাওয়া গেলে, খেয়ায় নদী পেরিয়ে গিয়ে সোজা হাট থেকেই নিয়ে আসবো, সে তো অল্প খানিকটা দূরেই!' সে বললে: 'আমি তোমার জন্যে একছড়া পুবন পঝম নিয়ে আসবো।'

'অত চাই না — একজোড়া হ'লেই হবে,' জামিলা উত্তর দিলে। তারপর আরো জুড়ে দিলে:

'তাই ব'লে এ-ধার ও-ধার ঘুরে বেড়িয়ো না যেন! শিগগির ফিরে এসো। অন্ধকার হওয়া অব্দি অপেক্ষা কোরো না। একা-একা থাকতে আমার ভয় করে না বুঝি! ভুলে যেয়ো না কিন্তু —'

'না,' ব'লে, আবদুল কাদের বেরিয়ে গেলো।

'শোনো একবার মেয়ের কথা ! এ-ধার ও-ধার ঘুরে বেড়িয়ো না যেন !' আবদুল কাদের হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। অমনি, আচমকা, গভীর প্রেমে সে গ'লে গেল — পুবন পঝম — পুবন কলা ! আহা, বেচারা বিয়ের পরে এই প্রথম কিছু চেয়েছে ! যদি অন্য-কোনো মেয়ে হ'তো — ইয়ারাবুল আল আমিন ! — কত-কী অদ্ভুত জিনিশ সে চেয়ে বসতো তার স্বামীর কাছে ! রেশম, সোনা, চুড়ি-বালা, গাড়ি, ডাকোটা বিমান ! এমন-কী তাও তো ভালো এগুলো তবু টাকা থাকলে কেনা যায়। একদল মেয়ে আছে যারা হয়তো বলতো সত্ত বাচ্চা-পাড়া সিংহিনীর গা থেকে দুটো লোম ছিঁড়ে নিয়ে এসো ! আর কেউ যদি তা না-আনতে পারে তো তাদের মনে হ'তো তাদের যথোচিত পাত্তা দেয়া হয়নি। 'আমি তো মোটে সিংহিনীর দুটো চুলই চেয়েছিলুম — সে তো আর বড়ো-একটা বেড়াল ছাড়া আর-কিছু নয় ! তো বোঝাই গেলো তুমি আমায় কতটা ভালোবাসো !' তারপরেই শুরু হ'য়ে যেতো নাকিকান্না আর জলপ্রপাত ! বেচারা স্বামী তবে করে কী ? তারপর আবার আরেক ধরনের মেয়ে আছে তারা একেবারে মাউন্ট এভারেস্টের চুড়ো থেকেই একটুকরো বরফ এনে দিতে বলতো, যেখানে কি না কেউ আজও উঠতেই পরেনি ! যদি তা না-দেয়া যায়, তো তিনি বলবেন, 'তুমি আবার পুরুষ, একটুকরো বরফও তুমি আমায় এনে দিতে পারোনি ! আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী ? তার চেয়ে তুমি আমায় খুন ক'রে ফেললেই পারো !' স্বামী বেচারা তখন কী করে ? জামিলা বিবি তার কাছে কখনো এমন অসম্ভব-অদ্ভুত জিনিশ চেয়েছে ? কখনো না। মাত্র তো দুটো পুবন পঝম — আবদুল কাদের সাহেব ভাবলে, 'স্নান ক'রে উঠেই আমি গিয়ে একছড়া পুবন পঝম কিনে আনবো।' এইসব ভাবতে-ভাবতে সে নদীর ধারে এসে পৌঁছুলো।

নদীকে দেখাচ্ছে গেরুয়া-পরা একটা সাগরের মতো। কী ঢেউ, কী দুর্দান্ত স্রোত ! নদীর দু-পাড়ে যেসব গাছ অ্যাদ্দিন নুয়ে-বেঁকে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের একটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। আর, কত-কী যে ভেসে যাচ্ছে জলের তোড়ে ! নদী যেন ভয়ংকরী হ'য়ে উঠেছে !

আবদুল কাদের নদীতে নেমে স্নান করলে, অর্থাৎ একবার ডুব দিলে। জল একেবারে বরফহিম। সে তার নিত্যকৃত্য অব্দি ভুলে গেলো। তাড়াতাড়ি গা-হাত-পা মুছে সোজা দোকানটায় চ'লে গেলো। গিয়ে দেখলো — কত জাতের কলা ঝুলছে সেখানে — কান্নন পঝম, পালাক্কোভান পঝম, পদাতি পঝম — সত্যি-বলতে, ঐ পুবন ছাড়া যত জাতের কলা হয়, সব সেখানে আছে। এখন তবে সে করে কী ? সে গিয়ে সোজা খেয়াটায় উঠলো। নৌকো যখন মাঝনদীতে গিয়ে পৌঁছুলো, হঠাৎ হাওয়া বইতে শুরু করলে তুলকালাম। তার সঙ্গে আবার সারা পৃথিবীটাই অন্ধকার হ'য়ে এলো। যা-ই হোক,

অনেক ক'রে শেষটায় তো খেয়া পৌছুলো ও-পারে। আবদুল কাদের খেয়া থেকে লাফিয়ে নেমেই ছুট লাগালে। আধারাস্তা যেতে-না-যেতেই বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো মুষলধারে। সে ছুটে গিয়ে বাজারের একটা দোকানে ঢুকলো। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, ঝমঝম। সব দোকানে একে-একে আলো জ্ব'লে উঠলো। বৃষ্টি ধরে আসে কি না, সে-জন্যে সে অপেক্ষা করলে খানিকক্ষণ। জোর হাওয়া দিচ্ছে। সে বুঝতেই পারলে না কেমন ক'রে সময় উড়ে চললো। দোকানের বারান্দায় তার চেনা লোক ছিলো কয়েকজন—পুরোনো ইয়ারদোস্ত—তাদের সঙ্গে সে গল্পগুজব জুড়ে দিলে। আচমকা তার খেয়াল হ'লো, আরে, আটটা যে বাজে! আবদুল কাদের বেজায় ঘাবড়ে গেলো। 'এদিকে জামিলা বিবি যে একলা আছে, ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে!' সে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। অনেক দোকানে গিয়ে জিগেশ করলো পুবন পঝম আছে কি না। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও একটাও পুবন পঝম নেই! সে তাহ'লে কী করে এখন? বেজায় মনখারাপ হ'য়ে গেলো তার।

শেষটায় সে এক ডজন কমলা কিনলে। 'কী? পুবন পঝম-এর চাইতে এরা ভালো নয়? দামও বেশি, তার ওপর কত রকম ভাইটামিন আছে এতে!' একটা কাগজের ঠোঙায় কমলাগুলো নিয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হলো। সব ঘুটঘুট্টে অন্ধকার, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। কোথাও এক ঝলক আলো নেই! যেন পুবন পঝম আর বৃষ্টি—দুজনে মিলে তার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করেছে!

আবদুল কাদের খেয়াঘাটে এসে পৌছুলো, কিন্তু কেউ কোথাও নেই! অন্ধকারের মধ্যেই সে খেয়ামাঝিকে ডেকে অন্তত কুড়িবার হাঁক পাড়লে। কে আছে এই বর্ষাবাদলায় যে তার হাঁক শুনবে? শুধু-শুধু চেঁচিয়ে তার গলাটা ভেঙে-যাওয়া ছাড়া আর-কোনো ফায়দাই হ'লো না। সে মনস্থির ক'রে ফেললে। যা থাকে কপালে, সে সাঁৎরেই নদী পেরুবে। গা থেকে সে খুলে নিলে জামা, কমলাগুলো সে তার তোয়ালেয় শক্ত ক'রে বাঁধলে, তারপর সেগুলো মাথায় বসিয়ে দুই দিকটা সে চিবুকের নিচে এঁটে বেঁধে গেরো দিয়ে নিলে। তার জামা আর ধুতি সে বাঁধলে কমলার বাণ্ডিলটার ওপর।

'জামিলা এখন কী করছে? শোনো, জামিলা, আমি যদি বিয়ে না-করতুম, তাহ'লে অনায়াসেই যে কোনো চেনা লোকের বাড়ি গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারতুম! দেখলে তো, বিয়ে করতে-না-করতেই কেমন ক'রে পুরুষের সব স্বাধীনতা হাপিশ হ'য়ে যায়! ইয়া আল্লাহ্, ইয়ারাবুল আল আমিন! আমি নদীতে ঝাঁপ খেয়ে সাঁৎরে ওপার যাবো—কেবল তুমিই আমায় বাঁচাতে পারো!'

এইসব ভেবে আবদুল কাদের নদীর তীর ধ'রে পুবদিকে খানিকটা হেঁটে গেলো। নদীটা বইছে পুব থেকে পশ্চিমে। সে যতই সোজা সরলরেখায় সাঁৎরাক না কেন স্রোত তাকে অন্য তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে পশ্চিমে। না কি আরো ভাটির দিকে?

সাহসে বুক বেঁধে আবদুল কাদের নদীতে গিয়ে নামলে। 'যদি ডুবে মরি? সে তবে জামিলা বিবির খাতিরেই নয় কি?'

জল তার কোমর অব্দি উঠে এলো। স্রোতের টানে পা ঠিক থাকতে চাচ্ছে না, টলছে। সে সাঁৎরাতে শুরু ক'রে দিলে। শুধু তার মাথাটাই আছে জলের ওপর। হাত দিয়ে জল কেটে-কেটে সে সাঁৎরে চললো। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোন দিকে যে যাচ্ছে কিছু বোঝবার জো নেই, শুধু একটা আবছা ধারণা আছে তার। কখন যে মাঝনদীতে গিয়ে পৌঁছুবে, আর কখনই-বা পৌঁছুবে ওপারে, সে সম্বন্ধে তার কোনো আন্দাজই নেই। তার হাত-পা অবসাদে ভ'রে গেলো। কিন্তু শেষটায় সে কী-একটা আঁকড়ে ধরলে। স্রোত তাকে প্রচণ্ড জোরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবু সে আঁকড়েই রইলো সজোরে। দু-তিন ঢোঁক জল গিলে ফেললে সে। আবদুল কাদের আবিষ্কার করলে যে সে একটা বাঁশ আঁকড়ে ধ'রে আছে। অনেক কাঁটাগাছ ও ডালপালার খোঁচা সহ্য ক'রে অবশেষে সে গিয়ে পৌঁছুলো ওপারে, পৌঁছেই ব'সে হাঁপাতে লাগলো আর ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলো। কাঁপছে ঠাণ্ডায় আর ভয়ে, কীসের হাত থেকে বেঁচেছে এ-কথা ভেবেই তার এত কাঁপুনি। এভাবে ব'সে থেকে লাভ কী? কাঁটাঝোপ আর আগাছার মধ্য দিয়ে সে হেঁটে চললো। একেবারে ন্যাংটো সে। তার ধুতি আর জামা দুটোই গেছে। শুধু তোয়ালেটা আর কমলাগুলো আছে নিরাপদে, কারণ সে সেগুলো শক্ত ক'রে মাথায় বেঁধে নিয়েছিলো। সে একটা ঝোপ থেকে একটা ডাল ছিঁড়ে নিলে, কিছু ছোটো পাতা-টাতা ছিঁড়ে নিয়ে সেটাকেই সে লাঠি হিশেবে ব্যবহার করবে। আচমকা বিদ্যুৎচমকের আলোয় ক্ষণিকের জন্য আশপাশটা চোখে পড়লো। একটা বাড়ি সে চিনতে পারলে, একটা খামারও। তাই থেকে সে আন্দাজ করতে পারলে সে কোথায় আছে। তার বাড়ি থেকে সে আধমাইল ভাটিতে চ'লে এসেছে।

খামার বাড়িটার সদর পেরিয়ে সে একটা ছোট্ট খাল পেরিয়ে এলো, নারকোল গাছ পেতে ছোট্ট একটা নড়বড়ে সাঁকো বানানো হয়েছিলো। তারপরে কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠলো ঘেউ-ঘেউ, তারপরে আরো-একটা, তারপরে আস্ত গ্রামের যত কুকুর আছে সবাই সমস্বরে চ্যাঁচাতে শুরু করে দিলে। 'কুকুরগুলো নিশ্চয়ই জগতের নৈতিকতা বাঁচাবার জন্যই হাউ-হাউ করছে,' সে ভাবলে, কিন্তু সে করবেই বা কী? অলিগলি, ছোটো-বড়ো সাঁকো পেরিয়ে, অবশেষে সে বাড়ি এসে পৌঁছুলো।

'হাড়ু! আলো-জ্বলছে দেখছি!' ভাবলে আবদুল কাদের। 'প্রাণাধিকা জামিলা এখনো শুয়ে পড়েনি তাহ'লে! স্বামীকে ভালোবাসে এই স্ত্রী!'

সে কিন্তু বললে না, 'দরজা খোলো।' তোয়ালেটা কোমরে পেঁচিয়ে নেবার পর না-হয় সে-কথা বলা যাবে। বারান্দায় উঠে এসে সে জানলা দিয়ে তাকালে। ঠাণ্ডায় সে

কাঁপছে বটে, তবু না-হেসে পারলে না। কী চমৎকার দৃশ্য! টেবিলের ওপর একটা বাতি জ্বলছে। তার পাশেই দুটো থালা সাজানো। দুটোই আরো দুটো থালা দিয়ে ঢাকা। কাছেই চার-পাঁচটা ছোটো-ছোটো রেকাবি। সেগুলোও ঢাকা দেয়া। ভাত-তরকারি আছে নিশ্চয়ই ওগুলোয়। স্ত্রী ব'সে আছে স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায়। তার হাতে একটা ভীষণ দেখতে কাটারি। চেয়ারে ব'সে থেকে-থেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে জামিলা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুধু তাই নয়। আরো কতগুলো খুঁটিনাটিও বেশ লক্ষ করার মতো। সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে খিল তুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি চোরডাকাত এসে ধাক্কা দেয়, তাই একটা টেবিল টেনে নিয়ে গিয়ে ঠেশ দিয়ে রাখা হয়েছে দরজায়। যেন টেবিলের ওজনই যথেষ্ট নয়, তাই একটা ভারি পাথর চাপানো হয়েছে টেবিলে।

'মেয়েদের বুদ্ধি কত, দ্যাখো!' এই ভেবে আবদুল কাদের যেই জামিলাকে ডাক দিয়ে জাগাতে যাবে, অমনি আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার তার চোখে পড়লো। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে আলোর ঝলক এসে পড়েছে উঠোনে। সে কী করে হ'লো? সে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। উত্তেজনায় জামিলা রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করতেই ভুলে গিয়েছে। জগতের সব চোরছ্যাঁচোড় ঐ দরজা দিয়ে মিছিল ক'রে ভেতরে ঢুকতে পারতো!

কোনো আওয়াজ না-ক'রে, আবদুল কাদের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলে। হাতের লাঠিটা সে রান্নাঘরেই রেখে দিলে এককোণে। গিয়ে ঢুকলো জামাকাপড় পরার ঘরে। তার গায়ে কত জায়গায় যে ছ'ড়ে গিয়েছে। রক্ত বেরুচ্ছে। 'জামিলা! দ্যাখো, তোমার জন্য কত রক্ত ঝরিয়েছি!' জামিলা যে সুগন্ধি পাউডার ব্যবহার করে, বেশ ক'রে সে-পাউডার সে গায়ে মাখলে। তারপর জামাকাপড় প'রে, চুল আঁচড়ে, কমলাগুলো সে ঘরের একটা টেবিলে রেখে দিলে। তারপর, যেই, জামিলাকে ডাকতে যাবে, অমনি মনে পড়ে গেল যে সন্ধের নামাজগুলো তার পড়া হয়নি না মগরিব, না-বা ঈশা। জামিলার খাতিরে তার জীবন বাঁচাবার জন্যে ইয়ারাবুল আল আমিনকে যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুটো রেকাবিতে কমলাগুলো সাজিয়ে সে জামিলাকে ডাক দিলে: 'বেগমসাহেবা।'

জামিলা আঁৎকে চোখ খুললে, হাতে কাটারিটা শক্ত ক'রে ধরা।

'লোকটাকে প্রাণে মেরে ফেলো না-যেন!' বললে আবদুল কাদের, 'সে কোনো চোর নয়, বরং বেচারা বোকাহাবা আবদুল কাদের!'

'সবখানে ঘোরাঘুরির পরে অবশেষে তোমার বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়লো।' তারপর সে দরজার দিকে তাকালে, জিগেশ করলে 'তুমি ভেতরে এলে কী ক'রে?'

আবদুল কাদের বললে, 'এই যুবাপুরুষকে দেখলেই সব দরজাই নিজে-নিজে খুলে যায়, সব হৃদয়ও—'

'বোকার মত কথা বোলো না। বলো, কেমন ক'রে—'

'রান্নাঘর দিয়ে ঢুকেছি—'

'ছিটকিনিটা খোলার জন্যে নিশ্চয়ই কোনো লাঠি ব্যবহার করেছো তুমি, তাই না? যদি কোনো চোর এ-দৃশ্য দেখতো, তবে তারাও ঐভাবে ভেতরে ঢুকে পড়বে! এ-বাড়িতে এরপর আর স্বস্তিতে থাকবো কী ক'রে বলো তো!'

আবদুল কাদের বললে, 'আরে হাঁদা! তুমি তো রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করতেই ভুলে গিয়েছিলে!'

'উঃফ্!' জামিলাবিবি বললে, 'ভদ্রভাবে কথা বলো। তুমি বলতে চাচ্ছো আমি দরজা বন্ধ করিনি?'

'ইয়ারাবুল আল আমিন!' ভাবলে আবদুল কাদের, 'কোনো স্ত্রীলোককে দিয়ে কি কখনো কবুল করানো যায় যে তার ভুল হয়েছিলো?' কাজেই সে উলটে জিগেশ করলে, 'তুমি সন্ধেবেলায় নামাজ পড়েছো?'

'পড়েছি,' জামিলা জানালে। তারপর চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে কমলাগুলো তার চোখে পড়লো। তার মুখ টকটকে লাল হ'য়ে উঠলো। দারুণ খেপে গেলো সে। বলতে চাইলো, 'ঐ যে জিনিশ তুমি এনেছো—ও কি কেউ কখনো দাঁতে কাটবে?' বিষম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কমলাগুলোর দিকে তাকালে; তার ইচ্ছে করছিলো ওগুলো সে উনুনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তবু সে একটা কথাও বললে না।

আবদুল কাদের বললে, 'কোথাও পুবন পঝম পাওয়া যায়নি।'

জামিলা কোনো হুঁ-হাঁ করলে না। ঐ যে-পদার্থ সে নিয়ে এসেছে এ-সম্বন্ধে তার বলবারই বা কী আছে!

সে জল নিয়ে এলো। দুজনে হাত ধুয়ে খেতে বসলো।

'তরকারিটা দারুণ হয়েছে,' বললে আবদুল কাদের। কিন্তু সত্যি-বলতে তরকারিটা ছিলো রীতিমতো অখাদ্য। কোনো ব্যঞ্জনে নুনই দেয়া হয়নি, কোনোটা আবার বেজায় ঝাল। কিন্তু বিয়ে-করা বৌ—তার দোষ ধরা কি ভালো?

জামিলা ঘোষণা করলে, 'আমি শুতে যাচ্ছি!'

'কমলাগুলো খেয়ে তবে শুতে যাবে। পুবম পঝম কোথাও পাওয়া যায়নি। তোমার জন্যে এগুলো আনতে আমাকে সাঁৎরে নদী পেরুতে হয়েছে!'

জামিলা বললে,'আর আদিখ্যেতা ক'রে তোমায় গল্প বানাতে হবে না! কমলা আমার ভালো লাগে লাগে না! ওগুলো যে এনেছে সে-ই যেন খায়!'

তারপর নাক সিঁটকে সে উঠে পড়লো, সোজা হেঁটে চ'লে গেলো তার বিছানায়, আর ধপ করে তাতে শুয়ে পড়লো।

আবদুল কাদের খোশা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো একটা রেকাবিতে রাখলে। তারপর সে ডাক দিলে, 'জামিলা!'

'আমার ও-সব চাইনে!'

'তুমি চাও না?' ভাবলে আবদুল কাদের, 'বিয়ের পরে-পরেই ওকে আমার বারকতক ঠ্যাঙানো উচিত ছিলো।' কিন্তু মুখে সে বললে, 'জামিলা! শিগগির এখানে উঠে এসো!'

'আমার ঘুম পেয়েছে।'

'পেয়েছে বুঝি?' আবদুল কাদের শান্তভাবে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'জামিলা! এগুলো আনতে গিয়ে আমায় বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যদি সাঁৎরে ফেরার সময় আমি ডুবে মরতুম!' কিন্তু জামিলাবিবি বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলো।

'জামিলা!'

জামিলা একটু ঘোরালে মুখটা। বললে, 'আমি পুবন পঝম চেয়েছিলুম!'

'কোথাও কোনো পুবন পঝম ছিলো না! কাল আমি তোমাকে পুবন কলার কত-গুলো গাছ যে ক'রেই হোক এনে দেবো।'

'ও! তারপর গাছে কবে কলা ধরবে, কবে পাকবে, তবে আমি খাব তাই না?'

'ঠিক আছে। কিন্তু এখন একটু কমলা খাও। এতে অনেক ভাইটামিন আছে।'

জামিলা চটে গিয়ে বললে, 'না-খেলে কী করবে, জোর ক'রে খাওয়াবে?' সে বিছানায় উঠে বসলো।

'তাই করবো তাহলে!' ভাবলে আবদুল কাদের। 'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' সে উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লাঠিটা ভেঙে একটা টুকরো নিয়ে এল।

জামিলা বিবি লাঠিটা দেখলে। সে উদাসীনভাবে ঘাড়গুঁজে ব'সে রইলো, যেন বলতে চাচ্ছে, 'ও আমি ঢের-ঢের দেখেছি!'

আবদুল কাদের বললে, 'ওঠো!'

'উঠবো না!'

'উঠবে না, অ্যা' আব্দুল কাদের একহাতে কাটারিটা তুলে নিলে।

জামিলা বিবি তড়াক ক'রে সোজা হ'য়ে বসলো।

'এসো!' আবদুল কাদের হুকুম করলে।

'না!' জামিলার সেই একই গোঁ।

আবদুল কাদের ছড়িটা দিয়ে দুই ঘা বসালে জামিলার পিঠে। কাটারিটা দেখিয়ে বললে, 'এর পর হচ্ছে এই অস্ত্র। এক কোপেই সাবাড়।'

জামিলার চোখ ফেটে জল বেরুলো। সে উঠে এলো।

ঐ চোখের জল—আঃ দেখেই আবদুল কাদেরের বুকটা যেন ফেটে গেলো। আচ্ছা, সে তো পুরুষ মানুষ, না কি? মেয়েদের চোখে জল দেখলে সব পুরুষেরই দারুণ কষ্ট হয়। কিন্তু তবু কিছুক্ষণের জন্যে সে সে বুকটাকে পাষাণ ক'রে রাখলে।

'জামিলা অকারণে চোখের জল নষ্ট কোরো না! দরকার হ'লে একটা বোয়মে পুরে রাখতে পারো সব চোখের জল। আমি ঐ জলে স্নান করবো'খন। শুনছো?'

জামিলা বিবি ভাঙা গলায় রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তুমি—তুমি কি আমাকে খুন করবে?'

'করব।' আবদুল কাদের বললে, 'তোমাকে কুচি-কুচি ক'রে কেটে তা দিয়ে বিরিয়ানি রাঁধবো!'

জামিলার হাত ধ'রে সে তাকে খাবার ঘরে কমলার রেকাবির কাছে নিয়ে এলো। 'নাও, খাও!' আবদুল কাদের হুকুম দিলে।

জামিলা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো, যেন কথাটা তার কানেই যায়নি।

'তুমি তাহ'লে তোমার স্বামীর কথা শুনবে না?' এই ব'লে সে গুনে-গুনে তার পাছায় ছ-ঘা লাগালে ছড়ি দিয়ে।

জামিলা একটা কোয়া তুলে নিলে।

'হয় নি! আরো নাও!' কাটারিটা উঁচিয়ে আবদুল কাদের চ্যাঁচালে। 'দেখছো—হাতে কী? আজ তোমাকে আমি শেষই ক'রে ফেলবো! নাও, খাও!'

জামিলা হুড়মুড় ক'রে একটার পর একটা কোয়া মুখে দিলে।

আবদুল কাদের বললে, 'অত কিছু তাড়া নেই। বিচিগুলো খেয়ো না।'

এবার জামিলা বিবি চোখের জল ফেলতে-ফেলতে কমলার কোয়া থেকে বিচি ছাড়িয়ে নিয়ে খেতে লাগলো।

আবদুল কাদের ঠিক করলে, এক্ষুনি কতগুলো মুলতুবি প্রশ্নের ফয়সালা করতে হবে। সে জিগেশ করলে, 'জামিলা, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'জানি না।'

'দেখছো এই কাটারিটা? আমি কে?'

'আমার স্বামী।'

আবদুল কাদের বললে, 'দেখছো এই কাটারিটা? ফের আমাকে তুমি বদলে ফেলার চেষ্টা করবে? শিগগির "না" বলো! দেখছো কাটারিটা?'

'না !'

'কী খাচ্ছো তুমি এখন ?'

'কমলা।'

'দেখছো কাটারিটা ? বলো, "এ হল পুবন পঝম" !'

পেছনে আরেকটা ছড়ির ঘা পড়লো।

'পুবন পঝম।'

'রান্নার লোক চাই তোমার ? বলো, "চাই না !" দেখছো কাটারিটা ?'

'চাই না।'

'তুমি কি হালফ্যাশনওলা মেয়ে—ভদ্রমহিলা কোনো! দেখছো কাটারিটা—তুমি হ'লে আমার বিবি। তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি মোটরড্রাইভার, রিক্সাওলা, কবি-সাহিত্যিক, কুলিকামিন, রাজনৈতিক কর্মী বিড়িশ্রমিকদের সঙ্গে সমানে-সমানে ব্যবহার করতে পারি ? বলো যে "পারো !" দেখছো কাটারিটা ?'

পারো ! পারো !'

'কী খাচ্ছো তুমি এখন ?'

'পুবন পঝম।'

কাটারি আর ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবদুল কাদের সাহেব জামিলা বিবিকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। 'আমার মধুরা ! আমার বেগম !' তাকে সে অনেক, অনেক চুমু খেলে। তার উরু আর পাছায় হাত বুলিয়ে দাগগুলো দেখে আবদুল কাদেরের বুক ভেঙে গেলো।

'সোনা ! খুব লেগেছে তোমার ?'

দীর্ঘশ্বাস চেপে জামিলা বললে, 'না।'

কিন্তু আবদুল কাদেরের তবু দারুণ কষ্ট হলো! আর যাই হোক, সে তো পুরুষ,, না কি ?

এইভাবে সে রাতটা কেটে গিয়েছিলো। সকাল হ'লো। নদীতে আরো কতবার বান ডাকলো, বান মিলিয়ে গেলো। দিন কেটে ঘুরে গেলো বছর, কত বছর। জামিলা বিবি ন-বার ছেলেমেয়ের জন্ম দিলেন। বিস্তর বদল হলো জগতে, কত সাম্রাজ্য ধ'সে পড়লো। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘ'টে গেলো। নতুন অনেক চিন্তা গ্রহণ করলো লোকে। মানবজাতির অনেক দিকেই অগ্রগতি ঘটলো।

আবদুল কাদের সাহেব আর জামিলা বিবি থুরথুরে বুড়ো হ'য়ে পড়লেন। দাঁত প'ড়ে গেলো তাঁদের, চুল শাদা হ'য়ে গেলো, মেরুদণ্ড বেঁকে নুয়ে গেলো তাঁদের। বুড়ো আর বুড়ি, নানা আর নানী! কিন্তু এখনো পুরোনো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে যায় তাঁদের। আবদুল কাদের সাহেব মুচকি হেসে জামিলা বিবিকে শুধোন: 'বেগমসাহেবা, মনে পড়ে, সেই-যে একবার তুমি পুবন পঝম চেয়েছিলে, সে-রাতে আমি তোমার জন্য সাঁৎরে নদী পেরিয়ে কী নিয়ে এসেছিলুম?'

জামিলা বিবিও মৃদু হেসে বলেন, 'পুবন পঝম!'

আবদুল কাদের সাহেব মৃদু হেসে জিগেশ করেন, 'কেমন দেখতে ছিলো সেগুলো?'

'গোল, কমলার মতো!' জামিলা বিবি বলেন।

'হা! হা! হা!' হেসে, আবদুল কাদের সাহেব আবার শুধোন, 'কী নিয়ে এসেছিলুম আমি?'

আর জামিলা বিবি বলেন, 'পুবন পঝম!'

## সোনার আংটি

একদিন, আমার স্ত্রী তাঁর বাক্সপ্যাঁটরা ঘেঁটে কোত্থেকে একটা সোনার আংটি পেয়ে গেলেন, আর আঙুলে সেটা প'রে সুমধুর স্বরে বললেন : 'সুন্দর, না?'

'এই বিতিকিচ্ছিরি বস্তাপচা জঞ্জালটা তুমি জোটালে কোত্থেকে?' আমি জিগেশ করলুম।

পাকা সোনার,' তিনি বললেন। 'আমার ঠাকুমার ঠাকুমার ঠাকুমার ঠাকুর্দাকে এক রাজা এটা দিয়েছিলেন।'

আমি বেজায় চ'টে গেলুম।

'তাহ'লে তোমার এটা পরবার হক কোথায়?' আমি জিগেশ করলুম। 'এটার তো আমার ভাগেই বর্তাবার কথা। জানো না বুঝি, আমি যদি খানদান খুঁজতে পুরোনো আমলে চ'লে যাই তাহ'লে সোজা শাহানশা আকবরের কোলে গিয়ে ধপাশ ক'রে পড়বো! ঐতিহাসিক তথ্য যেহেতু এবম্বিধ, তবে তুমি আংটিটা আমাকে দিচ্ছো না কেন? আমি এটা প'রে জগৎকে তার বাহারটা দেখাই।'

'হাঁদার মতো কথা বোলো না। তুমি আর তোমার খানদান! যদি চাও, তাহ'লে না-হয় দু-চারদিন এটা আঙুলে পরতে পারো।'

'তোমার অত বদান্যতা কে চেয়েছে?'

'তাহ'লে তুমি এটা কক্‌খনো পরতেই পাবে না,' দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, 'আমার এই সোনার আংটিটা আমি তোমাকে ছুঁতেই দেবো না।'

'ও…হু'!'

'আ…হ্যাঁ!'

'তাই বুঝি? বেশ, রোসো, তোমায় মজা দেখাচ্ছি.' এই ব'লে ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে আমি আমার গোঁফজোড়া চুমরে নিলুম।

ভগবানের দয়ায় আমার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা হ'য়ে পড়লেন। 'সোনার আংটিটা আঙুলে পরবার এই আমার সুবর্ণ সুযোগ,' আমি ভাবলুম। যতই প্রসবের দিন এগিয়ে এলো, একদিন তাঁর স্ফীত উদরটা ছুঁয়ে আমি তাঁকে জিগেশ করলুম :

'কী হবে ? ছেলে, না মেয়ে ?'

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় ?'

'ছেলে ?' আমি বললুম।

'সেক্ষেত্রে,' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই মেয়ে হবে।'

'বেশ। বাজি রাখো।'

'ঠিক আছে। পঞ্চাশ টাকা।'

'রাজি,' আমি বললুম, 'যদি ছেলে হয় তবে তুমি আমাকে ঐ সোনার আংটিটা দেবে।'

'এটা ?' বেশ জাঁক ক'রে তিনি তাঁর চাঁপার কলির মতো আঙুলটার শোভা প্রদর্শন করলেন। 'এর দাম তো ফেলে ছড়িয়েও কোন-না দুশো টাকা হবে। এ যে পাকা সোনা, পুরোনো আমলের জিনিশ — তায় এটা আবার কোন্-এক রাজার সম্পত্তি ছিলো।'

'রাজার হ'তে পারে, তবে সেকেলে তো বটেই,' আমি তর্ক জুড়ে দিলুম, ' রাজার পুরোনো জুতোজোড়ার দাম এখন কী হবে ? তোমার পুরোনো ব্লাউসের দাম কী এখন ?'

কোনো উত্তেজনা না-দেখিয়ে তিনি ব'সে-ব'সে আংটিটা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

'সোনার জন্যে যদি এটাকে তুমি বিক্রি করো তাহ'লে সাকুল্যে দশটা টাকাও পাবে কি না সন্দেহ,' আমি লেগেই রইলুম। 'তবে পতিদেবতা হিশেবে আমার তো সদাশয় ও অমায়িক হবারই কথা। তাই আমি পঞ্চাশ টাকা প্রস্তাব করেছি।'

আমার স্ত্রী তন্ময় হ'য়ে কী যেন ভাবলেন, শেষে বললেন : 'ঠিক আছে। তবে মেয়ে হ'লে আমাকে তুমি পঞ্চাশ টাকা দেবে।'

'আর ছেলে হ'লে তুমি আমাকে দেবে সোনার আংটিটা।'

'ঠিক আছে।' এই চুক্তির ওপর আমরা পরস্পরের হাত মেলালুম।

তাঁর সামনে যদিও আমি বড়াই ক'রে মরদোচিত সাহস দেখিয়েছি, পরে আড়ালে কিন্তু এই চুক্তি নিয়ে কেমন-একটু ঘাবড়েই গেলুম আমি। মেয়ে যদি হয় পঞ্চাশটা টাকাই লোকশান হবে আমার ! অত টাকা আমি পাবো কোত্থেকে ? এই সমস্যাটার ফয়সালা করবার জন্যে যখন আমি মাথা খুঁড়ছি, হঠাৎ আমার সঙ্গে তিনজন নায়ার আর দুজন থিয়া বন্ধুর দেখা হ'য়ে গেলো। তারা আমাকে 'গুরু' ব'লে ডাকতো। ( এখন অবশ্য তাদের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। এই হিন্দুগুলোর ওপর থেকে সব আস্থা চ'লে গেছে আমার, আমি তাদের সাবধান ক'রে দিয়েছি আর যেন তারা আমায় 'গুরু' ব'লে না-ডাকে।) এরা সবাই একজোট হ'য়ে আমাকে বাজি ধরবার জন্যে তাতালে।

বললে, আমার স্ত্রীর মেয়ে হবে, আমি বলেছিলুম যে ছেলে হবে। বাজি হ'লো মাথাগুনতি একেকজনের সঙ্গে দশ টাকা ক'রে। জিতলে পঞ্চাশ টাকা পাবো। আমরা হাত মেলালুম হাত ঝাঁকুনি দিলুম। আর ঠিক তখনই একজন হিন্দু তার অসন্তোষ প্রকাশ করলে :

'এর বিরুদ্ধে কোনো কড়া আইন থাকা উচিত। সরকারের মাথায় কোনোই বোধ-ভাগ্যি নেই। কোনো মুসলমানের যত খুশি বিবি থাকতে পারে— দশ বা তিনশো ! বেচারা হিন্দুগুলোকে কুললে একটা বৌ নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয় !'

'আমার তো সবেধন একটাই বিবি,' আমি সওয়াল করলুম।

মোটা বললে, 'আরো ক-টা শাদি করলেই বা তোমায় ঠেকাচ্ছে কে ? তোমাদের ঐ নিজামের তো তিনশো বেগম আছে।'

'হুঁ, স্বপ্ন হিশেবে এটা অতীব সুমধুরই, আমি সত্যি সিরিয়াসভাবে এ নিয়ে ভাবছি।'

'হ্যাঁ, তা আর ভাববে না ! তোমরা যা-খুশি করতে পারো। আমরা হিন্দুরা নির্বীজ করি, লুপ পরি, শুধু জনবিস্ফোরণ ঠেকাতে। আর তোমরা, মুসলমানরা ? তোমরা সব-সময়ে খুবসুরৎ হুরী-পরী তো খুঁজে বেড়াচ্ছোই, তার ওপর এখন আবার প্রসূতির কী হবে— ছেলে, না মেয়ে— তা নিয়েও বাজি ধ'রে বেড়াচ্ছো !'

'তোমাদের কে অত অল্প বয়েসে বিয়ে করতে বলেছিলো,' আমি তাকে জিগেশ করলুম, 'তোমরাও আমার মতো সবুর করতে পারতে। তাছাড়া তোমাদের যখন সুযোগ ছিলো, তখন তা নিয়ে বাজি ধরতে কে তোমাদের বারণ করেছিলো ?'

'তা ঠিক,' হিন্দুরা স্বীকার করলে। 'এ নিয়ে যে বাজিও লড়া যায় তা আমাদের মাথাতেই আসেনি, ফলে একটা সুবর্ণসুযোগ হেলায় হারিয়েছি।'

এই বাজিটা ধরবার পর থেকে আমার মন থেকে সব স্বস্তি সব শান্তি উধাও হ'য়ে গেলো। মধুর দিবাস্বপ্নে মগ্ন হ'য়ে যখনই রাস্তায় বেরুই, হিন্দুগুলো আমাকে পাকড়াও ক'রে বলে : 'কী ? ওঁর বাচ্চা হ'লো ? মেয়ে তো ?'

'তোমাদের এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না,' আমি বললুম। 'আমার বিবি একজন সবল স্বাস্থ্যবান ছেলেরই জন্ম দেবে। আর এই উপলক্ষে হিন্দুরা হারাবে পঞ্চাশটা টাকা !'

দিন কেটে চললো। একদিন সকালে আঁৎকে আমার ঘুম ভাঙলো, পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রীর ছটফটানি আর কাৎরানি শুনতে পেলুম। 'যাক, ভালোই হ'লো,' আমি ভাবলুম।

'অমন ডুকরে-ডুকরে উঠো না,' তাঁকে গিয়ে বললুম আমি, 'বরং একটু হাসো, কারণ

তুমি একটা বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে চলেছো।'

আমি যে তাঁর দশা অনুধাবন করতে পেরেছি, এটা বুঝে পরম সুখী হ'য়ে তিনি এবার আরো জোরে ডুকরে উঠতে লাগলেন।

'বলছি না চ্যাচাবে না,' আমি তাঁকে তিরস্কার করলুম। 'সেই কবে থেকে, কেউ জানে না কবে প্রথম, মেয়েরা সন্তানের জন্ম দিয়ে আসছে। আমরা পুরুষরা ও-সব প্রসব ব্যথাটেথা ভালোই জানি। সব একটা মস্ত ধাপ্পা। বুজরুকি। অতএব একটু শান্ত হও, চুপ করো।'

কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধতা তারপর। তারপরেই প্রায় বন্যার মতো ব্যথা। চ্যাচানি ডুকরানির ফাঁকে-ফাঁকে কত পীর-ফকিরের নাম ক'রে দোয়া চাওয়া হ'লো।

'তোমার ঐ পীর-ফকিরের নামের তালিকায় "আল্লামা বশীরের" নামটাও যোগ ক'রে দাও.' আমি তাঁকে বললুম। 'অন্তত তিনি যে তোমায় দোয়া করবেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

ততক্ষণে ডুকরে ওঠাটা কমেছে ; কেবল উঃ আঃ, ছটফটানি, গোঙানি চলেছে।

রূপসী তরুণী দাইটি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে বিয়ে করেনি। তার কোনো ছেলেপুলেও নেই। যখন আমি তার সঙ্গেও পঞ্চাশ টাকা বাজি ধরবার একটা চেষ্টা করলুম. সে বিষম চ'টে গেলো।

'চুপ করুন। এখন আর ওঁকে হাসাবেন না। আপনারা পুরুষরা প্রসবব্যথার কথা কী জানেন ?'

এই শাসানি দিয়ে, আমার ওপর অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ ক'রে, সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। উপলক্ষটাকে যথোচিতভাবে উদ্‌যাপন করবার জন্যে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললুম। আমারও একটু অস্থির-অস্থির লাগছে। ছেলে বা মেয়ে, যা-ই হোক না কেন, প্রসবটা যেন ভালোয়-ভালোয় উৎরে যায়। সত্যি-বলতে, এর অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে আমি ভাবছিলুমই না। তারপরেই হঠাৎ শিশুর স্বাগত কান্নার আওয়াজ শোনা গেলো।

আমি প্রায় খ্যাপার মতো দরজার কাছে ছুটে গেলুম। আঁতুড়ঘরের ভেতর থেকে কুলুপ লাগানো।

আমি প্রায় গর্জন ক'রেই বললুম, 'আমাকে একটু দেখতে দাও।'

উত্তরে আবার শিশুর কান্না শোনা গেলো, সেই সঙ্গে গোটা পুরুষজাতটার বিরুদ্ধেই দাইয়ের তর্জন-গর্জন আর বিষোদ্গার।

কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলে গেলো। বেশ হৃষ্টপুষ্ট এক শিশু! দাই তাকে উলটোভাবে ধ'রে আমার কাছে নিয়ে এলো। আমি তাকে আদর ক'রে কোলে নিয়ে

আলতো ক'রে একটু চুমু খেলুম তার কপালে।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আমি স্ত্রীর বিছানার কাছে গেলুম। দুর্বল, কাহিল, ঘামছেন কেমন, শুয়ে আছেন, চোখ দুটি আধোখোলা। আমি বাচ্চাটিকে তাঁর পাশে শুইয়ে আলগোছে তাঁর আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিলুম। বিষম বদান্যতায় তাঁর গালেও আলতো ক'রে একটা চুমু খেলুম।

'অভিনন্দন!' এই ব'লে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, আমি ধবধবে শাদা পোশাক প'রে কফি খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে হিন্দুগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম।

অবশেষে তাদের অবিষ্কার ক'রে আমি প্রকৃত তথ্যটি ঘোষণা করলুম:

'আমার স্ত্রীর নির্বিঘ্নেই প্রসব হয়েছে।'

তারপর জয়ীর ভঙ্গিতে হিন্দুদের দিকে তাকিয়ে আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠলুম।

হিন্দুদের কেমন বিমূঢ় আর হতভম্ব দেখালো।

'স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে বাজি ধরেছে। আর কে তা জিতেছে সবসময়? মুসলমানেরা! এবার, দেখি, টাকা ছাড়ো।'

হিন্দুরা কোনো আপত্তি করলে না। পাঁচজনে মিলে আমার হাতে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা তুলে দিলে। তারপর আমি তাদের সোনার আংটিটি দেখালুম।

'এই ত্যাখো, রাজঅঙ্গুরীয়! এটা ছিলো রাজা বিক্রমাদিত্যের—না-না, সম্রাট অশোকের। উঁহু, না, এর আসল মালিক হারুন-অল-রশিদ!'

'কিন্তু এখন তুমি এটা হাতালে কোত্থেকে?'

'এ আমার খানদানের সম্পত্তি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ', বিচ্ছিরি মুখ বেঁকিয়ে এক হিন্দু বললে, 'তোমার খানদান আমরা ভালোই জানি। নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান বাঁটপাড় এটাকে কোনো হিন্দু বেচারার কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়েছে।'

তবু, তাদের সব ক্ষোভ আর আক্রোশ সত্ত্বেও, আমি তাদের চা-জলখাবার খাওয়ালুম, সব্বাইকে সিগারেট খাওয়ালুম-সব ঐ যে পঞ্চাশটা টাকা তারা দিয়েছিলো, তা থেকে। তারপরে হিন্দুরা লটারির টিকিট কিনতে চাইলে। প্রথম পুরস্কার একটা পয়লা সারির মোটরগাড়ি। ভালোই তো, কেউ যদি কুললে একটা টাকা দিয়ে একটা গাড়ি পেয়ে যায়। হিন্দুরা একেক জনে দুটো তিনটে ক'রে টিকিট কিনলে। তাদের ঠ্যালায় প'ড়ে আমিও নবজাত শিশুর নামে একটা টিকিট কিনে নিলুম। তাদেরই পরামর্শে, আমি কিনলুম কাঁচকলা, টোম্যাটো, আঙুর, আপেল, আনারস, কমলা, খেজুর, এবং এইরকম আরো-সব, আর শিশুর জন্যে জরির আঁচলওলা এক রেশমি

ধুতি। পাকা আম কোথাও না-দেখে কাঁচা আমই কিনে নিলুম কিছু। একটি ছোঁড়াকে ডেকে বললুম, সব আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে, বখশিশ দেবো।

'তা হিন্দুরা কি পরের বারও একটা বাজি ধরতে সাহস পাবে?' এই রণং দেহি বাক্যটি সোজা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আমি বাড়ির দিকে রওনা হলুম। সেখানে, মা ও শিশু, স্নানের পর বড়ো ঘরটায় এসে আস্তানা নিয়েছেন।

আমি স্ত্রীর বিছানার পাশে একটা মস্ত টেবিল এনে তাতে ফলগুলো রাখলুম। তারপর বাচ্চাকে রেশমি ধুতিটি পরিয়ে দিলুম। কোনো কথাটি না-ব'লে আমার স্ত্রী আলগোছে বাচ্চার গা থেকে সেটা খুলে দলামোচা ক'রে এককোণায় ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যে সে যেন এক ছুরির ঘা, মুখ গম্ভীর, কেমন চুপ — যেন আমি কোনো বিরাট দুষ্কর্ম ক'রে বসেছি। আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকলো না।

আর কী চাই, পিয়ারী?' আমি জিগেশ করলুম। 'আমি কি পাতাল থেকে তোমার জন্যে পারিজাত নিয়ে আস্‌বো। একবার মুখ ফুটে বলো, অমনি তোমার হুকুম তামিল হ'য়ে যাবে।'

'আমি আমার সোনার আংটিটা ফেরৎ চাই', স্ত্রী আমায় বললেন, তারপর যোগ করলেন, 'আর চাই পঞ্চাশটা টাকা।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে কথা বলতেই তিনি আবারও অগ্নিবর্ষী চোখে আমার দিকে তাকালেন। 'এই যে বাচ্চার জন্ম দিলুম, সে কী — ছেলে, না মেয়ে?' আমায় তিনি জিগেশ করলেন।

'সে তো সবাই জানে···মেয়ে।'

'হা!' তিনি হাস্য করলেন।

'হো!' আমিও দন্তবিকাশ করলুম।

'তাহ'লে? হ'লো কী?'

'আমি একটা রেশমি ধুতি কিনে আমার একরত্তি বাচ্চাটিকে পরিয়েছি! বেচারার খালি গাটা ঢাকবার এটাই তো শোভন উপায়!'

'ওঃ! তোমার শোভন-অশোভন রাখো! সব নীতিবাগীশরাই ন্যাংটো জন্মেছিলো একদিন।'

'হ্যাঁ। তা ঠিক।'

'তা-ই ঠিক! কিন্তু আমি আমার সোনার আংটি ফেরৎ চাই। আর পঞ্চাশটা টাকা।'

'আচ্ছা, বাজিটা কে জিতেছে, শুনি?' আমি তাঁকে জিগেস করলুম, 'সবসময়

তুমিই তো গুনগুন করছিলে, "প্রথম বাচ্চাটা যেন ছেলে হয়, ঠিক তার বাবার মতো," আর আমিও উলটে গান ধরেছিলুম, "প্রথমজন যেন মেয়ে হয়, ঠিক তার সুন্দরী মায়ের মতো"। আমরা যুগলবন্দী গান গেয়েছিলুম : তুমি গেয়েছিলে ছেলে হবে, আমি তান ধরেছিলুম মেয়ে হবে।'

'রাখো তোমার যুগলবন্দী,' তিনি রেগে অস্থির। 'এই প্রসব ব্যথাটা এমন অভিজ্ঞতা যে সব নাড়িয়ে দিয়ে যায়। বন্যার মতো ভয় আর ব্যথা! ব্যথার চোটে মেয়েরা অনেককিছুই ভুলে যায়। তুমিও নিশ্চয়ই বিলকুল ভুলে গিয়েছো। বাজির কোনো সাক্ষীও নেই, কিংবা সেটা লিখেও রাখা হয়নি। এ-সব তথ্য ঠিক। তবে তুমি বহুত ভুল ধারণা পোষণ করছো।'

'এই কি "স্ত্রী-ধর্ম"?'

এই ওষুধেই কাজ হ'লো। কোনো মেয়েকে মাঝে-মাঝে তার স্ত্রী-ধর্মর কথা মনে করিয়ে দিলেই হ'লো। এবার তিনি নিজের স্মৃতিকেই সন্দেহ করতে শুরু ক'রে দিলেন।

'ঠিক আছে, এখন কাটো তো দেখি,' এই ব'লে তিনি পাকা মিষ্টি ফলগুলোর মধ্য থেকে একটা সবুজ কাঁচা আম তুলে নিলেন। 'ক-দিন ধ'রে একটা আম খাবার জন্যে শখ হচ্ছিলো, আমের দিন নয় ব'লে আর আনতে বলিনি। এটা কেনবার জন্যে ধন্যবাদ। এটাকে ধুতে হবে।'

এই ব'লে আমার স্ত্রী বিছানার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ধ'রে টান দিতে যাচ্ছিলেন, দড়িটার আরেক প্রান্ত গেছে রান্নাঘরের পাশে দূরের ভাঁড়ার ঘরটার পাশে, যেখানে এক বুড়ি ব'সে-ব'সে তসবী জপছে। বুড়ি বদ্ধ কালা। কিন্তু আমার স্ত্রী তার সঙ্গে ব'সে-ব'সে সবচেয়ে জটপাকানো আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা ক'রে যান। তাঁরা এমনকি আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্বন্ধেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আলোচনা ক'রে যেতে পারেন। তবে আমি এ-বুড়িকে কক্ষনো কোনোভাবেই একটা কথাও বোঝাতে পারি না।

'বুড়িকে ডেকে ফলগুলো আলমারিতে তুলে রাখতে বলো,' আমি বললুম। 'তবে, দেখো, এক্ষুনি কাঁচা আম খেয়ো না। বরং তোমার আম্মাকে জিগেশ কোরো, এখন কচি আম খাওয়া যায় কি না। বরং এই কমলাটা খাও', একটা কমলার খোশা ছাড়িয়ে তাঁকে দিলুম।

তারপর মা ও মেয়েকে চুমু খেয়ে আমি বেরিয়ে এলুম। উঠোনের আমগাছটায় চ'ড়ে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। আমার বেশ উদ্বেগ হচ্ছিলো। যণ্ডামার্কা হিন্দুগুলো আবার এদিকে এসে চড়াও না-হয়।

গাছে অবশ্যি বেশিক্ষণ চ'ড়ে ব'সে-থাকার উপায় নেই। পিঁপড়েগুলো জোট বেঁধে সমবেতভাবে আমার ওপর হামলা চালালে। আমি নেমে এসে উঠোনের এককোণায় গিয়ে হাজির হলুম, কিন্তু এমন-কোনো ঘন ঝোপঝাড় নেই যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা যায়। কী করা যায় তবে, এখন ?

এ-রকম অবস্থায় অন্য রাজনৈতিক নেতারা যা করেন, আমিও তাই করলুম : সোজা গা ঢাকা দিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে অর্থাৎ গুপ্তিপাড়ায় চ'লে গেলুম। হিন্দুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি ফাঁকা সব সরু গলিতে সট্‌কে যাই। ছাতার আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখি। থুরথুরে বুড়োর মতো ঝুঁকে-ঝুঁকে কুঁজো হ'য়ে চলি। তবে বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই কাটাই। তবে মুশকিল হ'লো পাড়ার মেয়েরা তো বাচ্চাকে দেখতে আসবে, আর চট ক'রেই খবরটা হিন্দুদের কাছে পৌছে যাবে। তবে কি ছাতে চিলে-কোঠাতেই আস্তানা গাড়বো নাকি ? আমার স্ত্রী আবার এতে নানারকম সন্দেহ ক'রে বসতে পারেন। হিন্দুরা নিশ্চয়ই অনেকদিন খবরটা পাবে না, মনকে এই ভেবে চোখ টিপে আমি স্ত্রীর বিছানার পাশে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকি।

হঠাৎ শুনি ফটকের দরজায় ক্যাঁচকেচ আওয়াজ। আর কোনো সন্দেহই নেই! বাড়ির পাঁচ কোণা থেকে পাঁচ জনে জিগেশ করলে :

'গুরু বাড়ি আছেন না কি ?'

হোঁৎকা দশাসই হিন্দুগুলো! তারা এসে বাড়িটা ঘিরে অবরোধ বসিয়েছে। কী করবো তবে এখন ?

স্ত্রীকে অনুনয় ক'রে বললুম, 'ওদের ব'লে দাও যে আমি বাড়ি নেই। বলো যে নাসেরের কাছ থেকে জরুরি এত্তেলা পেয়ে আমি একেবারে মিশরে চ'লে গেছি। কিংবা ব'লে দাও যে ত্রিপুনিতিরা গেছি। না-না, মাদ্রাজে চ'লে গেছি। জরুরি তলব।'

'আমরা ভেতরে আসছি কিন্তু। আমরা বাচ্চাকে দেখতে চাই।'

আমি আমার স্ত্রীকে মিনতি করলুম, 'ওদের ভেতরে আসতে বারণ করো।' কিন্তু চোখ তুলেই দেখি আমার মুখোমুখি পাঁচ মূর্তিমান দাঁড়িয়ে। 'কী ধৃষ্টতা! কী অসহ্য জঘন্য কাণ্ড!' আমার সারা গা জ্বলে গেলো। 'বাচ্চার জন্ম দিয়ে যেখানে এক মুসলমান মহিলা শুয়ে আছেন, সেখানে কিনা পাঁচ-পাঁচজন হিন্দু, তাও আবার সবাই পুরুষ, এসে হাজির! লজ্জা সরম আবরু কি কিছু নেই!' আমার রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো! 'আকবর! হায়দার! শাহজাহান! ইয়া খোদা!'

আমি নিমেষের মধ্যে দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরিয়ে তাদের দিকে তাকালুম। কিন্তু তাঁদের ভাবভঙ্গি এমন যে আমাকে যেন তাদের চোখেই পড়েনি।

একজনের হাতে একটা মস্ত মধুর বোতল। সে সেটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিলে। আমার স্ত্রী সেটা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি ছিপিটা খুলে এক ঢোঁক মধু ঢেলে দিলুম আমার মুখে। দারুণ! স্ত্রীর মুখেও এক ঢোঁক ঢেলে দিলুম, আর দু-এক ফোঁটা মাখিয়ে দিলুম বাচ্চার মুখে।

আলমারিতে বোতলটা তুলে রেখে, তৈরি হ'য়ে, তুফানের মুখোমুখি দাঁড়ালুম।

একজন হিন্দু বাচ্চাকে বিছানা থেকে তুলে নিলে, অন্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করলে।

'মেয়েই! যা বলেছিলুম!' তারা এক সঙ্গে ব'লে উঠলো।

আমি টুঁ শব্দটি করলুম না। আমার স্ত্রীর উচিত ছিলো আমাকে মান্য করা। যে সুন্দর রেশমি ধুতিটি কিনেছিলুম সেটা যদি তিনি বাচ্চাকে পরিয়ে দিতেন!

'কী নাম দিয়েছো এর?' এক হিন্দু জিগেশ করলে।

'শাহিনা—তার মানে রাজকন্যা বা শাহজাদী বা ঐ-রকম কিছু,' আমার স্ত্রী ঘোষণা করলেন।

'শাহিনা!' হিন্দুরা সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলো। 'তা তো হবেই। খোদ বাদশার মেয়ে যে! অভিনন্দন! মা ও শিশু দীর্ঘজীবী হোন!'

—'আর ধাড়িটাও দীর্ঘজীবী হোক,' গলার স্বর একটু নিরুত্তাপ, যখন তারা আমার কথা উল্লেখ করলে।

টেবিলের ওপরকার ফলের ঝুড়িটা থেকে সবাই একেকজনে বড়ো-বড়ো কলা তুলে নিলে, তারপর খোশা ছাড়িয়ে খেতে শুরু ক'রে দিলে।

'হিন্দুরা যা খাচ্ছে তা এক মুসলমানের কলিজা,' আমি বললুম।

কিন্তু তেতে-ওঠা দূরে থাক, হিন্দুগুলো খেয়েই চললো। কলার পরে একেকজনে তুলে নিলে একটা ক'রে আপেল। তারপর সেটাও সাবাড় ক'রে, তারা একটা মাদুর বিছিয়ে নিলে মেঝেয় শানের ওপর, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো গ্যাট হ'য়ে, আর আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হোৎকা হিন্দুটা অন্যদের বললে, 'তাহ'লে মেয়ে হয়েছে গুরুজির!'

আমার স্ত্রীর মনে কা-একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলো—যেন তাঁর কোনো ঈশ্বরদত্ত প্রজ্ঞাই আছে! জিগেশ করলেন: 'কেন? আপনাদের সঙ্গেও কোনো বাজি ছিলো বুঝি?'

'ছোট্ট একটা,' মোটকা হিন্দু বললে। 'বাচ্চাটি যদি মেয়ে হয় তবে এই খেড়ে মুসলমান আমাদের সবাইকে দশ টাকা ক'রে দেবে। আর যদি ছেলে হয় তবে বেচারা গরিব হিন্দুরা ওকে পঞ্চাশ টাকা দেবে।'

'তারপর ? আর তারপর কী হ'লো ?' আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার স্ত্রী জিগেশ করলেন।

'মুসলমান হঠাৎ এসে জন্মের কথা বললে আমাদের, আর হিন্দুদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা দাবি করলে। ব্যাস, এইটুকুই।'

আমার স্ত্রী তখনও আমাকেই নিরীক্ষণ করছেন। 'ছেলে হয়েছে বলেছিলো বুঝি ?

'না, তা বলেনি। তবে তার ভাবগতিক দেখে হিন্দুরা তাই ভেবে নিয়েছিলো।'

'তার মানে ?' আমার স্ত্রী জিগেশ করলেন।

'ধেড়ে মুসলমান আমাদের কাছে এসে বিজয়ীর ভঙ্গিতে কেমন হেসেছিলো, যেন একটা রাজ্য জয় ক'রে এসেছে। সোৎসাহে খবরটা ঘোষণা ক'রে বলেছিলো : "হিন্দুদের হার হয়েছে।" বেচারা গরিব হিন্দুরা পঞ্চাশ টাকা চাঁদা তুলে সহাস্যে সেটা মুসলমানের হাতে তুলে দিয়েছিলো।'

'যত সব মিথ্যেবাদী !' নিজেকেই আমি বললুম। 'টাকা দেবার সময় কেউ একটুও হাসেনি।'

আমার স্ত্রী আমার আঙুলের সোনার আংটিটা দেখিয়ে তাদের বললেন : 'এই আংটিটা দেখেছেন ?'

'রাজঅঙ্গুরীয়টা !' হিন্দুরা সমস্বরে ব'লে উঠলো, 'আংটিটা কার, বলুন তো ? অশোকের, না হারুন-অল-রশিদের ?'

'আংটিটা আমার। আমার ঠাকুমার ঠাকুমার ঠাকুমার ঠাকুর্দা এক রাজাকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এই আংটিটা সেই রাজসংস্করণ পুরস্কার। এ-কথা শোনবামাত্র আমার স্বামী সেটা দাবি করেছিলেন।'

'হুঁ-হুঁ। তা ইনিও বুঝি কোনো সুলতান ?'

'আমাদের মধ্যেও একটা বাজি হয়েছিলো।' আমার স্ত্রী আরো জানালেন। 'ছেলে হ'লে এঁকে আমায় সোনার আংটিটা দিতে হবে। আর মেয়ে হ'লে আমাকে ইনি পঞ্চাশ টাকা দেবেন। তারপর বাচ্চা হবামাত্র ইনি ঘরে এসে হেসে আলগোছে আস্তে আমার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নেন। ছেলে হয়েছে ভেবে আমিও একটু হাসি।'

'মিথ্যেবাদিনী !' আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। 'তুমি তখন আধো ঘোরের মধ্যে ছিলে। এত অবসন্ন যে মোটেই হাসতে পারোনি।'

'আমি মনে-মনে হাসতে পারি না বুঝি ?' আমার স্ত্রী পালটা জিগেশ করলেন।

'শোনো, বিনামূল্যে তোমাদের একটা পরামর্শ দিই,' হিন্দুদের আমি বললুম। কক্‌খনো কোনো মেয়ের সঙ্গে তর্ক কোরো না।'

'ধন্যবাদ,' একজন হিন্দু বললে। 'সব্বাই এখন আরাম ক'রে শুয়ে পড়তে পারো।'

পাঁচজনেই শান বাঁধানো মেঝেয় শুয়ে পড়লো।

'তোমাদের মৎলবটা কী, বলো তো?' আমি তাদের জিগেশ করলুম।

'সত্যাগ্রহ। আমরণ অনশন। হিন্দুদের তাদের প্রাপ্য দিতে হবে। তোমার স্ত্রীকেও তাঁর প্রাপ্য দিতে হবে···ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

এমন সময় বাচ্চাটা কী যেন বিড়বিড় ক'রে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

'ভয় পাসনে, বাছা.' আমি মেয়েকে বললুম।

হিন্দুরা কেমন ফোঁশ ফোঁশ ক'রে কী যেন শুঁকলো হাওয়ায়, মাংসের খোশবু পাবামাত্র সবাই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো, কেমন ব্যাকুল কামনার ভঙ্গিতে রসুইখানার দিকে তাকাতে লাগলো।

'চমৎকার! গোস্ত হচ্ছে! আমরণ অনশন আপাতত স্থগিত রইলো। আমরা আমরণ ধরনাই দেবো.' বললে একজনে। 'সন্ধে সাড়ে-ছটার মধ্যে আমরা কেউ বাড়ি পৌঁছুইনি দেখে আমাদের সব্বাইকার স্ত্রীরা আর সাতচল্লিশজন কাচ্চাবাচ্চা এসে হাজির হবে। তারাও এখানে আস্তানা গাড়বে।'

আমার স্ত্রী তখনও আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

'শুনলে তো তুমি?' আমি তাঁকে জিগেশ করলুম! 'হিন্দুদের একেকজনের গড়ে ন-জন ক'রে ছেলেমেয়ে। আর এই হাঁদা মুসলমানটা···'

'তুমি তো ইচ্ছে করলেই তিরিশ বা তিনশোজনকে বিয়ে করতে পারো।'

বেচারা মুসলমান বললে: 'শোনো. আমাদের এই পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর আগে যা ছিলো তার চেয়ে মোটেই আয়তনে বাড়েনি। কিন্তু এমনভাবে লোকসংখ্যায় বাড়ছে যে রোজ হাজারটা নতুন মুখকে দানাপানি দেবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। না আছে সকলের জন্যে খাদ্য না আছে সকলের জন্যে আশ্রয়। দিনে-দিনে বনজঙ্গল মাঠঘাটের পরিসরও ক'মে আসছে। কাজেই মুসলমান ঠিক করেছে "হাম দোনো, হামারা দোনো"। কিন্তু হিন্দুগুলো···'

'এ-কথা হিন্দুরাই বলেছে,' একজন হিন্দু জোর দিয়ে জানালে। 'উঁহু না, যে বলেছে সে বোধহয় খ্রীস্টান ছিলো।'

'যে-ই ব'লে থাকুক, সত্য সত্যই থাকে। মুসলমান নির্দেশটা মেনেছে—এক বিবি, দুই লেড়কা বা লেড়কি। আর হিন্দুরা সবাই? শুনলে না নিজের কানে? গড়ে একেকজনের ন-জন ক'রে কাচ্চাবাচ্চা!'

আমার স্ত্রী উঠে ব'সে কটমট ক'রে হিন্দুদের দিকে তাকালেন।

'তোমার তো শরীর ভালো নেই,' আমি তাঁকে বললুম, 'তোমার অত ধকল সইবে না। বরং নিচু গলায় এদের গালাগাল দাও, আমিই তোমার লাউডস্পীকার হবো। গড়ে নয়-নয়জন কাচ্চাবাচ্চা—ফুঃ!'

এক হিন্দু বললে: 'এ খালি আমাদের মধ্যে বিরোধ ছড়াতে চাচ্ছে। এ বুড়োর আরো-কিছু শাদি করার মৎলব আছে। সুলতান একটা আস্ত হারেম চান।'

'আসুক না তার বেগমদের,' আমার স্ত্রী শাসালেন। 'আমি ফটকে একটা মস্ত লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। এক-এক ক'রে সব ক-টাকে ঠেঙিয়ে যমের বাড়ি পাঠাবো।'

'এই কি তবে স্ত্রী-ধর্ম?' আমি অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলুম। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আমলে তো মেয়েরা এ-রকম ছিলো না!'

আমার কথায় কান না-দিয়ে আমার স্ত্রী তখন হিশেব করতে লেগে গিয়েছেন। 'পারুকুট্টি, দাক্ষু, বিশ্বলক্ষ্মী, ললিতা, নানিকুট্টি। এদের মধ্যে শুধু নানিকুট্টির ছেলেমেয়ের সংখ্যাই তিন।'

নানিকুট্টির স্বামী নির্দোষ ব'লে কৈফিয়ৎ দিলে: 'এ আমার দোষ না কি? নানি-কুট্টি দ্বিতীয়বারে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলো।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, হিন্দুদের কত ওজর, কত কৈফিয়ৎ আছে,' আমি বললুম। 'যখন খুশি ইচ্ছে মতো ওরা যমজ সন্তানের জন্ম দিতে পারে।'

'কিন্তু বাকি ছত্রিশজন কারা? এই-যে সাতচল্লিশজনের কথা বলা হ'লো?' আমার স্ত্রী আমায় জিগেশ করলেন।

'সবাই কালোবাজারের ছেলেমেয়ে!' আর হিন্দুদের কোনো ফোড়ন কাটবার অবসর না-দিয়েই স্ত্রীকে বললুম, 'তোমার ঐ দড়িটা ধরে টান দাও তো। ঐ কালা বুড়িকে বলো হিন্দুগুলোকে এক প্লেট ক'রে পাখিরি আর ছোট্ট একটুকরো ক'রে মাংস দিতে। আমি ঠিক করেছি নায়ারদের এক-একজনকে পাঁচটাকা ক'রে আর থিয়াদের এক একজনকে চারটাকা পঞ্চাশ পয়সা ক'রে দিয়ে দেবো।'

'সব্বাই পেট পুরে পাখিরি আর গোস্ত খাবেন। চা-ও,' আমার স্ত্রী সদয়ভাবে বললেন।

আমি অসহায়ভাবে বললুম, 'সানন্দে।'

এতক্ষণে সব যখন মোটামুটি আপোষেই মিটমাট হ'তে চলেছে, তক্ষুনি হিন্দুরা আবার গোল পাকাতে শুরু ক'রে দিলে।

'দারুণ ধুরন্ধর সুলতান আপনি,' এক নায়ার হেসে বললে, 'ধূর্তের শিরোমণি! নিচু জাতের লোকেরা আট আনা ক'রে কম পাবে। অতীব ন্যায্য বিচার!'

নাসুকুট্টির বর, ঐ হোঁৎকা থিয়া, চ'টেই লাল।

'নিচু জাত কারা? মুসলমান আমাদের থিয়াদের চল্লিশটাকা ক'রে নজরানা দেবে।'

কিন্তু নায়ারটা এত সহজে ছাড়লে তো? তাদের একজন বড়াই ক'রে বললে: 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়, নিচু জাতের লোকদের মারবার অধিকার তাদের ছিলো। অতএব মুসলমান আমাদের ষাট টাকা ক'রে দেবে।'

আমার স্ত্রীও তাঁর দাবি জানাতে দ্বিধা করলেন না।

'আমার শাহিনার আব্বাজান আমাকে সোনার আংটি ফিরিয়ে দেবে—আর দেবে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা।'

অতএব আমার স্ত্রী আর হিন্দুরা সবাই জিতে গেলো। আমি আমার স্ত্রীকে সোনার আংটিটা আর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলুম। হিন্দুরা খেলে পাখিরি, মাংস, চা, সিগারেট আর সবশুদ্ধ একশো টাকা। এক-এক ক'রে ব্যক্তিগতভাবে, তারপর সম্মিলিতভাবে, আমাকে বকাঝকা ক'রে তারা চ'লে গেলো। তারপর আমার স্ত্রী আমায় জিগেশ করলেন:

'তুমি কি কয়েকদিন আংটিটা আঙুলে পরতে চাও?'

'না।' আমি বললুম, 'আমি কারু কোনো দয়া চাই না।'

'গুর···গুর···গুরর···' বাচ্চা বিড়বিড় করলে।

'ঠিক বলেছিস, বাছা,' আমি মেয়েকে বললুম।

'কী বললো ও?' স্ত্রী জিগেশ করলেন।

'যে আল্লাহ্ আছেন। আল্লাহ্র দোয়া যার ওপর আছে তাকে হারায় সাধ্য কার?'

দিন কয়েক বাদে, বাজার থেকে ফিরে, আমি আমার স্ত্রীকে বললুম: 'শোনো, তোমার ঐ আংটির জন্যে নগদ কত টাকা চাও তুমি?'

'একশো এক টাকা,' তিনি বললেন।

'ঠিক হ্যায়! আল্লাহ্র দোয়া স্মরণ ক'রে, হাস্যমুখে, তোমার ঐ আঙুল থেকে তাহ'লে আংটিটা খুলে ফ্যালো। এই নাও তোমার টাকা।'

পকেট থেকে একশো এক টাকা বার ক'রে আমি তাঁর হাতে তুলে দিলুম। তিনি আমাকে আংটিটা দিতেই যথোচিত জাঁক দেখিয়ে আঙুলে প'রে নিলুম।

'দেখছো, আমায় কেমন মানিয়েছে?'

তারপর একতাড়া নোট বার ক'রে আমি আমার মেয়ের ছোট্ট শরীরটার ওপর ছড়িয়ে দিলুম।

বিস্ময়ে আমার স্ত্রীর চোখ ছানাবড়া হ'য়ে গেলো।

'বাচ্চাটা সব ভিজিয়ে ফেলবে,' এই ব'লে তিনি চট করে নোটগুলো কুড়িয়ে গুনে নিলেন।

'তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা! কোত্থেকে পেলে?'

'স্বয়ং আল্লাহ্‌ই আমায় দিয়েছেন,' আমি বললুম। 'মেয়ের নাম ক'রে আমি যে লটারির টিকিট কিনেছিলুম, তাতে আমি একটা ট্রানজিস্টার রেডিও জিতেছি। হিন্দু-গুলো কিস্‌সু পায়নি। রেডিওটা আমি চারশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি। তারপর এক জবর চায়ের আসর বসেছিল—বহুৎ খানাপিনা। এখন দেখলে তো কে জিতলো?'

'আমি,' আমার স্ত্রী বললেন।

'তুমি?' আমি শুধোলুম।

আমার আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে, একটা সুতোয় বেঁধে আমার চোখের সামনে সেটা পেণ্ডুলামের মতো দোল দিতে লাগলুম।

'হে, দীর্ঘবিস্মৃত নরকুলতিলক মহামহিম ভূপতিশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি। আপনার আশীর্বাদ নিয়ে এটা আমি আমার মেয়েকে দিয়ে দিচ্ছি।'

আমি সুতোটা আমার মেয়ের গলায় জড়িয়ে দিলুম। তার ছোট্ট বুকটার ওপর সোনার আংটিটা ঝকঝক করছে!

'গুর্‌র…গুর্‌র…'মেয়ে বিড়বিড় করলে।

'ঠিক বলেছো, মেয়ে, গুর্‌র…গুর্‌র…। সময় তো কেটে যাবেই, আমি আর আমার নাম সামনের লক্ষ বৎসরের পলির তলায় ঢেকে যাবে, তখন একদিন এক তরুণী ব'লে উঠবে, "আমার ঠাকুমার ঠাকুমার ঠাকুমার ঠাকুমার এই বাপ এই সোনার আংটিটা হারের মতো ক'রে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো"।'

# একটি ক্ষুদ্র পুরাতন প্রণয় কথা

ঘটেছিলো বছর কুড়ি আগে; অথচ আমার তা মনে পড়ে, যেন কালকের কথা। মাঝে মাঝে আমি ভাবি তখনকার ঐ উৎসাহ, সাহস, সপ্রতিভতার কী হ'লো। একটাই বল! যৌবনের তাড়না, তারুণ্যের আবেগ। দু-বার কোনোকিছু ভেবে দেখা নেই। সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়ো কর্মকাণ্ডে, হৃদয় যেদিকে চালিয়ে নিয়ে যায়, সেদিকেই ছুটে চলো···হে, সৌন্দর্য আর অন্ধবিশ্বাসের বয়েস, আমি তোমাকে কুর্নিশ করি।

ক্ষুধার মধ্যে বাঁচতুম আমরা: বিরামহীন চিরস্থায়ী ক্ষুধা। সব কিছুর জন্যেই বুভুক্ষা, সবকিছুর জন্যেই পিপাসা। কার একজনের বিরুদ্ধে আমাদের রাগ, অজানা কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের রোষ: সে এক ভয়ংকর জ্বালা। আদর্শের ঝলমলে রোদ পোহাতুম আমরা। সবকিছু সজুত হ'য়ে যাবে, ঠিক হ'য়ে যাবে; আমরাই নতুন ক'রে গড়বো জগৎটাকে। রক্তে স্নান করাবো আমরা বিশ্বকে, তাকে শুদ্ধ, শুচি ও নূতন ক'রে তুলবো! আমরা নিরীশ্বরবাদী। আমরা বিপ্লবী। আমি ছিলুম এমন-একটা গোষ্ঠির নেতা, যারা হত্যা করার আগে একবারও দোনোমনা করবে না। হে, ছুরি বন্দুক উদ্যত সন্ত্রাসের যুগ, আমি তোমাকে কুর্নিশ করি!

আমার কলমের ডগা থেকে বেরিয়ে আসতো আগুন আর গন্ধক। জীবনের আদর্শ ছিলো ধ্বংস, বিনাশ। এই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ছিলো প্রায় তিনশো যুবক। আমাদের একটা খবরকাগজ ছিলো। আমি ছিলুম তার সম্পাদক।

খবরকাগজের আপিশটা আয়তনে হয়তো একটা দেশলাইয়ের খোলের চেয়ে বড়ো হবে না।

আমরা সেখানেই থাকতুম। দিবারাত্রি আমরা চিন্তা করতুম; আর লিখতুম। দিবারাত্রি আমরা তর্ক করতুম, আলোচনা করতুম। দিবারাত্রি আমরা নূতন-নূতন পরিকল্পনা করতুম।

আমি যা বলতুম, তাকেই মনে করা হ'তো সত্য, সুসমাচার। আমাকে দারুন শ্রদ্ধাসম্মান করা হ'তো। আমি ছিলুম অবিসম্বাদিত নেতা। মনে-মনে অবশ্য আমি অনুভব করতুম কেমন একটা অযোগ্যতার ভাব, কিসের যেন একটা অভাব। কেমন যেন দমবন্ধ ভাব, তার সঙ্গে বিষণ্ণতা মেশানো।

এ-সব কিন্তু সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের উপযোগী ছিলো না। অথচ তবু মাঝেমাঝে করুণ গান গেয়ে ওঠবার ইচ্ছে করতো আমার। দুই বিরুদ্ধ অনুভূতি লড়াই করতো আমার মনের মধ্যে। শ্বাস রোধ-করা এক বিষম অনুভূতি ছিলো আমার।

যখন দম আটকে যেতে চাইতো, আমি উঠোনে পায়চারি ক'রে বেড়াতুম। দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের খোলামেলা পৃথিবীটার দিকে তাকাতুম। একদিন যখন এভাবে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ এক পরমাসুন্দরী তরুণী আমার চোখে প'ড়ে গেলো।

প্রথম দেখা....!

প্রেমে প'ড়ে যেতে আমার কয়েক মুহূর্তও লাগলো না। প্রণয়েরই জন্যে রচিত হে রূপসী প্রতিমা, আমি তোমাকেও কুর্নিশ করি।

তার দিকে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, বুকের মধ্যে গান বেজে উঠেছে তখন। সে এক পূজার অনুভূতি।

মেয়েটি সে-সবকিছু জানতে পারেনি। সে আমাকে দ্যাখেইনি।

আমি যে তাকে দেখতে পেয়েছিলুম, সেটা দৈবাৎ। একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি একটা বিশেষ দিকে তাকিয়েছিলুম। সে আমার চোখে প'ড়ে গিয়েছিলো।

হঠাৎ সে-জায়গাটা হ'য়ে গেলো তীর্থভূমি—যেখানে দাঁড়াতেই তার দর্শন মিলেছিলো।

দেয়ালে কনুই ঠেকিয়ে, মাথায় আঙুল দিয়ে, পুবদিকে তাকিয়ে ছিলুম। দেয়ালের ওপাশে এক কলাগাছের ঝাড়। ফলবাগানটাকে ঘিরে আছে নিচু এক দেয়াল। তার ওপাশ দিয়ে গেছে রাস্তা, উত্তর থেকে দক্ষিণে। রাস্তার দু-পাশেই দোতলা বাড়ি।

আমার বাঁপাশে একটা নোংরা খাল গেছে পুব থেকে পশ্চিমে, শহরটাকে দু-ভাগে ভাগ ক'রে। খালটার দু-পাশেই উঁচু দেয়াল। খালের অন্যপাশে একটা নারকোল গাছ ছিলো—ওরা গাছটার একেবারে গা ঘেঁষেই দেয়াল তুলেছে। পরে নারকোল গাছটা কেটে ফেলা হয়, সে জায়গাটায় দেয়ালে এখন একটা ফোকর আছে।

এই ফোকরটার মধ্য দিয়েই তাকে আমি দেখলুম। ফরশা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, রূপসী, ব্লাউসের তলায় বাঁধা তার স্তন দুটি আঁটো, সুগোল। খোলা চুল প'ড়ে আছে কাঁধে, সেখানে দাঁড়িয়ে সে যেন কোন স্বপ্নে মশগুল হ'য়ে আছে।

কিসের স্বপ্ন দেখছে ও, এমন মধুরভাবে? ও কি আমায় দেখতে পাচ্ছে না? আমার দিকে ও তাকাচ্ছে না কেন?

আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে খুকখুক ক'রে কাশলুম। একবার নয়, দশবার নয়—খুক-খুকও নয়—কাশির দমক, কাশির গর্জন।

কোনো কাজ হ'লো না। সে তা শুনতেই পায়নি। কেন শুনছে না ও আমাকে?

সেই থেকে, সারা জীবনটাই কাশির এক পরম্পরা হ'য়ে উঠলো। গিয়ে দাঁড়াও পুণ্যভূমিতে, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তাকাও। ও কি আছে আশপাশে কোথাও? যদি থাকে, তবে তক্ষনি আমার কাশি শুরু ক'রে দিতে হবে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবো তূণে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাশির ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। কখনও সে দেখা দেয় এক ঝলক, বিজলির মতো। অমনি পর-পর হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে আসবে আলাদা আলাদা কাশি! কোনো ফল হয় না তাতে! সে আমার কাশি শুনতেই পায় না আর আমার দিকে সে তাকায়ও না।

এইভাবে দেড়মাস কেটে গেলো। ততদিনে আমি জেনে গিয়েছি ও-বাড়ির কথা, পাশের বাড়িটারও কথা। কোনো চনমনে ব্যাপারই নেই তাতে। সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ বাড়ি ভদ্রভাবে থাকে।

আমার অর্চনার লক্ষ্য সে-বাড়ির এক ঝি!

তাতে কী? প্রেম কি কখনও কুঁড়ে ঘর আর রাজপ্রাসাদের মধ্যে কোনো তুচ্ছ বিচার করে? প্রেম চিরন্তন; প্রেম স্বর্গীয়!

তৎসত্ত্বেও, সে আমাকে দেখতেই পায়নি। তার জীবনের দিগন্তে আমার উদয় হয়নি আদৌ।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি আমার কাশির ভাঁড়ার নিয়ে। শেষটায় আমি নিরাশ হ'য়ে পড়লুম। আমার সব কাশি আস্তে-আস্তে মিইয়ে এলো। আমার জগৎটাই ঢেকে গেলো অন্ধকারে।

আশ্চর্য! আমাকে অবশেষে ও দেখতে পেলো! আমার চাঁদ অবশেষে ছড়িয়ে দিলো সিন্ধ, জীবনদায়ী জ্যোৎস্না। আমার দিকে ও তাকিয়েছে। আমি ওর দিকে তাকিয়েছি। মৃদু হেসেছে ও আমায় দেখে। আমি হাসতে পারিনি। হাসি কি দুর্বলতারই চিহ্ন নয়? তবে আমার মধ্যে যেন নতুন একটা প্রাণের স্রোত ব'য়ে গেলো, আমি গুপ্তধন খুঁড়ে পেয়েছি মাটিতে। আমার দেবী অবশেষে আমার উপস্থিতি স্বীকার করেছে। আমি ধন্য।

আমার সব দুঃখ দূর হ'য়ে গেলো। আমার কর্মকাণ্ডে আমি নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

রোজ আমাদের দেখা হয়। ও আমায় দেখে হাসে। আমিও ওকে দেখে একটু-একটু হাসতে শিখেছি।

প্রেমপূর্ণ দিনগুলো যেন উড়ে চললো।

একদিন সন্ধেয় হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হ'লো একটু। হাতকাটা গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট প'রে আমি দাঁড়িয়ে আছি খালের এপাশে আমার জায়গায়, দেয়ালের ফোকরটার দিকে

তাকিয়ে। আমার কোমরে আছে একটা খাপখোলা ছুরি। কোনো সন্ত্রাসবাদীকে তো সব-সময়েই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতে হয়, তাই না?

আমি অপেক্ষা ক'রে আছি আমার প্রেমিকার জন্যে। আমাদের আস্তানা থেকে যারা আসাযাওয়া করছে তারা আমায় দেখতে পাচ্ছে। কেউ কাছে এলেই আমি উবু হয়ে ব সে হিশি করার ভঙ্গি করছি। আর এইভাবেই দাঁড়িয়ে উবু হ'য়ে ব'সে বেশ খানিকক্ষণ সময় প্রতীক্ষায় কেটে গেলো। হঠাৎ দেয়ালের ফোকর শাদায় ভ'রে গেলো।

অমনি আমার সারা গা তপ্ত হ'য়ে গেলো। বুকটা ধকধক করছে...মুখটা শুকিয়ে গেছে। জাদুজড়ানো একটি মধুর স্বর কানে এলো: যে বৃষ্টিতে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে?'

'ও কিছু না, এমনিই!'

আবেগেভরা মুহূর্তগুলো উড়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে লোকজন বিজলী বাতি জলছে রাস্তায়—তবু লোকে এসবের কিছুই জানতে পারছে না। খালের মধ্যে কোথায় একটা ব্যাঙকে খপ ক'রে ধরেছে কোনো সাপ। শুনতে পাচ্ছি ব্যাঙের করুণ আর্তনাদ। অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠছে। ক্রমেই সব ঝাপশা হ'য়ে যাচ্ছে আমাদের চোখে। ও জিগেশ করলে: 'চলে গেছেন?'

'না; আমি ওদিকটায় আসবো?'

'কেন?'

'এমনিই।'

'না।'

'হ্যাঁ! আমি আসছি।'

'আমাদের একটা কুকুর আছে!'

'তাতে কিচ্ছু এসে যায় না।'

'খাবার খেতে ওরা এদিকটায় এসে পড়বে যে।'

'কিচ্ছু এসে-যায় না! আমি আসছি!'

'আইয়ো! না!'

ও ছুটে চ'লে গেলো। দেয়ালের ফোকরটা আবার কালো হ'য়ে গেলো।

আমি দেয়ালের ওপর ব'সে পড়লুম। রাস্তা থেকে আলো এসে পড়ছে খালে, দেয়ালের ওপরে। আমি আস্তে-আস্তে খালের জলে নেমে পড়বার চেষ্টা করলুম। উঁহু, আমার পা মাটি ছুঁচ্ছে না। আমি সন্তর্পণে পা আরো নামিয়ে দিয়ে দেয়ালটা ছেড়ে দিলুম। হাঁটু ডুবে যায় কাদায়, এত কাদা; জল এসে পৌঁছেছে কোমর অব্দি। মনে হ'লো নিচে অনেক ঝাঁটাঝোপ আর কাচের টুকরো প'ড়ে আছে। কাদায় মাখামাখি হয়ে পা দুটো বেজায়

ভারি হ'য়ে আছে; মনে হচ্ছে পায়ে বুঝি পাথর বাঁধা। আমি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলুম, খালের মাঝামাঝি এসে পৌছলুম। স্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছি আলোর মধ্যে। সামনে এক পাও এগুতে পারছি না। কাদায় আটকে গিয়েছি পুরোপুরি, লোকে দেখতে পাবে আমায়। যে-করেই হোক, সামনে আমায় এগুতেই হবে। কোনোরকমে এগিয়ে গেলুম আমি। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগিয়ে খালের অন্য পাড়ে গিয়ে পৌছলুম। ওপরে তাকিয়েই তারপর বোম্‌কে গেলুম।

জল থেকে একটা দেয়াল উঠে গেছে ওপরে। এমন-এক দেয়াল যেটা সম্ভবত গিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে! এখন তবে কী করা? কেমন ক'রে আমি দেয়াল বেয়ে উঠবো? ফিরে যাবো কি তবে? না, উঠতেই হবে আমায়। আমার নাগালের বাইরে দেয়ালের গায়ে বটগাছের ফেঁকড়ি বেরিয়েছে।

আমি লাফিয়ে বটের ফেঁকড়িটা ধ'রে ফেলবার চেষ্টা করলুম। পরের মুহূর্তেই টের পেলুম আমি দেয়ালের ওপর ব সে আছি।

'ওহ্!' ওর বিস্ময় শুনতে পেলুম আমি।

কিন্তু এখনও আমি ওর চাইতে বেশ দূরে রয়ে গেছি। লাফিয়ে নামতে পারছি না। দূরে বাড়িটার পশ্চিমদিকে আধখানা এক দেয়াল চ'লে গিয়েছে—সেটা খানিকটা নিচু। আমি বেড়ালের মতো দেয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে এলুম। অবশেষে পাশের বাড়ির উঠোনে লাফিয়ে নামা গেলো। দেখি, সেখানে একটা গোয়ালঘর। সেটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড়মড় ক'রে ভেঙে যাচ্ছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে শেষকালে আমি ঐ খাটো আধা দেয়ালের কাছে গিয়ে পৌছলুম

ও নিঃশব্দে দেয়ালের অন্যপাশে এসে দাঁড়ালো।

আমি আস্তে আস্তে আমার হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধ'রে ওকে দেয়ালের ওপর তুলে আনলুম। একটা পাথরের ধারালো চোখা ডগায় আটকে গিয়ে ওর গায়ের জামা বিকট আওয়াজ ক'রে পড়পড় ক'রে ছিঁড়ে গেলো।

তারপরেই আমার প্রেমিকা প্রচণ্ড দুই থাপ্পড় কষালো আমার মুখে: বললে: 'আইয়ো···ওরা ওদের খাবার খেতে এদিকটায় এসে পড়বে! চ'লে যান এক্ষুনি! ও যখন এই কথা বললে, তখন তার মুখ থেকে বিকট দুর্গন্ধ বেরিয়ে আমার নাকে মুখে আরেকটা লক্ষভেদী থাপ্পড় কষালে। দুর্গন্ধে আমার মাথা যেন ঝিমঝিম করছে।

যতদূরে পারি আমি স'রে গেলুম। আমার পায়ের তলায় কতগুলো শুকনো ডাল মড়মড় ক'রে ভেঙে গেলো। কাছেই কোথায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো।

ও আবার বললে: 'চলে যান', বলেই দেয়াল থেকে নেমে হনহন ক'রে চ'লে গেলো।

তারপরেই কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ জুড়ে দিলে। অতগুলো কুকুর ছিলো এখানে? আমি আস্তে হেঁটে গিয়ে খাটো দেয়ালটায় উঠে পড়লুম। সেখান থেকে আস্তে উঠে পড়লুম উঁচু দেয়ালটায়। যেই এগুতে শুরু করেছি, আচমকা দেয়াল আর উঠোনটা তীব্র আলোয় ঝলমল ক'রে উঠলো।

আমার সামনে একটাই শুধু পরদা ছোট একটা কলাপাতা। হাওয়ায় এই কলাপাতাটা যেই উড়বে বা নড়বে, সবাই আমাকে আলোর মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাবে।

সেই মুহূর্তে আবার এটাও দেখতে পেলুম আমার সংগ্রামসাথীদের কেউ কেউ আমারই ঘরের দিকে যাচ্ছে। তারা সহজেই আমায় দেখতে পেতো। তবে তারা কেউ এদিকে তাকায়নি। তারা কী ক'রে আমায় সন্দেহ করবে?

নিচে উঠোনে দু-তিন জন মহিলা আর দুজন ভদ্রলোক এসে নিজেদের মধ্যে কী-সব বলাবলি করছে। তাদের মধ্যে যার বয়েস সবচেয়ে কম—এক অল্পবয়েসী ছোকরা-আমি যেখানে দেয়ালের ওপর গুটিশুটি বসে আছি কুঁকড়ে গিয়ে, সেদিকে এগিয়ে এলো। আমাকে ধরতে আসছে! নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পেয়েছে! কী লজ্জা! কী কেলেঙ্কারি!

আমাকে পাকড়ে সে জিগেশ করবে, 'কী করছিস তুই এখানে, পাজি!'

অমনি ভিড় জ'মে যাবে। 'ওহ, এই তো সেই আগুন ঝরানো কাগজটার সম্পাদক তাই না?'

হা ঈশ্বর! এ যাবৎ আমি তোমার সমন্ধে যা-কিছু বলেছি তা সব ভুল। ঘাট হয়েছে আমার। এই অবস্থা থেকে আমাকে বাঁচাও তুমি। এ-ছোকরা যেন আমায় দেখতে না পায়!

আমি কোমর থেকে ছুরিটা খুলে নিলুম। ছোকরা যদি আমাকে পাকড়ায়...তবে আমি নিজের গলাটাই কাটবো!' হা ঈশ্বর, ছোকরার চোখ দুটো অন্ধ ক'রে দাও—অন্তত একটু ক্ষণের জন্যে ওর দৃষ্টি কেড়ে নাও।

ওদিকে আমার সহযোদ্ধারা আমায় চেঁচিয়ে ডাকছে। তারা তাদের নেতার সঙ্গে দেখা করতে চায়। হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর··দোহাই, আমার মুখে অমন করে চুনকালি লেপে দিয়ো না!

যে-ছোকরা এদিকটায় এগিয়ে এসেছিলো, সে একটা আড়াল দেখে, উবু হয়ে ব'সে হিশি করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, ফিরে চ'লে গেলো।

মনে হ'লো আমার সারা শরীর থেকে সব শক্তি যেন খালাশ হ'য়ে উধাও হ'য়ে গেছে। আমার মধ্যেটায় কী যেন ম'রে গিয়েছে।

এরপর কী ঘটেছিল, তা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। আবছাভাবে শুধু এটুকু জানি

আমি লাফিয়ে নেমেছিলুম খালের জলে, সারা গা কেটে ছ'ড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড, সারা গা কাদায় মাখামাখি। যেন কাদাই নেমেকি প'রে আছি। তারপর এদিককার দেয়ালটা টপকে আমি আবির্ভূত হয়েছিলুম আমায় সহযোদ্ধাদের কাছে।

আঁৎকে উঠেছিলো তারা আমাকে দেখে। বিমূঢ়, বিচলিত আর হতবাক। ভেবেছিলে যে তাদের নেতা, দলপতি বুঝি একটি বিশেষ কারণে লোমহর্ষক অভিযান ক'রে ফিরে এসেছে। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে আমি প্রণয়ের সঙ্গে এইমাত্র এক বিজয়দৃপ্ত সংগ্রাম শেষে ফিরে এসেছি। অতএব, ঈশ্বর, তুমিই আমায় বাঁচাও।

সারা গায়ে অনেকক্ষণ সাবান ঘ'ষে আমি স্নান করলুম। তারপর পোশাক পালটে, চুলটুল আঁচড়ে, আমার নিজের চেয়ার ওরফে সিংহাসনে গিয়ে ব'সে পড়লুম। আমার স্যাঙাৎদের আমি সাত কাহন করে বললুম কী দুর্ধর্ষ লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিলো।

সব শুনে তারা বললে এখুনি আমাদের এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। আমরা কেটে পরেছিলুম।

রাত্রির স্তব্ধতায় গা ঢেকে, আমরা প্রেমনিবাস থেকে কেটে পড়েছিলুম। আর তাই···আর এইজন্যেই···হে প্রণয়লাবণ্যের যুগ, যে-যুগে প্রেম আত্মসম্মানকে এমনভাবে রক্তাক্ত জখম করতো না, আমি তোমাকে কুর্নিশ করি!

## যুদ্ধ যদি থামাতে হয়···

'যুদ্ধ যদি থামাতে হয়···', আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে সুগঠিত মূর্তিটি বিড় বিড় করলে। ইনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং মহান চিন্তাবিদ। এঁর অবশ্য বদ-মেজাজের জন্যেও বাইরে বিস্তর নামডাক আছে। মুখে একটা আনন্দের উদ্ভাস নিয়ে ইনি তাঁর শুকনো দাদটা চুলকে যাচ্ছিলেন। আরামের একটা 'উঃশ' ধ্বনি বার ক'রে দিলেন ইনি, মুখের বাম কোণ দিয়ে, দাঁত চাপা ছিলো, তবে বাম কোণটা একটু ফাঁক ক'রেই রেখেছিলেন ইনি। যে-তরুণ সাংবাদিকটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, সাহিত্যিক তাঁকে জিগেশ করলেন: 'যুদ্ধ যদি শেষ হয়, যদি যুদ্ধ থামাতে হয় তবে আমার কী করা উচিত ব'লে তুমি বলছো?'

'আজ্ঞে, উচিত কিছুই নেই,' সাংবাদিক ছেলেটি প্রাঞ্জল ক'রে বোঝালে: 'আমরা শুধু আপনার অভিমতটাই জানতে চাচ্ছি। যুদ্ধ যদি চিরকালের মতো থেমে যায়, তার জন্যে লোকের কী করা উচিত ব'লে আপনি মনে করেন?'

'ওহে, কিছুই করণীয় নেই। তুমি এখন এখান থেকে কেটে পড়লেই যথেষ্ট হয়। হাঁদা কোথাকার!'

'আপনার, সার, কিছু-একটা বলা চাই। বিশ্বের এখন মহা-সংকট! সবকিছু ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। এ-সব শেষ হওয়া উচিত। শান্তি, শুভেচ্ছা ও প্রীতি অর্জন ক'রে নিতে হবে আমাদের। কী ক'রে তা অর্জন করা যায়, সে-বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ চাচ্ছি আমরা। যুদ্ধ যদি থামাতে হয়···?'

'বলি, ওহে আকাট ছোকরা, ওরা কি আমাকে জিগেশ ক'রে যুদ্ধ শুরু করেছিলো? একেবারে প্রাচীন কাল থেকেই কি যুদ্ধবিগ্রহ চ'লে আসছে না? এই যুদ্ধটা যদি থেমে যায়, অমনি আরেকটা যুদ্ধ শুরু হ'য়ে যাবে। যাও, ভাগো!'

'আহা, সে-কথা হচ্ছে না। তাতে কী হবে? আর কোনো যুদ্ধ লাগা উচিত নয়। যদি চিরকালের মতো যুদ্ধকে থামাতে হয়...?'

'যাও, অন্যসব মনীষী চিন্তাবিদদের জিগেশ করো গিয়ে। আমাকে জ্বালাতন কোরো না।'

'সকলেরই মত পেয়েছি আমরা,' কিঞ্চিৎ ভয়ে-ভয়ে বললে সাংবাদিক, 'আপনার

খিটখিটে মেজাজের কথা কি আমরা সবাই জানি না ? আমরা ঠিক করেছিলুম আপনার কাছেই সব শেষে আসবো। আমরা তো জানি অন্য সকলের চাইতে আপনার মতামতের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে !'

'শুনি, অন্যদের কী মত ? যুদ্ধ যদি থামাতে হয় ?'

জগৎকে জরাথুস্টর ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। জগৎকে কনফুসিয়ুসের সূত্র অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। জগৎকে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনতে হবে। জগৎকে অনুসরণ করতে হবে বুদ্ধের পথ। জগৎকে বিশ্বাস করতে হবে হজরত মহম্মদে। গুরু নানক পথ দেখিয়ে গেছেন – ইত্যাদি – ইত্যাদি…'

'এই-ই বুঝি সব ?' খিটখিটে মেজাজের সাহিত্যিক তুখোড় আরাম আর উৎসাহের সঙ্গে চুলকোতে লাগলেন। 'ঐ সব চিন্তাবিদরা আর-কিছু বলেনি ?'

'বলেছে। একদল বলেছে যুদ্ধ থামাতে হ'লে সাম্যবাদে বিশ্বাস করতে হবে। আরেকদল বলেছে সেজন্যে চাই নৈরাজ্যবাদ। আরেক মুনি বলেছেন ফ্যাসিবাদই একমাত্র রাস্তা। আরেকদল বলেছে অহিংসার নীতিতে আমাদের আস্থা চাই। কিন্তু, সার, আপনি কী বলেন – যুদ্ধ যদি থামাতে হয় ?'

'তোমাদের তাহ'লে আমাকে এ-যুগের পয়গম্বর ব'লে মেনে নিতে হবে !'

'আমি মেনে নেবো। কিন্তু সারা জগৎ কি আর মানবে ?'

'সারা জগৎকে বোঝাতে হবে তোমায়। যাও, তোমার খবরকাগজে এটা ছাপো গে। বলো যে তুমিই আমার প্রথম চেলা !'

'কিন্তু, সার, আপনার কি ঐশী অনুভূতি হয়েছে ? আপনার কাছে কি সত্য প্রকাশিত হয়েছে ?'

'হয়েছে হে হয়েছে,' তাঁর ঠোঁট মুচড়ে গেলো, চোখ দু'টো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। ঘস ঘস ক'রে তিনি চুলকেই চললেন।

সাংবাদিকটির মনে হ'লো মনীষীটি বোধহয় সারা জগতের কথা ভুলেই গেছেন, এমনভাবে তিনি ব'সে আছেন ! সে একটু জোরে গলা ঝাড়লে। খিটখিটে লেখক ঘুরে তার দিকে তাকালেন।

'গবেট উল্লুক ! এখনও তুমি যাওনি ?'

'না, সার। আপনি এখনও জগতের উদ্দেশে আপনার বাণী দেননি। যুদ্ধ যদি থামাতে হয়…?'

'গোপন কথাটা তোমার জানা আছে তো ? তাহ'লে লোকের বউ-ছেলেমেয়েদের ধ'রে-ধ'রে পেটাতে হবে। ছোকরা, শোনো, দেড়বছর হ'লো আমার বউ-ছেলেমেয়েদের আমি পেটাইনি। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিছকই ভুলে গিয়েছিলুম !'

'অ্যা ? সার ? গত দেড় বছর ধ'রে বিস্মৃতি আপনাকে পাকড়েছে ?'

'আরে, হাঁদা, না ! উল্লাস ! দিব্যানুভূতি ।'

'আমি, সার, বুঝতে পারছি না !'

'বলি, আমি কি কোনো সম্পাদক, সমালোচক বা প্রকাশককে গত দেড় বছরে আচ্ছা ক'রে ধোলাই দিয়েছি ?'

'না !'

গত দেড় বছরে কি আমি কোনো নতুন বই প্রকাশ করেছি ?'

'না !'

'গত দেড়বছরে পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো হুজ্জুৎ বেঁধেছিলো ? কোনো মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলুম ?'

'আমি তো কিছু শুনিনি !'

'কেন শোনোনি, আকাট, কেন ?'

'জানি না সার, কেন !'

'তা সে কারণটা গিয়ে খুঁজে বার করছো না কেন ? আমি কি কোনো খবর নই ?'

'হ্যাঁ, সার, আমাদের কাগজের দিক থেকে এটা একটা মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে ! আমাদের ক্ষমা ক'রে দিন, সার। যুদ্ধ যদি থামাতে হয়…?'

'গিয়ে প্রার্থনা করো সারাক্ষণ !'

'আইয়ো, লোকে অনেকদিন ধ'রে প্রার্থনা করেছে। তাতে কোনো ফল হয়নি, সার। আপনার সামনে কী সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেটা আমাদের ব'লে দিতেই হবে, সার। যুদ্ধ যদি থামাতে হয়…?'

'তোমার চোখ আছে, অথচ তুমি কিছুই দেখতে পাও না ! তোমার কান আছে, অথচ তুমি কিছুই শুনতে পাও না ! হাঁদা, কাটো হিঁয়াসে !'

'আইয়ো, কিন্তু সেটাই, সার, যথেষ্ট হ'লো না ! সার, আমরা সাগ্রহে আপনার সামনে কী সত্য প্রকাশ হয়েছে, তা-ই জানতে চাচ্ছি। যুদ্ধ যদি থামাতে হয়…'

'যুদ্ধ যদি না-ই বা থামে, তবেই বা কার কী এলো গেলো ? তাতে কি তোমার কাগজের বিক্রি ক'মে যায় ?'

'না।'

'আমার বইগুলো কিছু কম বিক্রি হয় ?'

'না।'

'তাহ'লে এবার তুমি রাস্তা দেখতে পারো।'

'আইয়ো! সার। তবু একটা-কিছু উপদেশ দিন! আপনার কথার ওপরেই জগতের ভবিষ্যৎ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। যুদ্ধ যদি থামাতে হয়…?'

'যুদ্ধ যদি থামাতে হয়।' বিখ্যাত সাহিত্যিক ঘস-ঘস ক'রে শুধু চুলকেই চললেন, তাঁর মুখটা আরামে আর তৃপ্তিতে কী-রকম জ্বলজ্বল করছে। তিনি ঘোষণা করলেন : 'আজকের পৃথিবীর যত রাজনৈতিক নেতা আছে, যত ধর্মগুরু আছে, যত চিন্তাবিদ আছে, সেনাবাহিনীর যত লোক আছে—এককথায়, পৃথিবীতে যত নরনারী আছে—সকলকেই শরীরে আমার মতো শুকনো বিদঘুটে দশাসই একখানা দাদ বসিয়ে রাখতে হবে। এমন এক দাদ যেটা দিনরাত্তির সবাইকে যেন জালায়, সারাক্ষণ যেন চুলকোয়।'

আয়না ও সাপ 
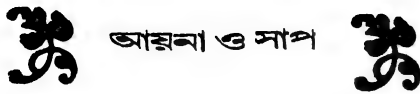
'তোমাদের শরীরের কোনো অঙ্গ কখনও পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলো কি কোনো সাপ? কোনো খানদানি গোখরো?'

আমরা সবাই চুপ ক'রে গেলুম। প্রশ্নটা এসেছিলো এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছ থেকে। আমরা সাপ নিয়ে আলোচনা করছিলুম, তাই থেকেই কথাটা উঠে পড়লো। ডাক্তার যেই কাহিনীটা ফাঁদলেন, আমরা সবাই মন দিয়ে শুনতে লাগলুম।

'গ্রীষ্মের একটা রাত, দারুণ গরম ; দশটা বাজে। আমি রেস্তোর'ায় খাওয়া সেরে আমার ঘরে ফিরেছি। দরজা খুলতেই ওপর থেকে একটা শোঁ-শোঁ আওয়াজ ভেসে এলো। শব্দটা আমার চেনা, খুবই চেনা! এমনিতেই যে-কেউ বলতে পারতো যে ইঁদুররা আর আমি ঘরটায় ভাগাভাগি ক'রে থাকতুম। আমি দেশলাই বার ক'রে টেবিলের ওপরকার কেরোসিনের লণ্ঠনটা জালিয়ে নিলুম।

বাড়িটায় বিজলি নেই। ছোট্ট একটা ভাড়া ঘর। আমি তখন সবে ডাক্তারি শুরু করেছি, রোজগার অতি নগণ্যই। আমার স্যুটকেসে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে হয়তো গোটা ষাটেক টাকা আছে। গোটা কয় ধুতি আর শার্টের সঙ্গে আমার একখানি কালো কোটও ছিলো—সেটা তখন আমার পরনে।

কালো কোট, শাদা শার্ট, আর তেমন-শাদা-নয় গায়ের গেঞ্জিটা খুলে আমি সেগুলো ঝুলিয়ে দিলুম। ঘরের দুটো জানলা খুলে দিলুম। ঘরটা বারবাড়ির, একটা দেয়াল সামনের উঠোনটার দিকে তাকিয়ে আছে। টালির ছাদ, দেয়ালের তেকোণা কোণগুলো কড়িবরগা দিয়ে দাঁড় করানো। সিলিং ব'লে কিছু ঠিক নেই। কড়িকাঠ দিয়ে ইঁদুরদের নিয়মিত ব্যস্ত আনাগোনা চলে। আমি বিছানা পেতে খাটিয়াটা দেয়ালের গা ঘেঁষে টেনে আনলুম। শুয়ে পড়লেও কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। উঠে প'ড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম, একটু যদি হাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু পবনদেব বোধহয় সে-রাতে কাজ থেকে ফরাশি ছুটি নিয়েছিলেন।

ঘরে ফিরে এসে আমি চেয়ারটায় ব'সে পড়লুম। টেবিলের তলাকার তোরঙ্গটা খুলে আমি একটা বই বার ক'রে নিলুম, 'মেটিরিয়া মেডিকা'। টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা

জ্বলছে, পাশেই একটা মস্ত আয়না, পাশে একটা চিরুনি প'ড়ে আছে। বইটা টেবিলে রেখে আমি পাতা ওলটালুম।

কোনো আয়নার কাছে এলেই লোকের আয়নার দিকে তাকাতে লোভ হয়। আমি আয়নায় দিকে তাকালুম। আমি সে-সময় ছিলুম সৌন্দর্যের ভক্ত. নিজেকেও সাজিয়ে-গুছিয়ে সুশ্রী ক'রে তোলবার ইচ্ছে হ'তো। বিয়ে হয়নি. পেশা ডাক্তারি, মনে হ'তো সবাইকে আমার উপস্থিতিটা জানান দেয়া উচিত। চিরুনিটা তুলে নিয়ে চুল আঁচড়ে টেরি কাটলুম, সিঁথিটা ঠিক ক'রে নিলুম যাতে উশকোখুশকো না-দেখায়।

অমনি আবার ওপর থেকে শোঁ-শোঁ আওয়াজ এলো!

আমি আয়নায় ভালো ক'রে নিজের মুখটা তাকিয়ে দেখলুম। একটা অতীব গুরুতর সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললুম। রোজ দাড়ি কামাবো, একটা সূক্ষ্ম গোঁফ গজাবো যাতে আমায় আরো সুপুরুষ দেখায়। একে তখনও বিয়ে হয়নি, তায় পেশায় ডাক্তার তো।

আয়নার দিয়ে তাকিয়ে একটু হাসলুম আমি। হাসিখানা বেশ মনোহর, মন-মাতানো। তক্ষুনি আরেকটা যুগান্তরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললুম আমি। এই মনোহর হাসিখানিকে আমার মুখের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ক'রে তুলতে হবে ..যাতে আমাকে আরো সুপুরুষ দেখায়, একে বিয়ে হয়নি. তায় আমি একজন ডাক্তার।

আবারও ওপর থেকে সেই শোঁ-শোঁ আওয়াজ!

আমি উঠে প'ড়ে, একটা বিড়ি ধরিয়ে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলুম। তারপর আরো-একটা চমৎকার ভাবনা খেলে গেলো মগজে। আমি বিয়ে করবো। বিয়ে করবো এক লেডিডাক্তারকে, যার বিস্তর টাকা থাকবে. আর থাকবে রমরমা ব্যাবসা। তাকে বেশ নধর ও পৃথুল হ'তে হবে। তার একটা বড়ো কারণ আছে। যদি আমি কোনো ভুল ক'রে বসি, আর আমাকে চম্পট দিতে হয়, তবে সে যাতে আমার পেছন ধাওয়া ক'রে এসে আমায় পাকড়াতে না-পারে।

মাথার মধ্যে এ সব কিলবিল-করা ভাবনা নিয়ে আমি আবার এসে টেবিলের সামনে চেয়ারটায় ব'সে পড়লুম। ওপরে আর কোনো শোঁ-শোঁ আওয়াজ নেই। হঠাৎ একটা নিস্তেজ আওয়াজ, যেন একটা রবারের নল এসে পড়েছে মাটিতে···ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তবু আমি ভাবলুম ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখি। ফিরতে-না-ফিরতে ফিরতেই এক পৃথুল সাপ চেয়ারের গা বেয়ে উঠে আমার কাঁধে বসলো। আমার পেছন ফেরা এবং সাপের এই আবির্ভাব—দুটোই ঘটলো একসঙ্গে।

আমি লাফিয়ে উঠিনি। থরথর ক'রে কাঁপিনি। ভয়ে চেঁচিয়েও উঠিনি। এতসব করার কোনো অবসরই ছিলো না। সাপটা কাঁধ থেকে গা বেয়ে নেমে আমার বাঁ হাতে এসে কনুইয়ের ওপরটায় পেঁচিয়ে ধরলো। ফণা তোলা, মাথাটা আমার মুখ

থেকে তিন-চার ইঞ্চিও দূরে হবে কি না সন্দেহ !

শুধু এই বললেই ঠিক হবে না যে আমি দম আটকে ঝিম মেরে ব'সে ছিলুম। আমি একেবারে পাথর হ'য়ে গিয়েছিলুম, পুরোপুরি প্রস্তরীভূত। কিন্তু আমার মন তখন সবেগে কাজ ক'রে চলেছে। অন্ধকারে খুলে আছে এক দরজা। ঘরটা অন্ধকার দিয়ে মোড়া। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় আমি ব'সে আছি চেয়ারে, পাথরের মূর্তির মতো, অথচ রক্ত-মাংসে গড়া, আর আয়নায় তারই প্রতিবিম্ব।

তখনই আমি এই জগৎই শুধু নয়, আস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান স্রষ্টার উপস্থিতিটা টের পেলুম। ভগবান আছেন। যদি আমি কিছু বলি, আর সেটা তাঁর পছন্দ না-হয় --জ্বলজ্বলে হরফে খুদে-খুদে আমার বুকের কলজেয় আমি লিখবার চেষ্টা করলুম : 'হে ভগবান।'

আমার বাঁ হাতে ব্যথা করছে। যেন একটা পুরু শিশের শিক...না-না, জলন্ত আগুনে গড়া একটা শিক...আস্তে কিন্তু সবলে আমার হাতটা গুঁড়িয়ে ফেলছে। হাতটা থেকে এর মধ্যেই সব শক্তি উধাও হ'য়ে গিয়ে হাতটা অবশ হ'য়ে আসছে। কী করবো এখন আমি ?

একটু নড়লেই তো সাপটা ছোবলাবে আমায় ! সাক্ষাৎ মরণ গুঁড়ি মেরে আছে মাত্র চার ইঞ্চি দূরে। ধরা যাক, এ আমায় ছোবলালো, কী ওষুধ লাগবে তখন ? ঘরে কোনো ওষুধই নেই। আমি তো নেহাৎই অপোগণ্ড, গরিব, বেচারি-মতো হাঁদা এক ডাক্তার সবকিছু ভুলে গিয়ে, আমার আত্মা দুর্বল একটি শুকনো হাসি হাসলো।

মনে হয় ভগবান সেটা দারুণ উপভোগ করেছিলেন। সাপটা তার মুখ ঘোরালো। আয়নার দিকে তাকালো সে। নিজের প্রতিবিম্বটা সে দেখতে পেলে। এটা আমি দাবি করতে চাই না যে পৃথিবীতে এটাই প্রথম সাপ যে আয়নার দিকে তাকিয়েছে। তবে এ-সাপটি যে আয়নায় নিজেকে দেখছে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। সে কি তার নিজের রূপ দেখে মোহিত হ'য়ে গেছে ? সেও কি গুরুতর সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে—যেমন গোঁফ গজাবে কি না, কাজল দেবে কি না চোখে কিংবা চোখের পাতায় মাস্কারা, না কি ভাবছে যে কপালে সিঁদুরের টিপ দেবে ?

নিশ্চিতভাবে কিছুই আমার জানা নেই। স্ত্রী, না পুরুষ—এই সাপটা কী ? আমি কোনোদিনই জানতে পাবো না। কারণ সাপটা আমার বাহুর বাঁধন আস্তে-আস্তে খুলে আমার কোলে নেমে এলো, তারপর সেখান থেকে বেয়ে উঠলো টেবিল, আর আয়নার দিকে এগিয়ে গেলো। হয়তো আরো কাছে থেকে সে নিজেকে দেখে বাহবা দিতে চাচ্ছে রূপের।

আমি তো নই গ্র্যানাইটে গড়া কোনো মূর্তি। আমি রক্তমাংসের মানুষ। নিশ্বাস

চেপে আমি আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠলুম, সন্তর্পণে দরজাটা দিয়ে এলুম বারান্দায়, তারপর সেখান থেকে সটান এক লাফ দিলুম উঠোনে, তারপর পড়িমরি ক'রে এক ছুট লাগালুম।

'উঃফ্!' আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, সবাই আমরা বিড়ি ধরালুম। আমাদের মধ্যে একজন জিগেশ করলে: 'ডাক্তার আপনার স্ত্রী কি খুব মোটা না কি?'

'না,' ডাক্তার বললেন। 'ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরকম ছিলো। আমার জীবন-সঙ্গিনী রোগা ছিপছিপে পাৎলা মতো, পায়ে দারুণ ক্ষিপ্রগতি।'

আরেকজন জিগেশ করলে: 'ডাক্তার, তুমি যখন ছুটেছিলে, সাপটাও কি তোমার পেছনে তাড়া ক'রে এসেছিলো?'

ডাক্তার জবাব দিলেন: 'যতক্ষন-না এক বন্ধুর দরজায় এসে পৌঁছুই, আমি কেবলই প্রাণপণে ছুটেছি। বন্ধুর বাড়ি এসে তক্ষুনি সারা গায়ে তেল মেখে স্নান ক'রে নিই। কাচা জামাকাপড় পরি। পরদিন সকালে সাড়ে-আটটা নাগাদ আমার বন্ধু ও আরো দু-তিনজনকে সঙ্গে ক'রে আমার ঘরে ফিরে আসি—সেখান থেকে বাক্সপ্যাটরা সব সরাবার জন্যে। তবে গিয়ে দেখি সরাবার মতো কিছুই প্রায় নেই। কোনো চোর এসে আমার প্রায় সব পার্থিব সম্পত্তি নিয়ে সটকে পড়েছে। ঘরটা ধোয়াপাখলা, সাফ! না-না, সেই সমাজবিরোধী তস্করটি আবার জলজ্যান্ত অপমানের নিদর্শন হিশেবে একটা জিনিশ ফেলে গিয়েছিলো।'

আমি জিগেশ করলুম: 'কী সেটা?'

ডাক্তার বললেন: 'আমার গেঞ্জি। সেই ময়লা গেঞ্জিটা! চোরের আবার পরিচ্ছন্নতার বোধ!...বদমায়েশটা সেটা নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে ভালো ক'রে কেচে-টেচে ব্যবহার করতে পারতো।'

'পরদিন কি সাপটাকে দেখতে পেয়েছিলেন, ডাক্তার?'

ডাক্তার হেসে উঠলেন: 'আর-কখনও তাকে দেখিনি। সৌন্দর্যের বোধ আছে এমন একটা সাপ ছিলো ও।'

## নিঃসঙ্গতার মহাতীর

মরা চাঁদের হিম আলো বাগান ধুয়ে দিচ্ছে। হাওয়ায় এখনও কোনো উধাও সৌরভের রেশ। যেন সবকিছুর উপর ঝুলে আছে অবয়বহীন কোনো স্বপ্ন।

আমি, শুধু আমি, একা নিঃসঙ্গতার এই মহাতীরে।'

তুমি কোথায়, তা আমি জানি না।

একবার এ- রকমই কোনো-এক রাতে আমরা দুজনে বসেছিলুম এই বাগানটাতেই, যে-অজানা সমাপ্তি আসন্ন, তার কথা ভেবে তখন আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলুম একবার।

তুমি উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে আমায় জিগেশ করেছিলে: 'অমন বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস কেন?'

আমি জিগেশ করেছিলুম: 'মরা স্মৃতির অন্ধকারে যখন আমি ডুবে যাবো, তখন কে আমায় মনে রাখবে?'

'আমি রাখবো!' তুমি বলেছিলে। 'মধুরা আমার, বসন্তের নতুন গন্ধের মধ্যে, উদয় সূর্যের সোনার আলোর ভেতর দিয়ে, শুকতারার রুপোলি আলোর মতো তোমার ভাবনারা আমার কাছে এসে পৌছুবে। যখন আমি শুনতে পাই বজ্রের ঘন নাদে মেঘ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে, যখন দেখতে পাই চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বিদ্যুতের চমক, আমার মন-প্রাণ তখন ছুটে আসবে তোমার কাছে।'

সেই মুহূর্ত কবে কোন্ অতীতে হারিয়ে গিয়েছে।

এখন আছে শুধু সময়ের এই জ্যান্ত মুহূর্তটাই!

দুজনের মাঝখানে, ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে আছড়াচ্ছে বিশাল সমুদ্র—যার অন্য নাম সময়। সব আশা শেষ হ'য়ে গেছে। দুর্বল হ'য়ে পড়েছে চিন্তার সব পাখা। আমি তলিয়ে যাচ্ছি। মুহূর্তের···পর...মুহূর্তে। যে-স্মৃতি আর নেই তার অন্ধকারে আমি পলে-পলে মিশে যাচ্ছি। অথচ তবু গজিয়ে ওঠে কচি পাতাগুলো। মুকুলিত হ'য়ে ওঠে কুঁড়ি। বসন্ত আসে নবীন, সতেজ। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া বাগানের উপর ঝুলে থাকে আকারহীন অবয়বহীন কোনো স্বপ্ন। যে-স্তব্ধতা সারা জগৎ ভ'রে রেখেছে, তার মধ্যে আমার হৃদয় মুকুলিত হ'য়ে ওঠে ভাবনায়:

'মধুরা, আসছো না কেন তুমি ?' আমার এখনও মনে পড়ে সেই দুর্লভ মুহূর্ত যখন তোমার আহ্বান সানন্দে ভেসে এসেছিলো আমার কানে।

'বসন্তের রাত শেষ হ'য়ে আসছে। এই নিঃসঙ্গতা আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মধুরা, এখনও তুমি আসছো না কেন ?'

'যখন তোমার নরম হৃৎস্পন্দনের ছন্দে নেচে ওঠে কচিপাতারা ;

'যখন রাতের হাওয়া আমাকে আদর ক'রে যায় তোমার বরতনুর শীতল সুরভি সমেত –

'মধুরা, আমি তখন তোমার অধীর পায়ের শব্দ শুনতে পাই। সে যে আসে ! সে যে আসে ! প্রণয়ে এমনই ভ'রে আছে রাজকুমারী আমার, আর এখন সে আসছে আমার কাছে। কোনো বিশ্রাম জানে না আমার হৃদয়। কেন তুমি এমন দ্রুত আর অস্থির ক'রে তোলো তাকে ?

'মধুরা, এখনও তুমি এলে না কেন ?'

পান্থ, পথের পথিক, কেন তুমি সেই ফুল দিয়েছিলে আমার হাতে, শুধু আমারই হাতে ? এমন-কোন্ বৈশিষ্ট্য আছে আমার ? সখীরা আমাকে শুধোয় – ওরা আমার মুখ তুলে ধ'রে, বারে-বারে, অবিরাম আমায় জিগেশ করে – তুমি কে ? আমি বলি, জানি না তো।

'মিথ্যেবাদিনী, জানিসনে বুঝি ?' ওরা আমাকে খেপায়। সারাক্ষণ ওরা আমাকে নিয়ে রঙ্গ করে, কৌতুক করে। পরস্পরকে ওরা শুধোয় :
'এই মেয়েটির মধ্যে সে যে কী দেখতে পায় !'

মধুরা, শুধু তোমার চোখ থেকেই এসেছিলো চেতনার প্রথম উন্মেষের রশ্মিগুলো, জাগিয়ে দিয়েছিলো আমার হৃদয়। শুধু তা-ই নয়। তোমারই উপস্থিতিতে অন্য-সব মুখগুলো বিবর্ণ হয়ে যায় আকারহীনতায়।'

৪

'ঐ ফুল দিয়ে তুমি কী করেছিলে ?'
'কোন্ ফুল ?'
'সেই-যে ফুল, রক্তের মতো লাল।'

'ওহ্·· সেই··· !'

'হ্যাঁ ! কী করেছিলে তুমি তাকে দিয়ে ?'

'জানবার জন্যে এমন ব্যাকুল কেন তুমি ?'

'ভাবছিলুম তুমি তাকে পায়ে মাড়িয়ে গেছো কি না।'

'যদি যাই ?'

'ওহ্ কিছু-না। সে ছিলো আমার হৃদয়।'

৫

তোমার চোখগুলো অমন লাল কেন, যেন তুমি কেঁদেছো ? কেন তোমার মুখ অমন হতচকিত, হতাশ ? ওহ্···না, আমি তো তাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাইনি। কখনও, কখনও সে-ফুল আমি নষ্ট করবো না। একটুক্ষণ তাকে আমি গুঁজে রেখেছিলুম খোঁপায়। কিন্তু তারপর তাকে তো আমি—সবকিছুর মধ্যে শুধু তাকেই—জগতের কাছে দেখাতে চাইনি। যদি জিগেশ করো কোথায় সে আছে, তা কিন্তু তোমায় আমি বলবো না ! তাকে আমি রেখে দিয়েছি একখানে, কোনো জায়গায়। জানতে চাও কোথায় ? বলবোই না আমি কাউকে, কাউকেই বলবো না !

৬

ফুলের কুঁড়ি মুখ নোয়ায় তাদের মায়াবী রহস্য লুকিয়ে রাখবে ব'লে। সন্ধের হাওয়া মৃদু কাঁপিয়ে যায় পাতা। আমি শুয়ে আছি চিৎ হ'য়ে, বাগানের ঘাসের ওপর। আমার সখী এসে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে :

'তুই আমাদের সবাইকেই ভুলে গিয়েছিস, না রে ?'

আমি বলি : 'না তো। আমি তো কাউকেই ভুলিনি।'

'তাহ'লে তুই কেন আর আমাদের সঙ্গে আসিস না ?'

'বারে-বারে একই জিনিশ দেখতে আমার ইচ্ছে করে না।'

'কেন ?' সখী আমাকে উঠিয়ে বসায়। আমার খোঁপা খুলে চুল মেলে দেয় সে, অলকের পর অলক, কুঞ্চনের পর কুঞ্চন, চুল মেলে দেয় আমার বুকের উপর। তারপর গভীর তাকায় আমার চোখে। আস্তে, খুব নিচু স্বরে, আমার দিকে কটাক্ষ ক'রে, শুধোয় : 'আমাকে তুই বলবি না তোর গোপন কথা ?'

আমি কিছু বলি না। আমার অজান্তেই আমার মুখ নুয়ে এসেছে বুকে। অনেকক্ষণ পরে, সে শুধোয় : 'ঐ চোর - কে সে ?'

আমি বলি : 'জানি না তো।'

সখী খিলখিল ক'রে হাসে : 'তার নাম ?'
'জানি না।'
'তার ধর্ম ?'
'জানি না।'
'কী করে সে ?'
'জানি না।'
'শ্‌শ্‌শ্‌...ভারি চালাক চোর হয়েছিস তুই !' আমাকে সে এই ব'লে ডাকে। আমি আবার কী চুরি করেছি ? আমি শুধু সত্যি কথাটি বলেছি।
'আমি কিছুই জানি না।'
'তোর এই আশ্চর্য গোপন কথাটি খুলে বল আমায়।'
'গোপন কথাটি !...আমি বলবোই না কাউকে, কাউকে না !'

৭

'পাপড়ি মেলে দিতে চলেছো যে-কুঁড়ি, বলো তো গোপন কথাটি কী ?'
'বলবো না কাউকে !'
'রাজকুমারী আমার ! গোপন কথাটি কী ?'
'বলবো না, এ-কথা বলিনি বুঝি !'
'আমার সসাগরা মধুরা ?...'
'প্রিয়তম...মানে...আমি...তুমি !'
'বলো। বলো পুরোপুরি।'
'ম্‌ম্‌...ম্‌ম্‌ ?'

৮

তুমি চ'লে যেতেই, মা শুধোলেন : 'কে ও ?' আমি বললুম : 'আমার...আমার বন্ধু।' উনি জানতে চাইলেন আমি যেন তোমার সকল কথা খুলে বলি। আমি বললুম : 'আমি যে কিছুই জানি না।' মা রাগে দাঁতে-দাঁত ঘষলেন। তাঁর চোখ থেকে অচেনা কিছু বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। গলার স্বর নামিয়ে, খুব নিচু স্বরে, মা জিগেশ করলেন, যেন সারা জগৎ শুনে ফেলবে, 'কে ও ?'
'আমার বন্ধু।'
'তোর সঙ্গে চেনা হ'লো কী ক'রে ?'
আমি কিছুই বলিনি। মা আমাকে বিছানায় পেড়ে ফেললেন। বন্ধ ক'রে দিলেন

দরজা, এমন আওয়াজ ক'রে যেন তার প্রতিধ্বনি উঠলো স্বর্গমর্তপাতালে। সেই ফুলের নেশাজাগানো সৌরভ ভ'রে দিলো আমার শোবার ঘর, আমার অন্তরের অন্তর তাতে যেন ঝকমক করতে লাগলো। কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে আমার চেনা হ'লো;...কাউকে আমি তা বলতে চাই না, কাউকে না। এই মধুর ব্যথা আমি কারু সঙ্গেই কখনও ভাগ ক'রে নেবো না।...কারণ,

যখন আমার ভাবনারা নীড়হারা পাখির মতো অন্তহীন আকাশে ঘুরে বেড়িয়েছিলো,

যখন আমার লক্ষ্যহারা দিনরাতগুলো এলোমেলো ভেসে যাচ্ছিলো আলোয়-অন্ধকারে,

যখন আমার সমস্ত কুমারীত্ব ছিলো কোনো গভীর অন্ধকারে কোনো নিঃশব্দ স্তবের মতো ;

আমি দেখতে পেয়েছিলুম—

দূরে, আলোর জানলার মধ্যে দিয়ে, তোমারই মুখ ...সেই মুহূর্তের দীপনে আমার অন্তরতম সত্তা গান ক'রে উঠেছিলো। সেই সকালে সূর্যের কোমল রশ্মিগুলো পড়েছিলো ফুলের ওপরকার শিশিরে আর বদ্‌লে দিয়েছিলো তাদের চুনিতে ঝকমক, রক্তলাল।

আর গান মুখে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো একলা এক পাখি, সাতসাগরের ওপর যে ঘুরে বেড়ায়। আর পাখি শুধু গান করে,

'কে গো তুমি, নিষ্কলুষ রতন,

'কে গো তুমি, সুন্দর তারকা,

'কে গো তুমি, লাবণ্যময় আলো,

'কে গো তুমি, শুভ উজ্জ্বলতা!...কে তুমি!'

৯

'আমি একা!' পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না যখন ঝ'রে পড়েছিলো আমার মুখের ওপর, তুমি আমার কানে-কানে বলেছিলে, 'আমার কোনো সাথী নেই।'

'আর আমি?'

'সে-এক সময় ছিলো, যখন তুমি ছিলে না। তখন আমি ছিলুম নিঃসঙ্গতার মহাতীরে।'

নিঃসঙ্গতার মহাতীর! সে যে আমারই প্রাণ, আমার গোটা অস্তিত্বটাই। সেই দিন যখন তুমি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছো আমি জিগেশ করেছিলুম: 'যখন তুমি চ'লে যাবে, তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে?'

'আমি কখনও ভুলি না। এখান থেকে যখন যাবো, চলো, আমরা দুজনে মিলেই চ'লে যাই। তুমি নিশ্চয়ই তৈরি, উৎসুক, প্রতীক্ষায় আছো···

'কবে যাবে ?'

'সময় হ'লেই আমি আসবো।'

'এখানে তুমি এলে কী ক'রে ?'

কামনার পেছনে-পেছনে।'

'কী কামনা ?'

'খুঁজতে-খুঁজতে...'

'কী ? কাকে ?'

'তোমাকেই...!'

'কোথায় খুঁজেছিলে তুমি ?'

'অযুত নয়নতারায়, নিযুত বুকের ভেতর, পথে-পথে, দেশে-দেশান্তরে...'

'আর—?'

'আলো যেখানে পৌছোয়নি সেই আদিম অরণ্যের মাঝখানে, মস্ত সব নগরীর বুকের মাঝখানে, দুয়ারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে যখন তাকিয়ে···'

'দাঁড়িয়ে যখন তাকিয়েছো ?'

'আমার প্রণয়সিন্ধু···আমার প্রিয়তমা···'

'আমার···প্রিয়তম···'

১০

গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে আমার। যখনই আমি আমার গানের মধুর সুরে তোমার সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্তটাকে ধরবার চেষ্টা করি, গান টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায় কেঁপে-কেঁপে। আমার সব চেষ্টা পরিণত হ'য়ে যায় গুনগুন ব্যথায়। আলোর পাশে ব'সে আমি যখন কিছু পড়ি, প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে আমি তোমাকে দেখতে পাই। হাত দিয়ে মুখে খাবার তুলতে গিয়ে থমকে যাই মাঝপথে, দেখতে পাই সকলখানেই ছড়িয়ে আছে তোমার চিহ্ন। আমার বুক ফেটে যায় তোমার চেতনায়। আমার দিনরাত্রির সব সূত্র ছিঁড়ে গিয়েছে। সব উধাও হ'য়ে গিয়েছে নীরব অশ্রুর অঝোর ধারায়। সেই স্ফটিকের গেলাশের মতো, আমার কাছ থেকে শেষবার যাতে তুমি জল নিয়েছিলে, সবকিছু ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গিয়েছে। সেই গেলাশ থেকে আর-কেউ জল খাবে না কোনোদিনও। অন্তহীন আমি গুনগুন করি তোমার নাম। আমার প্রতিটি নিশ্বাস তোমার নাম হ'য়ে ওঠে। আমি হয়তো তোমার কেউ নই। অথচ তবু, অথচ তবু,

আমি চাই তুমি মিনতি ক'রে বলো : 'প্রিয়তমা আমার, এসো...আমার প্রণয়ের সিন্ধু, এসো...' আমি চাই আবারও একবার আমাকে তুমি ডাকো। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারিনি আসন্ন বিচ্ছেদের তীব্রতা। এক চরম অজাগর অবস্থায় তুমি আমার কাছে এসেছিলে, আমায় ডাক দিয়েছিলে। আমি শুধু ফাঁকা কতগুলো কৈফিয়ৎ দিয়েছিলুম : 'আমার মা-বাবা। আমার ঘরবাড়ি। আমার এই নগর।'

'ঠিক কথা!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলে তুমি। 'হৃদয় আমার, আমি যাচ্ছি। আবার আসি আসবো।'

হেঁটে চ'লে গিয়েছিলে তুমি···আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম হতচকিত, বিহ্বল। আমার সখী এসে জিগেশ করেছিলো : 'কে চ'লে গেলো, অমন?'

'ওহ্!···কেউ না...এক পথিক...' সামলাতে না-পেরে, ভেতরে ছুটে এসে আমি আছড়ে পড়েছিলুম আমার বিছানায়। তখনও, আমি শুধু ভেবেছি যে তুমি ফিরে আসবে। আমাকে না-নিয়ে তুমি চ'লে যেতে পারলে কী ক'রে?···জানলা খুলে আমি বাইরে তাকিয়ে দেখেছিলুম। পথ প'ড়ে আছে পরিত্যক্ত। দিগন্ত অব্দি চ'লে গিয়েছে চাকার দাগ।···ক্লান্ত সূর্য সেই চাকার দাগের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে হলদে আলোর ধারা, সমুদ্রের গভীর-নীল ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে। যে-বিশাল কালো মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিলে সূর্যের রশ্মি তার ধারে-ধারে বানিয়ে দিয়েছে জরির আঁচল। আস্তে-আস্তে সমুদ্রেরই মতো শান্ত হ'য়ে গেলুম আমি, তলিয়ে গেলুম অন্ধকারে।

১১

আমার পুরো অস্তিত্বের একান্ত গভীরে, কোনো অনিশ্চিত আলোর ফোঁটার মতো, আমি দেখতে পেলুম—তোমার স্মৃতি!···শুধু তোমার।

ভয় ছিলো সেও বুঝি সময়ের অবিশ্রাম গতির ভেতর একেবারে মুছে যাবে। সর্বব্যাপী তমসার ভিতরে কোনো তীক্ষ্ণ হিম দীর্ঘশ্বাসের মতো···এক বাষ্পময় ধোঁয়া আমার হৃদয় ঢেকে ফেলেছে। অবিশ্রাম ব'য়ে যাচ্ছে ভয়াবহ ঘূর্ণিতুফান। কেঁপে উঠছে মাটি পৃথিবী। থরথর কেঁপে ভেঙে পড়ছে পাহাড়-পর্বত। আকাশ চাটছে লেলিহান আগুন। সবকিছু পুড়ে ভস্মীভূত। বিশাল এই তমসায় ছোট্ট কোনো তুষারগোলার মতো, আলো··· অবশেষে তা হ'য়ে উঠেছে এক সর্ববিসারী, সহৃদয় দীপ্তি...শুধু এটাই আছে এখন... মাটিপৃথিবী এখন বিশাল এক বালির আস্তরের ওপর বালির আস্তর, যেমন থাকে ফুলের পাপড়ি। তুমি পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলে সেই আলোর দিকে। আমি তলিয়ে যাচ্ছিলুম। অসীম দূরের মধ্যে আমার চোখ দুটি অনুসরণ করে তোমার পদক্ষেপ। আমার চেতনা খ'সে যাচ্ছে ক্রমেই। সেই একান্ত উপস্থিতির মধ্যে তুমি উধাও হ'য়ে গেলে কোনো

ছায়ার মতো। আচমকা, সৃষ্টির প্রতিধ্বনির মতো, এক স্বর গুনগুন ক'রে উঠলো :

'তুমি এলে না কেন, মধুরা ?'

'প্রিয়তম !'

আমি চমকে জেগে উঠলুম। খোলা জানলা দিয়ে, অন্ধকার আকাশ থেকে, উজ্জ্বল দুটি তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে !

১২

সাগ্রহে আমি অপেক্ষা ক'রে থাকি, কবে তুমি আসবে। প্রতিদিন, প্রতিপল। উষা থেকে রাত্রির আগমন অব্দি আমি নিজেকে সাজিয়ে রাখি রূপসী। প্রতিদিন রেশমি শাদা বিছানায় ছড়ানো থাকে নতুন-নতুন ফুল। তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সব-সময় প্রস্তুত থাকে নেশাধরানো এক সৌরভ। সন্ধেবেলায় সমুদ্রতীরের ভিড়ের মধ্যে তোমারই খোঁজে প্রতিটি মুখের দিকে আমি তাকাই। আমার দরজার কাছে এগিয়ে আসে পায়ের শব্দ, তারপর, না-থেমেই মিলিয়ে যায়। সারা জগৎ যখন ঘুমোয় আমি জেগে-জেগে কান পেতে শুনি। এইভাবে আমার পাশ কাটিয়ে চ'লে যায় দিন আর রাত। যখন দিন শেষ হ'য়ে যায়, ভয়ে মনে হয় বুঝি আমার জীবনেরও শেষ এলো। যখন পাশের বাড়িগুলো বাতি জ্বালে, আর সে-সব বাড়ির ভেতর দেখি প্রণয়ের লীলা, আমার ঘর থাকে অন্ধকার, মলিন, আচ্ছন্ন। এই জীবনের বোঝা আমার আর সহ্য হয় না। আমি যেন ধুলো, নানা তার রং, নানা বিচিত্র তার মনের ভাব। এই ধুলো যে শেষে এমন রূপ নেবে, যা আমি,আর বেঁচে থাকবে,তা আমার জানা ছিলো না ! এই চূর্ণ-করা নিঃসঙ্গতার মহাতীর থেকে যে ক'রেই হোক আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। চিরকালের মতো। হে পর্জন্যদেব ! তোমার প্রচণ্ড গর্জনে আমাকে ধ্বংস ক'রে ফ্যালো !···বিদ্যুৎ ! তোমার তীক্ষ্ণ আলোয় দু-টুকরো ক'রে খুলে দাও আমায় !...আমি শেষ হ'য়ে গেছি। চেতনার ওপর আমার যা দখল ছিলো, সব আমি হারিয়ে যেতে দিচ্ছি।

এই হিম জ্যোৎস্নার ধবলিমায়, এই সৌরভের মূর্ছনায় যা আমার শেষ নিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেয়,

প্রিয়তম ! আমি কি···একবার···তোমার উপস্থিতিকে চুম্বন করতে পাবো !

# ভুবনবিখ্যাত নাসিকা 

তাক লাগিয়ে দেবার মতো একটা খবর। সেই নাকটা নাকি বুদ্ধিজীবীদের কাছে একটা মস্ত বাদবিতণ্ডার বিষয় হ'য়ে উঠেছে।

এখানে আমি নাকটার আসল কাহিনী বলছি।

গল্প যখন শুরু হ'লো, ভুবনবিখ্যাত সেই নাসিকার অধিকারী, ততদিনে জীবনের চব্বিশটি বৎসর সাঙ্গ করেছেন। তার আগে তাঁকে কেউ চিনতোই না। তবে কি কারু জীবনে চব্বিশতম বৎসরের কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে? কে জানে? যদি কেউ বিশ্বইতিহাসের পাতা উলটে যায়, তবে দেখতে পাবে যে অনেকেরই জীবনে চব্বিশ বৎসর বয়েস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো। ইতিহাসের ছাত্রদের নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি-কিছু বলবার নেই।

আমাদের এই কাহিনীর নায়ক এক বাবুর্চি—পছন্দ হ'লে তাঁকে রসুইঘরের কারিগরও বলা যায়। তাঁর যে খুব-একটা বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, এমন নয়। লিখতে-পড়তে জানেন না। তাঁর সারা জগৎটাই রসুই ঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রান্নাঘরের বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি উদাসীন। কী দরকার বাইরের সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার? পেট পুরে তৃপ্তির চোয়া ঢেকুর তুলে তিনি খেতে পারেন; যত ইচ্ছে নস্যি নিতে পারেন নাকে; ঘুমোতে পারেন; কাজ করতে পারেন—করেন; বাস, তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচি শুধু এতেই সীমাবদ্ধ।

বৎসরে কত মাস, সব ক-টার নাম কী, তা তিনি জানেন না। যখন তাঁর মাইনে পাবার কথা, তাঁর মা এসে সেটা নিয়ে যান। যদি তাঁর নস্যি দরকার হয়, মা নিজেই তা কিনে দেন। দিব্যি ছিলেন তিনি, তুষ্ট, হৃষ্ট, সকল বিষয়ে নির্বিকার—যতদিন-না তাঁর জীবনে চব্বিশতম বছরটি এলো। তারপরে আচমকা একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো!

তাঁর নাকটা লম্বায় একটু বেড়ে গেলো। মুখ পেরিয়ে গিয়ে থুৎনি অব্দি গিয়ে পৌছে গেলো।

রোজ তাঁর নাক একটু-একটু ক'রে বাড়তে লাগলো। সে কি আর লোকের চোখ থেকে লুকিয়ে-রাখা সম্ভব ছিলো? এক মাসের মধ্যে তার নাক গিয়ে পৌছুলো তাঁর

মাভিক্ষুগুলি! তাতে কি তাঁর কোনো অস্বস্তি হচ্ছিলো? কোনো অসুবিধে? মোটেই না! দিব্যি শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারেন। তাহ'লে আর এমনকী অসুবিধে হচ্ছিলো যার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হবে?

অথচ, এই নাকের জন্যেই, বাবুর্চি বেচারাকে কাজ থেকে বরখাস্ত হ'তে হ'লো।

তার কী কারণ হ'তে পারে?

কোনো দল এই রণং দেহি জিগির তুলে এগিয়ে এলো না: 'ছাঁটাই মজুরকে কাজে বাহাল করতে হবে!' রাজনৈতিক দলগুলো সবাই এই হৃদ্দ অবিচারটার দিকে চোখ বুজেই রইলো।

'কেন এঁকে বরখাস্ত হ'তে হ'লো?' মানবতার কোনো প্রেমিকই এই জিজ্ঞাসাটা নিয়ে এগিয়ে এলো না।

বেচারা বাবুর্চি!

কেন যে তিনি তাঁর চাকরি খুইয়েছেন, সেটা কাউকে আর তাঁকে গিয়ে ব'লে দিতে হ'লো না। যে-বাড়িতে তিনি ছিলেন, সেখানকার লোকজনেরা কেউ তাঁর এই নাকের জন্যে আর শান্তি পাচ্ছিলো না। না শান্তি-স্বস্তি, না-বা কোনো শান্ত নির্বিরোধ জীবন। দিনরাত্রি বাইরে থেকে লোকজন ভিড় ক'রে আসছিলো এই লম্বা নাক আর তার মালিককে দেখতে। ফোটোগ্রাফাররা এসে নাছোড়বান্দার মতো উত্ত্যক্ত করছিলো। সাংবাদিকরা হ'য়ে উঠেছিলো ডাহা উপদ্রব। বাড়ি থেকে বেশকিছু জিনিশ চুরি হ'য়ে গিয়েছিলো।

বরখাস্ত বাবুর্চি যখন তাঁর ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে এসে উপোস ক'রে মরতে বসেছেন, তিনি অন্তত একটা বিষয়ে নিশ্চিত হ'য়ে গিয়েছেন: তাঁর এই নাসিকা এক মস্ত হুজুগ হ'য়ে উঠেছে! খবর পৌঁছেছে, দিকে-দিকে!

দূর-দূর দেশ থেকে লোকে তাকে দেখতে আসছিলো। তাঁর এই লম্বা নাক দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছিলো বিস্ময়ে। কেউ-কেউ আবার ছুঁয়েও দেখেছিলো। কেউ কিন্তু জিগেশ করেনি: 'আজ আপনি কিছু খেয়েছেন? আপনাকে অমন শুকনো আর দুর্বল দেখাচ্ছে কেন?' কুঁড়েঘরে কোনো পয়সা নেই, এমনকী ছোট্ট একটা নস্যির মোড়ক কেনারও পয়সা নেই। ইনি কি কোনো দুর্দান্ত বুনো জানোয়ার নাকি যে এঁকে উপোস করিয়ে রাখা হবে? ইনি বোকা হ'তে পারেন, তবে মানুষ তো বটেন। একদিন তিনি তাঁর বুড়িমাকে ডেকে বললেন: 'এই নচ্ছার লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও তো!'

মা অমনি সবাইকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

সেদিন থেকেই মা ও ছেলের দিকে মুখ তুলে চাইলো সৌভাগ্য। ছেলের নাক

দেখবার জন্যে লোকে মাকে ঘুষ দিতে শুরু করলে। কয়েকজন ন্যায়-নীতির ধ্বজাধারী অবশ্য এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে। কিন্তু সরকার থেকে এ-বিষয়ে কোনোই উচ্চবাচ্য করা হ'লো না। অনেকে অবিশ্যি সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ স্বরূপ নানা বিপ্লবী পার্টিতে নাম লেখালে : এই সরকারকে উচ্ছেদ করতেই হবে!

দীর্ঘনাসার উপার্জন কিন্তু এদিকে দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে। বেশি কথা কী? ছ-বছরেই গরিব বাবুর্চি একজন ক্রোরপতি হ'য়ে উঠেছেন।

তিন-তিনবার সিনেমায় অভিনয় করেছেন। যখন টেকনিকালার চলচ্চিত্র 'মানুষী ডুবোজাহাজ' বেরুলো, কাতারে-কাতারে লেখক তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে সিনেমা হলে গিয়ে ভিড় করলে! দীর্ঘনাসার সব সদ্‌গুণ নিয়ে ছ-ছজন কবি ফেঁদে বসলো মহাকাব্য! ন-জন নামজাদা লেখক দীর্ঘনাসার জীবনী লিখে প্রচুর নাম ও পয়সা কামালে!

তাঁর রাজপ্রাসাদ হ'য়ে উঠলো সকলের কাছেই উন্মুক্ত এক অতিথিশালা। যে-কেউ যে-কোনো সময়ে সেখানে গিয়ে পেট পুরে ভোজন করতে পারে, সঙ্গে ফাউ পেতে পারে একটিপ নস্যি।

তাঁর দুজন সচিবও আছে। দুই সুন্দরী, সর্বগুণসম্পন্না তরুণী। দুজনেই দীর্ঘনাসাকে ভালোবাসে। দুজনেই দীর্ঘনাসার পূজার্চনা করে। যখন দু-দুজন সুন্দরী তরুণী এক সঙ্গে একজন পুরুষকে ভালোবাসে, তখন সেখানে যে গোল বাধবে, এ তো জানা কথাই। দীর্ঘনাসার জীবনেও হৈ-হৈ ক'রে গোল বেঁধে গেলো।

অন্যরাও দীর্ঘনাসাকে ভালোবাসতো। নাভিকুণ্ডলি অব্দি যে-নাকটা নেমে এসেছে, এটাকে মহত্ত্বেরই একটা চিহ্ন ব'লে গণ্য করা হ'লো। যাবতীয় বড়ো-বড়ো জাগতিক ব্যাপারে দীর্ঘনাসা তাঁর অভিমত দিতে লাগলেন। খবরকাগজগুলো তাঁর সব বয়ান ছাপে :

'ঘণ্টায় দশহাজার মাইল বেগে যেতে পারে, এ-রকম একটি উড়োজাহাজ সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ-বিষয়ে দীর্ঘনাসা মন্তব্য করেছেন যে…'

'ডাক্তার বুগুরোস ফুরাসিবুরোস সেদিন এক মৃতের পুনর্জীবন দিয়েছেন। দীর্ঘনাসা তাঁর ভাষণে এ-বিষয়ে বলেছেন যে…'

যখন লোকে শুনতে পেলে জগতের উচ্চতম গিরিশিখরে মানুষের পদস্পর্শ পড়েছে, তখন তারা জিগেশ করলে : 'দীর্ঘনাসা এ-বিষয়ে কী বলেন?'

দীর্ঘনাসা যদি কোনো ঘটনা সম্বন্ধে কিছু না-বলেন…ধুর, সে নিশ্চয়ই তুচ্ছ এলেবেলে ব্যাপার। অতএব তাই সবাই ধ'রে নিলে যে দীর্ঘনাসা সব বিষয়েই তাঁর নাক গলিয়ে কিছু-না-কিছু বলবেন! চিত্রশিল্প, ঘড়ির ব্যাবসা, সম্মোহনবিদ্যা ফোটোগ্রাফি, আত্মা, প্রকাশনাসংস্থা, উপন্যাস রচনাপদ্ধতি, মৃত্যুর পরে জীবন, খবরকাগজের আচরণ, শিকার

ও মৃগয়া···সব।

ঠিক এ-রকম সময়েই দীর্ঘনাসাকে গুম করার ষড়যন্ত্র শুরু হ'লো। কোনোকিছু জোর ক'রে দখল ক'রে নেয়া, অপহরণ করা—এ-কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বিশ্বইতিহাসের বেশির ভাগ অংশই দখল ও হরণের কাহিনীতেই ভরপুর।

কিন্তু এঁকে দখল করার ব্যাপারটা কী? ধরুন, কোনো পোড়োজমিতে আপনি নারকোল গাছের চারা লাগিয়েছেন। নিয়মিত জল দিয়েছেন, সার দিয়েছেন, তদারক করেছেন। চারপাশে বেড়াও তুলেছেন। আশায়-আশায় বছরগুলো কেটে গেলো, গাছগুলোয় নারকোল ধরতে শুরু হ'লো। গাছ থেকে সগর্বে ঝুলতে লাগলো নারকোলের গুচ্ছ। আর ঠিক তখন কেউ এসে এই নারকোলবাগান আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলো।

এক্ষেত্রে, প্রথমে স্বয়ং সরকারই দীর্ঘনাসাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করলে। তারা একটা ধাপ্পা দিয়ে তাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করলে গোড়ায়। তারা তাঁকে 'দীর্ঘনাসা প্রধান' এই খেতাব দিলে—সঙ্গে একটা পদক। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নিজে দীর্ঘনাসার গলায় মণি-খচিত স্বর্ণপদকটি পরিয়ে দিলেন। তারপর, দীর্ঘনাসার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে, রাষ্ট্রপতি তাঁর নাকের ডগাটা একটু টিপে দিলেন। নিউজরীলের ক্যামেরাম্যানেরা হুড়মুড় ক'রে তার ছবি তুললো, সব সিনেমা হলে সে-ছবি চাক পিটিয়ে দেখানোও হ'লো।

ততক্ষণে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোও সোৎসাহে এগিয়ে এসেছে। জনতার সংগ্রামে কমরেড দীর্ঘনাসাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে! ছোঃ, ইনি আবার কমরেড দীর্ঘনাসা! কার কমরেড, শুনি? কীসে কমরেড? হায়, বেচারা দীর্ঘনাসা!

দীর্ঘনাসাকে পার্টিতে যোগ দিতেই হবে! কোন দল? কোন পার্টি? চারপাশে পার্টি তো কতই আছে! দীর্ঘনাসা কী ক'রে একই সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন দলে যোগ দেবেন?

দীর্ঘনাসা নিজের মুখে তখন বললেন: 'আমি কেন কোনো দলে কিংবা অনেক দলে যোগ দেবো! উঃফ, কী যে হয়রানি!'

তখন সচিবদের একজন বললে: 'কমরেড দীর্ঘনাসা যদি আমাকে পছন্দ করেন, তাহ'লে আমার দলেই তাঁর যোগ দেয়া উচিত!'

দীর্ঘনাসা এ-বিষয়ে টুঁ শব্দটি করলেন না।

'কোনো দলে যোগ দেয়া কি ঠিক হবে আমার?' অন্য সচিবকে জিগেশ করলেন দীর্ঘনাসা। তিনি কী বলতে চাচ্ছেন, অন্য সচিব তা দিব্যি বুঝতে পারলে। সে বললে: 'না, কেনই বা যোগ দেবেন?'

ততক্ষণে একটা রাজনৈতিক দল এই জিগির তুলে, দিয়েছে: 'আমাদের দল দীর্ঘনাসার দল, দীর্ঘনাসার দল জনগণের দল!'

অন্যসব দলের লোকেরা এ শুনে তেলে-বেগুন জ'লে উঠলো। তারা সচিবদের এক সচিবকে পাকড়ে, তাকে দিয়ে দীর্ঘনাসার বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী বহ্নিবর্ষী বিবৃতি দেয়ালে: 'দীর্ঘনাসা জনগণকে প্রতারিত করেছে! এতদিন সে সবাইকে ধাপ্পা দিয়ে আসছিলো। এই জোচ্চুরিতে আমাকেও সে শরিক করেছিলো। এখন জনগণের কাছে আমি সত্য কথাটি ফাঁস ক'রে দিচ্ছি: ঐ লম্বা নাক রবারে তৈরি!'

অ্যা! সব খবরকাগজই একেবারে পয়লা পাতায় পাতায় খবরটা জাঁকিয়ে ছাপালে। দীর্ঘনাসার দীর্ঘনাক রবার নির্মিত!

লোকে কি আর তারপর শান্ত থাকে? তাদের বুঝি কোনো রাগ হয় না? বুজরুক, ফেরেব্বাজ, জোচ্চর! জগতের সবখান থেকে আসতে লাগলো টেলিগ্রাম, টেলিফোন, চিঠি! রাষ্ট্রপতির শান্তি-স্বস্তিতে ইতি পড়লো! 'দীর্ঘনাসার রবার নাসা—বিনাশ করো, বিনাশ করো! দীর্ঘনাসার বুজরুক দল—যাক রসাতল, যাক রসাতল! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

দীর্ঘনাসা-বিরোধী দল যখন এই বিবৃতি ছাপালে, তার বিরুদ্ধ দল আবার অন্য সচিবকে দিয়ে একটা প্রতিবিবৃতি দেয়ালে: 'প্রিয় দেশবাসীগণ! নাগরিক বন্ধুরা! সচিব শ্রীমতী অমুক যা বলেছেন তা ডাহা মিথ্যেকথা! কমরেড দীর্ঘনাসা তার প্রণয়াসক্ত নন ব'লে তিনি এইভাবে শোধ তুলতে চাচ্ছেন! তিনি চেয়েছিলেন তিনি একই দীর্ঘনাসার খ্যাতিপ্রতিপত্তি ধনসম্পদ আত্মসাৎ করবেন। তাঁর নিজের ভাইদের একজন বিরোধী দলে রয়েছেন। অন্য দলটির প্রকৃত রং কি তা আমাকে খুলে দেখতে দিন। আমিই কমরেড দীর্ঘনাসার বিশ্বস্ত সচিব। আমি হলফ ক'রে এই তথ্যটা বলতে পারি যে কমরেডের ঐ দীর্ঘনাসা মোটেই রবারে তৈরি নয়। আমার বুক যে ভাবে ধুকপুক করছে, এই নাক তারই মতো সত্যি। এই সংকটের মুহূর্তে কমরেড দীর্ঘনাসাকে যাঁরা সমর্থন জানাচ্ছেন, তাঁদের সংগঠন দীর্ঘজীবী হোক! জনগণের মুক্তি ও প্রগতি ভিন্ন তাঁদের আর অন্য লক্ষ্য নেই। ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

কী হবে তাহ'লে? লোকের মনে সংশয়, দ্বিধা, দোলাচল। দীর্ঘনাসা-বিরোধী দলের নেতারা রাষ্ট্রপতি ও সরকারের দোষ ধরতে লাগলো: 'হাঁদা এক সরকার! ওরা এক ধাপ্পাবাজকে এক বুজরুককে "দীর্ঘনাসাপ্রধান" খেতাব দিয়েছে! দিয়েছে একটা জহরৎ বসানো স্বর্ণপদক! রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই ফেরেব্বাজির হোতা। এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে! রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চাই। পুরো সরকারের ইস্তফা দেয়া উচিত! দীর্ঘনাসাকে খতম করো! দীর্ঘনাসা মুর্দাবাদ!'

রাষ্ট্রপতি তাতে বিষম চ'টে গেলেন। একদিন সকালে সেনাবাহিনী সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক

নিয়ে এসে বেচারা দীর্ঘনাসার বাড়ি ঘিরে ধরলো। দীর্ঘনাসাকে গ্রেফতার ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

কিছুদিন আর দীর্ঘনাসার কোনো খোঁজখবর হালহকীকৎ পাওয়া গেলো না। লোকে তাঁর অস্তিত্বের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছে! তারপরেই এলো পরমাণু বোমা ফাটবার মতো একটা টাটকা খবর! কী হ'লো, জানেন? ঠিক যখন লোকে সব কথা ভুলে বসেছে, তখনই রাষ্ট্রপতির ছোট্ট ঘোষণাটি এলো: 'আগামী ৯ই মার্চ "দীর্ঘনাসা-প্রধানে"র বিচার সভা বসবে। পৃথিবীর ৪৮টি দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রতিনিধি হিশেবে এসে তাকে পরীক্ষা করবেন। জগতের সব সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতারা প্রতিনিধি হিশেবে আসবেন। বিচারসভার ক্রিয়াকলাপের ছায়াছবি তোলা হবে যাতে পৃথিবীর সকলে তার বায়োস্কোপ দেখতে পারে। জনগণকে শান্ত থাকতে বলা হচ্ছে।'

জনগণ তো জনগণই। তারা মোটেই শান্ত রইলো না। তারা দলে-দলে লট-বহর নিয়ে এলো রাজধানীতে। তারা হামলা করলে হোটেলে-হোটেলে। তারা পুড়িয়ে দিলে ট্রাম বাস। তারা আগুন ধরালে থানায়-কোতোয়ালিতে। তারা ধ্বংস করলে সরকারি সব ভবন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলো। দীর্ঘনাসার জন্যে প্রাণ দিয়ে বহু নরনারী শহিদ হ'য়ে গেলো।

৯ মার্চ, সকাল এগারোটা। রাষ্ট্রপতিভবনের সামনেটায় এক বিশাল জনসমুদ্র, লাউডস্পিকার চ্যাচাচ্ছে: 'আপনারা ধৈর্য ধরুন! শৃঙ্খলাভঙ্গ করবেন না। পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে!'

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার উপস্থিতিতে ডাক্তারেরা ঘিরে ধরেছেন দীর্ঘনাসাকে। একজন ডাক্তার দীর্ঘনাসার নাসারন্ধ্রগুলি আটকে দিলেন; অমনি সে এক বিশাল হা ক'রে বসলো। আরেকজন ডাক্তার একটা ছুঁচ নিয়ে তার নাকের ডগায় বিঁধিয়ে দিলেন। তাঁকে চমকে দিয়ে নাকের ডগায় রক্তের ফোঁটা বেরিয়ে এলো।

ডাক্তাররা তাঁদের অবিসংবাদিত রায় দিলেন: 'এ-নাক রবারে তৈরি নয়। এ একেবারে খাঁটি জিনিশ, আসল মাল।'

তরুণী সচিবদের একজন দীর্ঘনাসার নাকের ডগায় চুমু খেলে।

'কমরেড দীর্ঘনাসা জিন্দাবাদ! দীর্ঘনাসাপ্রধান জিন্দাবাদ! দীর্ঘনাসাসার অগ্রসর জনতাদল জিন্দাবাদ!'

এইসব জিগির ও হুল্লোড় যখন থামলো, রাষ্ট্রপতি আরো-একখানি চমক ছাড়লেন। তিনি দীর্ঘনাসাকে রাজ্যসভার সদস্য ক'রে দিলেন। আর এইভাবেই ঘটনাটার নিষ্পত্তি হ'লো।

কিন্তু দীর্ঘনাসা যে-সব দলের সদস্য নন তারা একজোট হ'য়ে একটা যুক্তফ্রন্ট গড়লে, বললে : 'মন্ত্রিসভার ইস্তফা দেয়া উচিত। এ নিছকই একটা ধাপ্পা—জনগণকে ঠকানো হচ্ছে। এ আসলে রবারেরই নাক!

দেখুন কী ভাবে মিথ্যা আর বুজরুকি পার পেয়ে যায়, চিরকাল বেঁচে থাকে! চিন্তার কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না? কোনো দ্বিমত? বেচারা বুদ্ধিজীবীরা না-হ'লে করবেটা কী?

# লোকটা

ধরুন আপনার কোনো নির্দিষ্ট কাজ নেই। আপনি বাড়ি থেকে অনেক দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনার সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই নেই ; আপনি স্থানীয় ভাষাটাও জানেন না। আপনি ইংরেজি বা হিন্দুস্তানি বলতে পারেন, কিন্তু এ-অঞ্চলের খুব কম লোকই এ-দুটি ভাষা জানে। এমতাবস্থায় আপনি বহুবিধ সংকটে প'ড়ে যাবেন, এবং বহুবিধ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে আপনার।

আপনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে। হয়তো একেবারেই অচেনা কেউ এসে আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। এমনকী, অনেক বছর কেটে যাবার পরও, মাঝে-মাঝে আপনার মনে পড়ে যাবে লোকটাকে···কেন সে আপনাকে বাঁচিয়েছিলো ?

ধরুন, যার কথা বলছি, সে আপনি নন, আমিই, এখনও যার লোকটাকে স্পষ্ট মনে আছে। আমারই জীবনে একবার যে-অভিজ্ঞতা ঘটেছিলো, আমি তারই বিবরণ দিতে চাচ্ছি। মানুষ সম্বন্ধে আমার খানিকটা ধারণা আছে, এমনকী নিজের সম্বন্ধেও আছে। আমাকে ঘিরে আছে ভালো লোক, চোর-বাঁটপাড়, নানা ধরনের রুগী যাদের আছে সংক্রামক রোগ কিংবা যাদের কারু-কারু মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছে, এমন অবস্থায় কাউকে খুব সজাগ ও সাবধানে থাকতে হয়। পৃথিবীতে ভালোর চেয়ে মন্দেরই আধিক্য। সেটা আমরা টের পাই চোট লাগলে পর।

ঘটনাটা না-হয় সোজাসুজি ব'লেই ফেলা যাক, যদিও আপনার মনে হ'তে পারে ঘটনাটা নেহাৎই তুচ্ছ।

পাহাড়ের ঢালে বসানো এক মস্ত শহর, বাড়ি থেকে প্রায় পনেরোশো মাইল দূরে। এখানকার বাসিন্দারা ক্ষমা বা দয়া কাকে বলে তা কোনোদিনও জানেনি। লোকগুলো ভারি ক্রূর ও নিষ্ঠুর। খুন, জখম, রাহাজানি, ছিনতাই, পিকপকেট—এ-সব তো নিত্য ঘটনা। ঐতিহ্য অনুযায়ী এরা নাকি সবাই ক্ষত্রিয়—পেশাদার সৈনিক। এদের কেউ-কেউ গেছে দূর-দূর দেশে, আর সুদের ব্যাবসা ফেঁদে বসেছে। অন্য অনেকে বড়ো-বড়ো শহরে ব্যাঙ্ক, কারখানা বা বিশাল সব ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানে দারোয়ান ও পাহারার কাজ নিয়েছে। টাকা এদের কাছে পরম কোনো বস্তু। টাকার জন্যে তারা করতে না-পারে হেন কাজ নেই, এমনকী খুনটুনও।

এই শহরেরই একটা নোংরা রাস্তায় একটা অতিক্ষুদ্র, নোংরা ঘরে আমি থাকতুম। আমার একটা জীবিকা ছিলো সেখানে : কিছু দেশান্তরী মজুরকে ইংরাজি শেখানো, সাড়ে নটা থেকে রাত এগারোটা অব্দি। আমি তাদের ইংরেজিতে ঠিকানা লিখতে শেখাতুম। ইংরেজিতে ঠিকানা লিখতে জানাটা সেখানে মস্ত দিগগজ পণ্ডিতের কাজ ব'লে গণ্য হ'তো। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ডাকঘরে ব'সে-ব'সে কিছু লোক ঠিকানা লিখে দেয়। একটা ঠিকানা লিখে দেবার জন্যে তারা পায় এক আনা থেকে চার আনা—যখন যা জোটে।

আমি লোকদের ঠিকানা লিখতে শেখাতুম যাতে আমাকে গিয়ে ডাকঘরে ওভাবে ব'সে থাকতে না-হয়, আর এ থেকে কিছু বাঁচানো যায় কি না সেটা দেখাও আমার উদ্দেশ্য ছিলো।

তখন আমি সারাদিন প'ড়ে-প'ড়ে ঘুম লাগাতুম, জেগে উঠতুম বিকেল চারটেয়। তাতে সকালবেলার চা আর দুপুরবেলার খাবার খাওয়ার খরচটা বাঁচানো যেতো।

একদিন আমি যথারীতি বিকেল চারটেয় ঘুম থেকে উঠেছি। নিত্যকর্ম সেরে তারপর আমি এক পেয়ালা চা ও খাবারের খোঁজে আমার আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আপনাদের জানা উচিত যে আমার পরনে ছিল স্যুট, আমার কোটের পকেটে ছিলো আমার ওয়ালেট। তাতে ছিলো চোদ্দটা টাকা—সেই মুহূর্তে আমার সারা জীবনের সঞ্চয়, যথাসর্বস্ব।

আমি একটা ভিড়ে-ভরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলুম। চাপাটি আর মাংস দিয়ে তোফা একটা খানা পাওয়া গেলো তার ওপর আবার চাও খেলুম। বিল এলো একুনে এগারো আনা।

দাম দেবার জন্যে আমি কোটের পকেটে হাত ঢোকালুম। মহূর্তে আমি ঘেমে নেয়ে উঠলুম, যা খেয়েছিলুম সব নিমেষে হজম হ'য়ে গেলো। তার কারণ—কোটের পকেটে আমার ওয়ালেটটা নেই।

আমি বললুম : 'কেউ নিশ্চয়ই আমার পকেট মেরেছে—আমার মানিব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে!

রেস্তোরাঁটা সব সময়েই দারুণ ব্যস্ত থাকে। মালিক চারপাশের সবাইকে চমকে দিয়ে হা-হা-হা ক'রে অট্টহাস্য জুড়ে দিলে। আমার কোটের কলার ধ'রে আমাকে পাকড়ে, সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে, বললে : 'ও-সব চালাকি এখানে চলবে না! পয়সা ফ্যালো, তারপর কেটে পড়ো···নইলে তোমার চোখ দুটোই আমি উপড়ে ফেলবো।'

আমি চারপাশের সব লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। একটাও সদয় মুখ দেখা গেলো না। খিদেয় হন্যে নেকড়ের মতো দেখতে সব ক-টাকে।

ও যদি আমার চোখ দুটো খুবলে উপড়ে ফেলতে চায়, তবে সে চোখ দুটো খুবলেই উপড়ে ফেলবে!

আমি বললুম: 'আমার কোটটা না-হয় এখানে থাকুক—আমি গিয়ে পয়সা নিয়ে আসছি।'

রেস্তোরাঁওলা আবার হা-হা হেসে অস্থির।

সে আমায় কোটটা খুলে ফেলতে বললে।

আমি কোটটা খুলে নিলুম।

সে আমার গায়ের শার্টটা খুলতে বললে।

আমি আমার শার্ট খুললুম।

সে আমার পায়ের জুতোজোড়া খুলে ফেলতে বললে।

আমি দু-পাটি জুতোই খুলে ফেললুম।

শেষে সে আমার পরনের ট্রাউসারও খুলে ফেলতে বললে।

তাহ'লে সিদ্ধান্তটা এটাই হয়েছে যে আমাকে ন্যাংটো ক'রে ফেলে, চোখ দুটো খুবলে উপড়ে নিয়ে, দিগম্বর অবস্থায় রাস্তায় বার ক'রে দেয়া হবে।

আমি বললুম: 'ট্রাউসারের তলায় কিছু নেই আমার!'

সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

রেস্তোরাঁওলা বললে: 'উঁহু, আমার তা বিশ্বাস হয় না। ট্রাউসারের তলায় কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে।'

জনপঞ্চাশ লোক সমস্বরে বললে: 'তলায় নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

আমার হাত কিছুতেই আর নড়তে চাইলো না। কল্পনায় আমি দেখতে পেলুম, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক দিগম্বর, চক্ষুহীন। এইভাবেই তবে জীবনটা শেষ হবে। হোক...আর, শুধু এরই জন্যে, আমি···যাক গে...হে বিশ্বস্রষ্টা, আমার ঈশ্বর... আমার কিছুই আর তোমাকে বলবার নেই! সবকিছুই শেষ হ'য়ে যাবে···সব শেষ হবে সকলের ফুর্তির জন্যে...

একটা-একটা ক'রে আমার ট্রাউসারের বোতাম খুলতে শুরু ক'রে দিলুম। আর ঠিক তখন কার গলা কানে পৌঁছুলো: 'থামো! আমি পয়সা দিচ্ছি!'

গলার স্বর যে দিক থেকে এসেছে সেদিকে সকলেই ফিরে তাকালে।

ছ-ফিট লম্বা ফরশা একজন লোক, পরনে শাদা ট্রাউসার, মাথায় লাল পাগড়ি, ঝোলা গোঁফ, নীল চোখ।

এখানে অনেকেরই নীল চোখ আছে। সে এগিয়ে এসে রেস্তোরাঁওলাকে শুধোলে: 'পাওনা কত বলেছিলে?'

'এগারো আনা।'

এগারো আনা দিয়ে দিলে সে, আমার দিকে ফিরে বললে: 'পোশাক প'রে নাও।' আমি পোশাক প'রে নিলুম।

'এসো,' আমায় সে ডাকলে। আমি তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলুম। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা কি আমার আছে? আমি তাকে বললুম: 'বড়ো ভালো কাজ করেছেন আপনি। আপনার চেয়ে ভালো কোনো লোক আমার চোখে পড়েনি কখনও।'

সে হেসে উঠলো। 'কী নাম তোমার?' সে জিগেশ করলে। আমি তাকে নাম বললুম, বললুম আমি কোত্থেকে এসেছি। তারপর আমি তাকে তার নাম জিগেশ করলুম। সে বললে: 'আমার কোনো নাম নেই।'

আমি বললুল: 'তাহ'লে···দয়া, আপনার নাম নিশ্চয়ই দয়া।'

সে না-হেসে হনহন ক'রে হেঁটে চললো। আমরা একটা ফাঁকা সাঁকোর ওপর এসে এসে পৌঁছলুম। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো: না, আশ-পাশে কেউ নেই। 'শোনো, তোমায় কিন্তু পেছন ফিরে না-তাকিয়েই চ'লে যেতে হবে। যদি কেউ জিগেশ করে তুমি আমার কখনও দেখেছিলে কি না, তবে তোমাকে কিন্তু না বলতে হবে।'

আমি বুঝতে পারলুম।

সে তার বিভিন্ন পকেট থেকে গোটা পাঁচেক ওয়ালেট বার ক'রে আনলে। পাঁচটা ওয়ালেট!···তার মধ্যে একটা আমার। 'এর মধ্যে তোমার কোনটা?'

আমার ওয়ালেটটা দেখিয়ে দিলুম তাকে।

'খোলো।'

খুলে দেখি আমার যথাসর্বস্ব ঠিকই আছে। আমি ওয়ালেটটা আমার পকেটে রেখে দিলুম।

সে আমায় বললে: 'যাও! আল্লাহ তোমায় দোয়া করুন।'

আমিও একই কথা বললুম: 'আল্লাহ্ যেন আপনাকে দোয়া করেন!'

## টাইগার

টাইগার খুব পয়মন্ত কুকুর। দুর্ভিক্ষ লেগে যখন দেশশুদ্ধ লোক একেবারে হাড় জির জিরে কঙ্কালে পরিণত হ'য়ে গিয়েছে, টাইগারকে দেখে মনে হ'তো না যে তার খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট আছে। সে যখন বসে তখন তাকে দেখায় কালো ভুঁশো কম্বলে মোড়া একটা মস্ত পুঁটুলির মতো। তার গা কালো, পাগুলো আর ল্যাজ ধবধবে শাদা। তার চোখগুলো খয়েরি মতো, তাতে একটু লালের ছোপ। টাইগারের চোখগুলোকে দেখাতো কেমন ক্রূর আর নিষ্ঠুর, ঠিক কোনো পুলিশের চোখের মতো।

টাইগার রাস্তার কোনো নেড়ি কুকুরের ছানা। তার জন্ম হয়েছিলো আরো গোটা কয় কুকুরছানার সঙ্গে শহরের নর্দমায়। সে নিজে অবশ্যি তা জানে না। যেদিন থেকে কিছু সে মনে করতে পারে, সেদিন থেকেই সে থানায় আছে। থানার উঠোনের চার দেয়ালের মধ্যেই তার জগৎটা যেন সীমাবদ্ধ—থানার দালান আর তার ওপরে চৌকো একফালি আকাশ। তার একমাত্র সঙ্গী, হ'লো সেপাইশাস্ত্রী আর কয়েদীরা। তাদের সকলকেই সে আলাদা-আলাদা ক'রে চেনে। তবে তার সঙ্গে সবচেয়ে খাতির পুলিশের দারোগার। কয়েদীরা বলতো দারোগার চোখের চাউনি আর টাইগারের চোখের ভাব—দুইই নাকি হুবহু একরকম।

কয়েদীদের মধ্যে এর সঙ্গে ওর কোনো তফাৎ করতো না টাইগার। খুনে, চোর-বাঁটপাড়, রাজনৈতিক বন্দী—সকলেই কয়েদী। অন্তত টাইগারের চোখে মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত—পুলিশ আর কয়েদী। তার কুকুরচোখে ৪৫ জন কয়েদীর সকলকেই একরকম ঠেকতো। যে-চারজন কয়েদীকে ঠেশেঠুশে একটা ছোট্ট হাজত ঘরে আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে, তারা যে আসলে রাজনৈতিক বন্দী—টাইগার এই তথ্যটায় কোনো পাত্তাই দিতো না। তার কাছে সব হাজতঘরই ছিলো একরকম। কোনো হাজত ঘরেই হাওয়া কিংবা আলো ঢোকে না একফোঁটাও। ফ্যাকাশে বিবর্ণ কতগুলো লোক মুখে খাপচা-খাপচা দাড়ি, ছেঁড়া কম্বলে গা ঢাকা—এ-সব ঘরে স্যাঁৎসেতে অন্ধকারে থাকে এমনতর কতগুলো প্রাণী। তাদের সহ্য করতে হয় গু-মুতের বিকট দুর্গন্ধ আর অগুনতি পোকামাকড়ের কামড়।

হাজতঘরগুলো থেকে যে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুতো, তা-ই মনুষ্য হৃদয়ের যাবতীয় আশা-ভরসাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু হাজতবাসীদের তাতে

বোধহয় কিছুই এসে-যেতো না। তাদের সারাক্ষণের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিলো খাদ্য। খাবারের জন্যে প্রচণ্ড কামনাই বাকি সব ভাবনাকে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিতো না। তারা রাত্তিরে ঘুমোতে যেতো সকালে যে ভাতের মণ্ড পাবে, তাকে বলে কাঞ্জি, তারই কথা ভাবতে-ভাবতে। সেই ট্যালটেলে কাঞ্জি শেষ হ'তে-না-হ'তেই তারা ভাবতে শুরু ক'রে দিতো। মধ্যাহ্নভোজের কথা। আর দুপুরবেলার খাওয়া সন্ধেবেলায় কী খাবার জুটবে। তাদের এই নাড়িভুঁড়ি কামড়ানো খিদের কখনও শান্তি হ'তো না—আর সেটাই ছিলো তাদের যাবতীয় হৃৎচাঞ্চল্যের কারণ। সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতো কবে বিচার ক'রে তাদের সাজা দেয়া হয়, কবে তারা সত্যিকার গারদে যেতে পারবে—অর্থাৎ জেলে। সব্বাই এটা জানে যে যেখানে পুলিশ স্বয়ং অমুক-তমুক ধারায় অভিযোগ দায়ের করছে, সাজা না-পেয়ে সেখান থেকে কিছুতেই আর ছাড়ান নেই। একবার রায় বেরুলেই তাদের জেলে নিয়ে যাওয়া হবে ফাটক থেকে—আর জেল হ'লো সব কয়েদীরই স্বর্গ—আর হাজত বা ফাটক হ'লো তার নরক।

হাজতের সব কয়েদীই তাদের যত রোষ যত উষ্মা সব যেন তাদের টগবগ ক'রে ফোটা চোখ থেকে টাইগারের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করতো। তাকে মোটেই কোনো পাত্তা না-দিয়ে, পরম ঔদাসীন্যেভরে, টাইগার হাজতের সামনে পায়চারি ক'রে বেড়াতো। অথবা কোনো-একটা ঘরের সামনে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়তো। দুপুরবেলায় খাবার সময় সে পাহারা দিতো দারোগার ঘর। মধ্যাহ্নভোজ সেরে দারোগাসাহেব চৌয়া ঢেকুর তুলে পাতাভর্তি অবশিষ্ট খাবার দিয়ে দিতো টাইগারকে। সেখানে থাকতো হট্টাকট্টা এক জোয়ান লোকের খিদে মেটাবার মতো খাবার, আর টাইগার তা চেটেপুটে খেয়ে নিতো চক্ষের পলকে। কুকুরটাকে ওভাবে ওভাবে হুমহাম ক'রে খেতে দেখে কয়েদীদের মুখ থেকেই যেন লালা গড়াতো।

দুপুরবেলার খাওয়া সাঙ্গ হ'লে টাইগার বাগানে গিয়ে ঝোপঝাড়ের ছায়ায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে ঢুলতো। ছোট্ট একখানি দিবানিদ্রা সেরে সে পুনর্বার উদিত হ'তো হাজতঘরগুলোর সামনে। তার চোখগুলোয় হাসির একটা ঝিলিক থাকতো, যেন সে সেখানকার সব্বাইকার গোপনকথা জেনে ফেলেছে। হাজতে বেশির ভাগ কয়েদীই মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে। ঘুষ খেয়ে দারোগা আর পুলিশরা এদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজিয়েছে। কয়েদীদের কেউ-কেউ হয়তো জীবনে এক-আধবার কিছু-একটা চুরি করেছিলো! তারপর থেকে শহরে যত চুরিচামারি হয় সবকিছুর জন্যেই যেন তারাই দায়ী। হাজতে পোরবার পরই তারা তাদের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগই থাকুক না কেন সব সব স্বীকার ক'রে বসতো। সব তারা স্বীকার ক'রে বসতো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনেও কারণ সবসময়েই তো তাদের সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশপাহারা মোতায়েন থাকতো।

সব বিচারাধীন বন্দীর জন্যেই সরকার থেকে খাদ্যবাবদ একটা নির্দিষ্ট ভাতা বরাদ্দ ছিলো। তার তিরিশগুণ একজন পুলিশের মাসিক বেতনের চেয়েও ঢের বেশি। অর্থাৎ রোজকার ভাতা যোগ করলে একজন পুলিশের মাইনের চেয়েও ঢের বেশি টাকা হ'তো। পুলিশকেও তো খেতে-পরতে হয়, সংসারের খরচ সামলাতে হয়। মাস-মাইনে ছাড়া তার আর কী আয় আছে, বলুন? তার পক্ষে এত-সব খরচ চালানো কী ক'রে সম্ভব?

গরাদের ফাঁক দিয়ে রাগ-টাগ চাপবার চেষ্টা না-ক'রেই কয়েদীরা টাইগারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতো।

'হতচ্ছাড়া, তুই যা খাস, সব আমাদেরই খাবার!'

টাইগার তার ল্যাজ নাড়তো ঘন-ঘন। 'হুম। জীবন এইরকমই—কেউ তা বদলাতে পারবে না!' শুধু তার চোখ চেয়েই যেন কুকুরটা তাদের এ-কথা ব'লে দিতো। সত্যি, এমন অবস্থার বদল ঘটানো কি আদপেই সম্ভব? এমন কয়েদীও ছিলো যারা বলতো, 'আমাদের খিদে মেটেনি। আমাদের প্রত্যেকের জন্যে যে-খাবার বরাদ্দ আছে, আমরা তা চাই!'

বদলে তারা অবশ্য পেতো পুলিশের কাছ থেকে কিলচড় আর দারোগার কাছ থেকে লাথি। শুধু তাই নয়: দারোগাকে ঘেন্নায় মুখ বেঁকিয়ে বলতে শোনা যেতো: 'সরকার যা বরাদ্দ করেছে, তাই চাই! যেন সরকার তোদের ঠাকুদ্দা!'

সরকার কি কারু ঠাকুদ্দা হ'তে পারে? তারা সবাই বলতো: 'টাইগারই সরকার!'

সে কি কোনো সঠিক সমান্তর?

রোজকার ভাতা অনুযায়ী কয়েদীদের যে-খাবার প্রাপ্য, সেটা জোগাবার ঠিকে পেয়েছিলো এক হোটেলওলা। তার গোটা ব্যাবসাটাই সে শুরু করেছিলো একেবারে যা-দশা থেকে। এখন সে এই কয়েদীদের দৌলতেই মস্ত বড়োলোক। বেজায় মোটা সে, পাকানো একজোড়া গোঁফ, আর এক ভুঁড়ো পেট। তার আর দারোগায় এমন মাখামাখি যেন হাত আর দস্তানা। দারোগা আর থানার কেরানি তার হোটেল থেকেই রোজ খাবার পেতো। খাবারদাবার বা চা-কফির জন্যে তাদের কোনো দামই দিতে হ'তো না। শুধু তা-ই নয়: হোটেলওলা প্রতিমাসে দারোগা আর কেরানিকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতো। এ-সবই হোটেলওলা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতো কয়েদীদের কাছ থেকে। রোজ পঞ্চাশ-ষাট জন কয়েদীকে খাওয়াতে হয়। তাদের যদি এক গরাশও কিছু খেতে না-দেয়া হয় এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কে? আদালতে নিয়ে গেলে এরা যদি জজ-ম্যাজিস্টরের কাছে নালিশ করার কথা ভাবে, তবে এ-কথাটাও তাদের ভাবতে হয় যে সন্ধেবেলায় আবার এই ফাটকেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে। দারোগা তখন সহাস্যে জিগেশ করবে—এবং সেই হাস্য যে কী-একখানা

চীজ, তা মালুম হবে অচিরেই !

'বলেছিলি বুঝি ম্যাজিস্ট্রেটকে বদমাশ ?'

তারপর একেবারে জ্ঞান না-হারানো অব্দি বেধড়ক পেটানো হবে তাদের। এ-সব দেখেশুনে কিছুদিনের মধ্যেই কয়েদীদের আর-কোনো নালিশ থাকে না! তারা বরং সবকিছুর শোধ নেবার চেষ্টা করে কুকুরটার ওপর। সকলেই জানে কয়েদীরা কেউ টাইগারকে পছন্দ করে না। শুধু দারোগাই এটা বুঝে উঠতে পারে না যে বেচারা জানোয়ারটাকে তারা কেউ ভালোবাসে না কেন।

তবু কয়েদীরা টাইগারকে বেজায় অপছন্দ ক'রেই চলে। যখনই পারে তার ওপর একহাত নেবার চেষ্টা করে তারা, তাকে কষ্ট দেবার চেষ্টা করে। টাইগার যেই বোঝে যে কেউ তাকে মারতে আসছে অমনি কুঁই-কুঁই ক'রে নাকি সুরে গোঙাতে শুরু ক'রে দেয়।

দারোগা অমনি বেত হাতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। 'কে মেরেছে কুকুরটাকে ?'

কেউ যখন কোনো উত্তর দেয় না, তখন দারোগা চেঁচিয়ে হাঁকে, 'ওরে কুত্তার বাচ্চা, তোদের না বলেছি টাইগারকে ককখনও ছুঁবি না! আয়, কে ওকে মেরেছিলি এগিয়ে আয়, হাত পাত!'

লোহার গরাদের মধ্যে থেকে একটা হাত আস্তে বেরিয়ে আসে। দারোগা সে হাতটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বেত হাঁকায়, এক ঘা, দু-ঘা, আরো! আবহাওয়াটা চিড়বিড় ক'রে ফুটতে থাকে। কব্জি আর হাতের চামড়া ফেটে যায়, রক্ত চুঁইয়ে বেরোয়, ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝ'রে পড়ে। কুকুর চেটেপুটে মেঝে সাফ ক'রে দেয়।

এ-শাস্তি কয়েদীদের কেবল তাতিয়েই দেয়। তারা আবার বেয়াদবি করে। কুকুরটাকে মারবার জন্যে সব কয়েদীই দু-চারবার সাজা পেয়েছে। আর কুকুরটাও তেমনি—সেও কাছে ঘেঁষে বারে-বারে তাদের মারবার সুযোগ ক'রে দেয়।

থানার চৌহদ্দি থেকে টাইগার কদাচিৎ বেরুতো। আসলে সে ছিলো আস্ত একটা ভিতুর ডিম। থানার চৌহদ্দির মধ্যে আর-কোনো কুকুরকে দেখতে পেলেই সে বাঘের মতো খেপে গিয়ে গর্জন ক'রে উঠতো। কিন্তু বাইরে গিয়ে, এমনকী কোনো হাড়-বের-করা জিরজিরে কুকুর দেখলেই, ল্যাজ গুটিয়ে নিঃশব্দে ছুটে পালিয়ে আসতো ভেতরে। এক রাজনৈতিক বন্দী একদিন এই দৃশ্য দেখে হেসেই অস্থির ; সে হেসে বললে : 'দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদের দারোগা সাহেব ফিরে আসছেন!'

কয়েদীদের মধ্যে এক দার্শনিক বললে : 'আমাদের সকলের মধ্যে এ-রকম কত দারোগা আছে।'

এই মন্তব্য থেকে দারুণ এক উত্তপ্ত তর্কাতর্কি শুরু হয়েছিলো। তিনজন রাজনৈতিক বন্দী একদলে, অন্যদলে শুধু একজন। তর্ক যখন চ্যাচামেচিতে পৌছেছে, দারোগা বেরিয়ে এলো। 'বলি, এত উত্তেজনা কিসের।'

কেউ কোনো সাড়া দিলে না।

'দরজা খোলো.' শাস্ত্রীকে হুকুম দিলে দারোগা। দরজা খুলতেই তারা সবাই বেরিয়ে এলো দারোগা বললে: 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ক-জন।'

দারোগার ঘরে গিয়ে তারা ছাখে. যে-যুবকটির মন্তব্য থেকে এই গরম-গরম আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিলো তার ক-জন বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সঙ্গে তারা নিয়ে এসেছে কিছু খাবার ও কয়েকটি কমলা। দারোগা নিজেই তার গোটা দুই কমলা সাবাড় করলে। অন্তরা বাকি কমলাগুলো আর অন্যান্য খাবার খেয়ে নিলে। দেশে কী ঘটছে না-ঘটছে তা নিয়ে তারা আলোচনা করলে। যে-খবর শুনতে পেলে তা কিন্তু মোটেই তাদের অবাক করলো না। সবখানেই প্রচণ্ড দারিদ্র. অনেকে না-খেতে পেয়ে অনাহারে মরেছে। এখনও পুরোদমে যুদ্ধ চলেছে রোজই জিনিশপত্তরের দাম বাড়ছে। সবখানেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

'আমরাও তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি' যে যুবকটি তর্ক শুরু করেছিলো সে জানালে।

'তোমাদের আবার নালিশ কিসের? দিব্যি আছো তোমরা, পেট পুরে খেতে পাচ্ছো. কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই. বেশ লোক সবাই!' আগন্তুকদের একজন বললে।

ঠিক সে-সময় টাইগার দুলকি চালে দরজা দিয়ে এসে ঢুকলো, আর যে-যুবকটি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলো সে কুকুরটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে: 'কয়েদীরা সবাই যদি এর মতো ভাগ্যবান হ'তো!'

দারোগা হেসে উঠলো। আগন্তুকরাও হাসলে। কয়েদীরাও হাসিতে যোগ দিলে। তারা হাজতে ফিরে এলো। চারজনেরই মনে বেশ সন্তোষ। তারা পেট পুরে খেয়েছে। আর তাই সেখানে সান্ধ্যভোজের ভাত-তরকারি প'ড়ে রইলো, কারু না-খাওয়া। তারা সে-সব তাদের পাশের ঘরের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। ভেতরে বাইশজন কয়েদী দরজার কাছে এসে লোলুপ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাদের একজন ভাত-তরকারিগুলা পাতাগুলো কাছে টেনে নিলে। কিছু ভাত বাইরে প'ড়ে গেলো। টাইগার সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো প্রস্তুত. সব চেটেপুটে খাবে ব'লে। একুশজন বসলো পাতাগুলো ঘিরে, গোল হ'য়ে খাবে ব'লে। একজন তৈরি হ'লো তাদের সবাইকে পরিবেষণ করবে ব'লে। সকলের ভাগেই এমনকী একমুঠোও জুটবে কি না সন্দেহ। তবু তারা সবাই সব খেয়ে ফেলবে ব'লে তৈরি। পরিবেশক পাঁচ জনের হাতে খানিকটা ক'রে ভাত তুলে দিলে, তারপর দিলে কিঞ্চিৎ তরকারি।

খানিকটা আবার দরজার গরাদে ছিটকে পড়লো, কিছুটা পড়লো বাইরের মেঝেয়। টাইগার মেঝে থেকে সব চেটেপুটে খেয়ে জিভ বার ক'রে গরাদে চাটতে লাগলো। কয়েদীদের একজন তার মুখ তাগ ক'রে দুর্ধর্ষ একটা লাথি ঝাড়লে। • কুকুরটা যন্ত্রণায় ডুকরে উঠলো। শাস্ত্রী তক্ষুনি ছুটে এলো। ছুটে এলো কয়েকজন পুলিশ ও স্বয়ং দারোগা সাহেব। দারোগা কয়েদীদের হুমকি দিয়ে বললে সব ভাত পাতায় তুলে দিতে, তারপর সে-পাতা সে কুঠুরির বাইরে টেনে নিয়ে এলো। ঠিক যেন বাইশজন কয়েদীর হৃৎপিণ্ড কেউ খুবলে তুলে নিচ্ছে। সব খাবার সমেত পাতা রাখা হ'লো কুকুরটার সামনে। এতেও কিছুতেই খুশি না-হ'য়ে দারোগা হাজত ঘরের দরজা খোলালো। কুঠুরির মধ্যে ঢুকে সে কয়েদীদের ওপর কিল-চড় ও লাথি বর্ষণ করলে।

ঘটনাটা শেষ হয়েছিলো অপরাহ্ণে। সে-রাত্রি জুড়ে সারাক্ষণ শোনা গেলো ব্যথা আর কষ্টের গোঙানি। সারা থানাটাই আর্তনাদে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। শাস্ত্রী যখন হন্তদন্ত হ'য়ে অকুস্থলে ছুটে এলো, সে দেখতে পেলে দুজন কয়েদী কুকুরটার মাথা চেপে ধ'রে তাকে কুঠুরির ভেতর টেনে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। স্পষ্ট দেখা গিয়েছিলো দুজন কয়েদী ছিলো, কিন্তু শাস্ত্রী শুধু একজনকেই চিনতে পারলে।

দারোগাসাহেব শনাক্ত করা কয়েদীটিকে হাজতঘরের বাইরে নিয়ে এলো। তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ছিলো। মুখবন্ধ হিশেবে দারোগা তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি কষালে। তারই অনুসরণ ক'রে এলো এক বিষম লাথি। কয়েদীটি হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো! বারে-বারে তার পিঠে লাথি কষানো হ'লো। তারপর তাকে তোলা হ'লো। তার মুখটা রক্তে মাখামাখি হ'য়ে আছে। মেঝেয় প'ড়ে আছে একটা ভাঙা দাঁত আর গোল হ'য়ে দলা-দলা রক্ত।

দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখলে পঁয়তাল্লিশজন কয়েদী, ন'জন পুলিশের লোক এবং কুকুর টাইগার। টাইগার চেটে-চেটে মেঝে থেকে রক্ত সাফ ক'রে দিলে।

'বদমায়েশ, অন্য লোকটা কে, বল!'

যে-কয়েদী মার খেয়ে ধুঁকছে, সে কিছুই বলবে না। 'অ্যা, বলবি না, অস্বীকার করছিস?' তার ঠ্যাংদুটো হাজতের গরাদে দিয়ে বাইরে টেনে এনে দুটোকে জুড়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দেয়া হ'লো। তার পায়ের পাতায় বেধড়ক পেটানো হ'লো, পরের পর ঘা। চামড়া ফেটে রক্ত বেরুনো সত্ত্বেও সে কিছুই বলবে না। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুলো তার পা থেকে। সে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলো। টাইগার যখন তার পায়ের পাতা থেকে তার কর্কশ জিভ দিয়ে চেটে-চেটে রক্ত খেয়ে নিলে, তখনও যে সে কিছুই না-ব'লে নিঃসাড় প'ড়ে রইলো, তা শুধু এইজন্যেই।